প্রকাশক :
সাধারণ সম্পাদক
আনন্দ নিকেতন
পিন-৭১১৩০৩

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ১৯৬০

মুদ্রণ :
শ্রীঅজিত মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

শ্রীঅমল গাঙ্গুলির "সমাজ ভাবনা"র প্রথম পর্বে যে কটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রবন্ধগুলির উপাদান সবই নিজের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল আর তারই অভিব্যক্তি প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। আমরা শ্রী গাঙ্গুলীর আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ পেয়ে সেগুলি একত্রে "সমাজ ভাবনা" দ্বিতীয় পর্ব রূপে প্রকাশ করলাম।

একজনে নিঃস্বার্থ রাজনীতিক ও সমাজসেবীর দৃষ্টি দিয়ে অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অস্থিরশীল পরিস্থিতিকে দেখেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর নিজস্ব মননশীলতা, সৃষ্টিশীল শৈল্পিক দক্ষতা ও গঠনমূলক অভিজ্ঞতা প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাস যারা রাজনীতিক, সমাজসেবী ও গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত তাঁরা শ্রী গাঙ্গুলীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে এমন বহু উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন যা বর্তমানের অস্থির সমাজব্যবস্থার মাঝে স্থিরতা আনতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে।

বিশ্ব সভ্যতা সৃষ্টির স্রষ্টা মানুষ নিজে, কিন্তু আজকের যুগ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে কতখানি প্রভাবিত করে তুলতে সমর্থ হচ্ছে—এ প্রশ্ন আজ বহু মনীষী ও সমাজ-রাষ্ট্ররূপকারদের মধ্যে এসেছে, শ্রীগাঙ্গুলীর মধ্যেও এসেছে সেই সব প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত গঠনমূলক দিক নির্দেশগুলি আজ আমাদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যদি আমরা সমাজ, রাষ্ট্র ও সংসারের মধ্যে সুস্থিরতা এবং বিকাশশীল রূপান্তর আনতে চাই।

দেশের ঐক্য-সংহতি বিপদাপন্ন, মৌলবাদের বিষাক্ত হাওয়ায় নাভিশ্বাস উঠেছে আমাদের। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের বল্গা আলগা হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাতে মানুষ আতঙ্কিত—এই পরিস্থিতিতে শ্রীঅমল গাঙ্গুলীর প্রবন্ধগুলি আমরা প্রকাশ করে মানুষের যাতে চিন্তার মাঝে এক বৈপ্লবিক সৃষ্টিশীল গঠনমূলক স্রোতধারা প্রবাহিত হতে পারে তারই প্রয়াস পেয়েছি। যদি সে প্রয়াস আংশিক ভাবেও সফল হয় তাহলে বহু 'আনন্দ নিকেতন' গড়ে উঠবে এ ভরসা আমাদের আছে—যেহেতু তাঁরই সৃষ্টি আনন্দ নিকেতনে কাজ করে আমরা আনন্দ নিকেতনের কর্মীরা এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

॥ বিষয়সূচী ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের ঐক্য ও সংহতি—কোন্ পথে

একটি দেশ স্বাধীন হলেই যে সে দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠবে—এই তত্ত্বটি সর্বৈব সত্য নয়; বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। আমাদের দেশ স্বাধীন হবার আগে আমরা যখন পরাধীন ছিলাম, তখন ভিত্তি তার যতই দুর্বল হোক না কেন—সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মত অবস্থায় এসে হাজির হলো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি স্বাধীনতা লাভের অনুকূল হয়ে উঠলো—দেখা গেল সেই ঐক্য একটি ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছে—যার পরিণতি ঘটলো—১৯৪৭ সালে দু-টুকরো হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার মধ্যে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ এমন এক স্তরে এসে হাজির হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে সেই ঐক্যকে আর রক্ষা করা গেল না। আমরা স্বাধীন হলাম, কিন্তু ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল ধর্মের ভিত্তিতে, জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান। আমরা হলাম খণ্ডিত ভারতবর্ষের নাগরিক, পুরানো ভারতবর্ষের মানচিত্রটিই গেল পাল্টে। কিন্তু দেশ বিভক্ত হওয়ার পরও কি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে কি কোন স্থায়ী ও সুষ্ঠু মীমাংসা হয়েছে ভারতে? সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দেশে আগের মত রয়েই গেছে, শুধু তাই নয়। ক্রমশই এই অনৈক্য বেড়েই চলেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিস্ফোরণের আকার ধারণ করছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার যে কোন যুক্তিসম্মত নিরাকরণ হবে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ঘটেছে।

চুয়াল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হবার পরও ভারতে বসবাসকারী মুসলমানগণ আজও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মনস্তাত্বিক দিক থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ ভারতীয় নাগরিক বলে ভাবতে দ্বিধাবোধ করেন, যদিও প্রকাশ্যে তা ব্যক্ত করেন না। কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক সুবিধা দেওয়া এবং কাশ্মীর রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা সত্বেও কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু মুসলমান অধিবাসীদের যে সংখ্যাগুরু অংশ ভারত-ভুক্তি মেনে নিতে পারছেন না, স্বতন্ত্রতা দাবী করছেন—এই দাবীকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল বিগত চার দশকেও তার কোন মীমাংসা হওয়া তো দূরের কথা, আজ এই জটিলতা এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, এই কাশ্মীরকে আর কোনক্রমেই ভারত রাষ্ট্রের অংশ বলে মনে করা যায় না। যদি সেখানে স্বাধীনভাবে গণভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে কাশ্মীরের অধিবাসীদের গরিষ্ঠ অংশ যে ভারতীয় রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেবেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাশ্মীরকে যদি ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে রাখতে হয় তাহলে তা রাখতে হবে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে। বাস্তবে সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে কি সম্ভব, না কাম্য? পরিস্থিতির-বিচার বিশ্লেষণ যেভাবেই করা হোক না কেন—এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভারতীয়দের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চেতনার সঙ্গে কাশ্মীরের অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণার ঐক্যের মেলবন্ধন ঘটানো যায়নি। আর এই অনৈক্য ও বিভেদ সংক্রামিত হচ্ছে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে। অনুরূপ একটি বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক বিভেদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে—অযোধ্যার রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই পরিস্থিতি যে কোন্ দিকে মোড় নেবে তা এখনি সঠিক বলা না গেলেও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও বিভেদ যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে

এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূত্র ধরে ছোট-বড় আকারে অনেকগুলি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে; আর এগুলি সবই ঘটেছে বা ঘটছে দেশ স্বাধীন হবার পর—ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হয়ে যাবার পরও। কাজেই দেশ স্বাধীন হলেই দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে—এই তত্ত্ব যে অন্ততঃ আমাদের দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হচ্ছে না তা বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না। দেশের ঐক্য ও সংহতি যে গড়ে উঠছে না, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই ঐক্য সংহতি যতটুকু ছিল—তাও যে বিপন্ন হয়েছে এবং ক্রমশ ধ্বসে পড়ছে—তা কেবল হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ—এই একটি মাত্র ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনৈক্য ও সংহতির অবক্ষয়ের ব্যাপকতা, গভীরতা ও জটিলতা—স্বাধীন হবার পর দেশে বহুগুণ বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং সমস্যাগুলি এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এবং নিত্য নূতন ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে যেগুলির সমাধান আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে থাকছে না। ঘটনা হিসাবে পাঞ্জাবের খালিস্তানী আন্দোলন, আসামের বোড়ো আন্দোলন, ত্রিপুরার উপজাতি আন্দোলন, সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীদের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব আন্দোলনগুলির মূল দাবীই হচ্ছে স্বতন্ত্র হওয়া এবং এই স্বতন্ত্র হওয়ার দাবীগুলির কোনটাকেই যে শেষ পর্যন্ত টেকানো যাবে না—বহু তিক্ততা ও অর্থ ব্যয় ও লোকক্ষয় হওয়ার পর কোন না কোন শর্তে স্বীকার করে নিতে হবে—প্রকাশ্যে একথা স্বীকার না করলেও আমরা মনে মনে তা স্পষ্ট বুঝছি। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই সীমানা পুনর্গঠনের ভিত্তিতে কয়েকটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে, কয়েকটি স্বায়ত্ব শাসন অঞ্চলেরও সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু বিভক্ত বা স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার মানসিকতা এই সব ঘটনাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না—আরও নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা ও দাবী সূতিকাগারে লালিত হচ্ছে; অদূর ভবিষ্যতে সেগুলিও যে এক একটি বড় আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করবে

তারও স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠছে এবং ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে একথা আজ আমরা কেউ ভাবতে পারি না। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার এই যে ক্রমবর্দ্ধমান মানসিকতা ও দাবী তার ভিত্তি যে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বত্র এক ও অভিন্ন তা নয়; কোথাও ধর্মের, কোথাও ভাষার, কোথাও শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবার কোথাও অর্থনৈতিক। এই ভিত্তিগুলি যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এমনটি ভাবারও কোন কারণ নেই। কিন্তু তা নিয়ে এখানে কোন বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে না। কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা এই ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ দেশে অনৈক্য ও বিভেদের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে—দেশ নানা ভাবে খণ্ডিত ও দুর্বল হচ্ছে। কাজেই স্বাধীন হলেই দেশের ঐক্য ও সংহতি যে গড়ে ওঠে এই তত্ত্ব আদৌ সত্য নয়।

কিন্তু প্রশ্ন আমরা এই দেশের সাধারণ অধিবাসীরা কি শুধুই পরিস্থিতির অসহায় শিকার? সাহসের সঙ্গে এই পরিস্থিতি সম্মুখীন হওয়া এবং এই পরিস্থিতির গতি রোধ করার ব্যাপারে আমাদের কি কোন দায়দায়িত্ব নেই, কোন সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা নেই? নিশ্চয়ই আছে। তা যদি থেকে থাকে তাহলে সে ভূমিকাটি কি হবে—তা নির্দ্ধারণের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে এক দিকে যেমন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে যে দেশের ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাসী হতে হবে, এই ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠার পথে যা কিছু অন্তরায় তার অপসারণে সাহসী হতে হবে, তেমনি আজ দেশের ঐক্য ও সংহতি বলতে কি বুঝি—ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে আমাদের অনুসৃত ধ্যান-ধারণাটির একটি যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়ণেরও প্রয়োজন হবে—আর এই দুটি বিষয়েই আমাদের কোন গতানুগতিক চিন্তাধারা বা কুসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হওয়া চলবে না। দেশের ঐক্য ও সংহতি বলতে আমরা কি বুঝি—এই ধ্যান-ধারণার মধ্যেই যদি কোন মৌলিক ত্রুটি থাকে—তাহলে এই ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার নামে যে কার্যক্রমই গ্রহণ করি না কেন—তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে—এবং তা হচ্ছেও।

সেজন্য দেশের ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে দেশবাসী হিসাবে আমাদের ধ্যান-ধারণাটি প্রথমে পরিষ্কার হওয়া দরকার। দেশের ঐক্য ও সংহতি বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি এবং দেশের রাষ্ট্রনায়ক রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত সমাজ চিন্তায় পণ্ডিতেরা আমাদের বুঝিয়ে থাকেন যে এই ঐক্য ও সংহতি হচ্ছে—আমাদের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতি। কিন্তু দেশের ঐক্য ও সংহতি আর জাতীয় ঐক্য ও সংহতি যে এক নয়, তা বুঝতে আমরা প্রায়ই গোলমাল-এর আবর্তের মধ্যে পড়েছি বলেই দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার যে সহজ ও স্বাভাবিক পথ তা গ্রহণ না করে আমরা একটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে সমস্যাটির মীমাংসা করতে চাইছি। কাজেই সমস্যাটির মীমাংসা হচ্ছে না, ক্রমশই তা জটিলতর হয়ে উঠছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এবং পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমান ত্রিপুরা) থেকে পশ্চিমে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত এই যে বিশাল দেশ আমাদের ভারতবর্ষ তার গোটা মানচিত্রটি যদি আমাদের সামনে তুলে ধরি, তাহলে দেখি এই দেশ অসংখ্য খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন-স্বশাসিত—বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার সংস্কৃতির মানুষ এই সব রাজ্যের অধিবাসীরা; এদের সামাজিক অনুশাসনও সর্বত্র সমান নয়, খাদ্যাভাব, জীবনযাপনের রীতিনীতির মধ্যেও বহু পার্থক্য। একটি রাজ্যের সংগে অন্য রাজ্যের বিরোধ ও সংঘর্ষ মাঝে মাঝে যে দেখা দেয়নি তা নয়—কিন্তু সে বিরোধ ও সংঘর্ষ কয়েকটি রাজন্যবর্গ বা রাজপরিবার এবং তাদের ঘোষিত সৈন্য বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি অখণ্ড ভারতীয় চেতনা গড়ে উঠেছে এবং একটি সাংবিধানিক আইনের পরিকাঠামোর মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ শাসিত হচ্ছে—ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ বা নজীর নেই। সম্রাট অশোক কিম্বা মোগল রাজত্বকালে সম্রাট আকবরের আমলে গোটা ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের আকার নিলেও তা ছিল নিতান্ত সাময়িক এবং একেবারে আনুষ্ঠানিক; ঘটনাগুলি নিছক ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলির স্বাধীনভাবে শাসন করার অধিকার

কোনদিনই লুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে পর্যন্ত সমাজ ছিল গ্রামভিত্তিক এবং গ্রামের মানুষের নিজেদের গড়া সামাজিক অনুশাসনের দ্বারাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই সমাজ জীবন পরিচালিত হতো। একটি জাতি হিসাবে যে সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক জাতীয় ঐক্যের চেতনা কোন দিনই গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠার কোন কারণই ঘটেনি। একটি সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনায় ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ ছিল যদি একথা ধরে নেওয়া যায় তাহলে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সব বিদেশী শক্তির আক্রমণ হয়েছে এবং সেই আক্রমণে দেশের বিভিন্ন রাজার পরাজয় ঘটেছে সেখানে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছিল—ইতিহাসে তার কোন পরিচয় মেলে না। শক, হুণ, গ্রীক শক্তির ভারতবর্ষ জয়ের কথা বাদ দিলেও এই দেশে কিভাবে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং কিভাবে পাঠানদের হাত থেকে মোগলদের হাতে দেশ শাসনের অধিকার চলে গেল এবং পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজশক্তির অধীন হলো—এই গোটা ইতিহাস তো ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের রাজন্যবর্গ ও নবাবদের অনৈক্য ও সংহতির অভাবের ইতিহাস কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। কাজেই ইংরাজ রাজত্বের সূচনার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের জনসাধারণ একটি অখণ্ড জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছিল এটি কোন ঐতিহাসিক বা ইতিহাস সমর্থিত ঘটনা নয়। আজ যখন আমরা লক্ষ্য করি যে দেশে নানা বিভেদের সৃষ্টি হচ্ছে নানাভাবে স্বতন্ত্রতার দাবী উঠছে—তখন দুঃখ ও হতাশার সংগে অনুযোগ করি; যে এই দেশে অতীত দিনে জাতীয় ঐক্য ছিল, জাতীয় সংহতি ছিল; আজ নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অশুভ আবির্ভাবে তা নষ্ট হতে চলেছে; দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে, অতীত দিনের এই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে যে ধারণা তা যে নিছক কল্পনাপ্রসূত ও আবেগমণ্ডিত—এই ধারণা

যে সত্য নয় এ সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কারণ কোন অসত্য ও বিভ্রান্তিকর ধারণার বশবর্তী হলে দেশের সামনে অনৈক্য ও সংহতির অভাবের যে বিরাট সমস্যা তার সমাধানে কোন নির্ভুল কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবো না। বিশ্লেষণটি যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। ইংরাজ শাসনের ফলে আমাদের দেশে একটি সর্বভারতীয় দেশাত্মবোধের চেতনার সূত্রপাত ঘটে আর এই সূত্রপাত ঘটানোর মূলে আছে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ইংরাজ শক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘটনা। আমাদের পরাধীনতাকে আরও সুদৃঢ় ও নিরঙ্কুশ করে তোলার তাগিদেই ইংরাজেরা এদেশে একটি সর্বভারতীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পরও যে শাসন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে—আঙ্গিক দিক থেকে তার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রায় সেই মডেলটিকেই অনুসরণ করে চলেছি। এখানে মূল কথাটি হচ্ছে—ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশী শাসক হিসাবে ইংরাজ রাজশক্তিই প্রথম ভারতবর্ষ যে অখণ্ড সত্ত্বা, একই রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে একটি সাংবিধানিক অনুশাসনের মাধ্যমে এই সত্ত্বার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব, অন্য কোনভাবে নয়, এই চিন্তা বা চেতনার ভিত্তি তারাই তৈরী করে—অবশ্য তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করার মতলবেই কিন্তু প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া আছে। আগে যে সব বিদেশী শক্তি এসেছে তাদের সঙ্গে ইংরাজ শক্তির চরিত্রের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য হচ্ছে: বণিকের মানদণ্ডের সংগে রাজদণ্ডের একটি সমীকরণ করা, আর এই কারণেই ইংরাজ রাজশক্তির প্রতিভূ যে কেবল একটি শাসক গোষ্ঠী তা নয়, তারা একটি উন্নত সভ্যতারও অধিকারী ও বার্তাবহ—এই সত্যটিও তাদের ভারতীয় জনমানসে তুলে ধরার প্রয়োজন হলো। এই রাজশক্তির অনুকূলেই একদিন ইউরোপের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ রূপান্তরের আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের তৎকালীন উদারমনস্ক বুদ্ধিজীবিদের একাংশের

পরিচয় ঘটলেও এবং এই পরিচয়ের ফলেই প্রথমে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার এবং তারই অনুসরণে সারা ভারতবর্ষের নব জাগরণের সূত্রপাত হলো। আর এই নবজাগরণের যে আন্দোলন তাকে ভিত্তি করেই যে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল —এ আর কোন অজানা ইতিহাস নয়। এক জাতি, এক প্রাণ—এই চেতনার উন্মেষ ঘটেছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই পর্বে—বিদেশী রাজশক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার একটি মহামন্ত্র হিসাবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দীপনাময় প্রেক্ষাপটে সেদিন জাতিতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু এই এক জাতি তত্ত্বের মধ্যেই এমন এক দুর্বলতার বীজ নিহিত আছে—যার সন্ধান আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্র নেতাদের সঠিক জানা ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু চতুর ইংরাজ রাজশক্তির কাছে তা অজানা ছিল না। যখন এই মুক্তি আন্দোলন দেশের সর্বস্তরের মানুষের একটি দেশব্যাপী আন্দোলনে রূপ গ্রহণ করেছে দেখা গেল, সেই মুহূর্তে ইংরাজ রাজশক্তি আমাদের মুক্তি আন্দোলনের দুর্বলতম দিকটি লক্ষ্য করেই অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ নয়, হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি—আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দ্বিজাতি তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটানো হলো। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করার এই যে চক্রান্ত তা শেষ পর্যন্ত সফল হলো—ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলো। কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা গোষ্ঠীকে এই পরিণতির জন্য অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো অবশ্যই যেতে পারে, কিন্তু আমরা দেশের ঐক্য ও সংহতির অভাবে যে বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছি সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না এটা বুঝতে হবে। যেদিন ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষ এক জাতি, এক প্রাণ ছিল না, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে আমাদের ধারণাটিই ছিল ভ্রান্ত, এবং ধারণাটি ভ্রান্ত ছিল বলেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই যে সব দুর্বল দিক ছিল—সেগুলি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত ছিলেন না। যারা অবহিত ছিলেন

তাঁরা সেই দুর্বল দিকগুলি পূরণের কোন আন্তরিক চেষ্টা করেননি। একটি সাধারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটি বিভিন্ন ধারার জনগোষ্ঠীকে একটি পর্য্যায় পর্যন্ত আবেগের টানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু সেই পর্য্যায়েরও সীমা আছে। নিছক আবেগে আর কাজ চলে না—রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হতেই হয় এবং তখন বহু অভিপ্রেত অঘটন ঘটা অনিবার্য হয়ে ওঠে যার প্রতিরোধ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে শুধু হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও বিভেদের সমস্যা নয়, আজ দেশ স্বাধীন হবার চুয়াল্লিশ বছর পরেও যে সব বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলির মূলে আছে—আমাদের দেশের মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম্ম, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক অনগ্রসরতা সম্পর্কে যে ভিন্ন ভিন্ন আবেদন ও অনুভূতি ক্রিয়াশীল তা বুঝতে ভুল করা এবং দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় যে প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছিল তা বোঝার প্রয়াসকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া।

ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি বহু জাতির মহাজাতিক দেশ। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নামে এই দেশেই বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির মানুষকে একটি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আনার চেষ্টা হলে তাদের জাতীয় সত্তাকেই অস্বীকার ও বিলুপ্ত করারই চেষ্টা হয় এই আশংকা তো অমূলক নয়। বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, গুজরাটি, রাজস্থানী বা মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী—একটি বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলেই জাতি হিসাবে এই সব এলাকার অধিবাসীদের স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী তা তো নয়, একটি বিশেষ ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা দীর্ঘকাল পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে বলেই এদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তার দাবী। এই স্বতন্ত্র জাতি সত্তাগুণের পরিপূর্ণ বিকোশের সুযোগ ঘটলে তবেই মহাজাতিক ভারতীয় চেতনা, সারা দেশের ঐক্য ও সংহতি বোধ দানা বেঁধে উঠতে পারে এবং সেক্ষেত্রেই দেশের ঐক্য ও সংহতিকে দুর্বল করার জন্য আজ চারিদিকে যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতায় অশুভ

শক্তির সমাবেশ ঘটছে—এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব। কাজেই আঞ্চলিক ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে দাবী ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং আগামী দিনে এই দাবীর ক্ষেত্র আরও যে প্রসারিত হবে তা লক্ষ্য করে আমাদের অহেতুক উদ্বিগ্ন হলে চলবে না। কয়েক শতাব্দী ধরে এই দেশের বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন স্তরে যে অবক্ষয় ও অপমানের বোঝা চেপে বসে ছিল এবং আজও আছে দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ চার দশকের মধ্যেও যখন সেই বোঝা দেশের চালু রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অপসারিত হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই নানা ভাবে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী প্রবল হয়ে উঠছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলন হিংসাত্মক আকারও ধারণ করছে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশের বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। কাজেই ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন ধারার যে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট আছে, বিভিন্নতা আছে, বৈচিত্র আছে সেগুলিকে অস্বীকার করে নয়, দেশের ঐক্য ও সংহতির নামে সেগুলির অবলুপ্তি ঘটিয়ে নয়, পরিশীলিত, পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করেই সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে হবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার পক্ষে এটিই হচ্ছে সঠিক পথ। ভারতবর্ষের মত একটি বৃহৎ বহুজাতিক দেশে ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে যে একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে চলেছি তা আমাদের বুঝতেই হবে।

দেশের ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব: ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ভারতবাসী হিসাবে আমাদের দায়দায়িত্ব কতখানি ও কি ধরণের তা নির্ধারণ করতে পারছি না—এটি একটি সমস্যা, অবিলম্বে যার নিরসন হওয়া জরুরী প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব যে রাজনৈতিক শক্তি বা শক্তিগুলির হাতে সে দায়িত্ব পালনে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, আজ যে দেশব্যাপী অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ গড়ে উঠেছে তা আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়; অনেক

ক্ষেত্রে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহের স্রষ্টাই হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। যারা রক্ষক, তারা যদি ভক্ষকের ভূমিকায় চলে যায় তাহলে সে দেশের পরিস্থিতি যে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তা কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। আমাদের দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য এখুনিই অনেকের কাছে খুব প্রীতিকর ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হলেও ঘটনাটি যে ষোল আনা সত্য তা আমাদের বুঝতেই হবে। এই বোঝাটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, দেশের পক্ষে ততই মংগল। সেজন্য বিষয়টির উপর সংক্ষেপে হলেও কিছু আলোচনার প্রয়োজন। বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি—এই যুগটিকে আমরা গণতন্ত্রের যুগ বলেও দাবী করছি। সব দেশেই রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছে কোন না কোন ধরণের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার ধ্যানধারণা যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান, আর যেহেতু ঐ সভ্যতাই হচ্ছে সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই সভ্য জীবন ধারার মডেল. আমাদের দেশেও যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং যে শাসন ব্যবস্থার দ্বারা দেশ পরিচালিত হচ্ছে তা একই মডেলের ধাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ইউরোপে ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে পরিচালিত রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের প্রকৃত গণতন্ত্র কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নিয়ে দেশের চিন্তাশীল সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও নানা বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় নানা সংশোধন ও রূপান্তর ঘটানোর প্রয়াস চলছে। কিন্তু ঐ পাশ্চাত্য মডেলে আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তার যে ব্যবহারিক রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতির প্রতিফলন লক্ষ্য করছি, তাতে আমাদের দেশের সামগ্রিক কল্যাণে যে এই মডেলটি সম্পূর্ণ অচল এবং এই মডেল বর্জন করে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রয়োজন তা ইতিমধ্যেই তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায়

রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজনীতিই যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন পরিচালনার মূল নীতি হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতি, সমাজ দর্শন, শিক্ষা সংস্কৃতির অনুশীলন, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ—সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনীতির দ্বারাই। এই সব কাজেই রাজনৈতিক দলের নিরংকুশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আর রাজনৈতিক দলের ভূমিকা—এই দুটি যেন একটি দেশের সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজের পরিপূরক নয়, একেবারে অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক দলের ভূমিকাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না,—ব্যাপারটি যেন প্রায় এই রকমই দাঁড়িয়ে গেছে। ভাবনাটি যদি তাই হয়, তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ যে আদৌ নিরাপদ ও সুখকর নয়—এ সম্পর্কে আশংকার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা ও লোকসভা গঠিত হয় এবং এই সভাতে যে রাজনৈতিক পার্টির মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সেই রাজনৈতিক পার্টিই আইনসভা ও লোক-সভা অধিকার করে; সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গঠিত হয়। কাজেই দেশ শাসনের অধিকার কোন না কোন একটি রাজনৈতিক দলই অর্জন করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জোট বা মোর্চা ওরা দেশ শাসন করে থাকে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলি সেক্ষেত্রে কোথাও শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী হিসাবে কাজ করে, অন্যথায় বিরোধী দল বা বিরোধী দলের মোর্চার ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দলহীন ব্যক্তিরও নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ আছে। এবং সেই সুযোগের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক নির্দল প্রার্থীও নির্বাচনের জয়লাভ করে। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ধারায় নির্বাচন পরিচালিত হয় তাতে এই সব নগণ্য নির্দল প্রার্থীরা

জয়লাভ করে দেশের সমগ্র শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার অধিকার পায় না; অন্তত আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর যতগুলি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে তার ফলাফলে এই ঘটনা লক্ষ্য করেছি। গণতান্ত্রিক হলেও এই নির্বাচন পদ্ধতি যে কতখানি গণতন্ত্র সম্মত এবং এই নির্বাচনের ফলে যে রাজনৈতিক দলের শাসন ব্যবস্থা গঠিত হয় তা যে কতখানি গণতান্ত্রিক সে অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে আমাদের অনেকেরই হয়ে গেছে। অর্থ দিয়ে, মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দেখিয়ে যেখানে লোকসভা ও আইনসভার সভ্যদের কেনা বেচা চলে, গভীর রাত্রের অন্ধকারে দলগুলির দল ভাঙানোর খেলা চলে সেখানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এ দাবী করা যে কত হাস্যকর তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গতঃ শুধু এই মন্তব্যটুকু করলেই যথেষ্ট হবে যে আমাদের দেশে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক পার্টির সম্পর্ক যদি অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমতা, অর্থ, পদমর্যাদা ও স্বেচ্ছাচারিতা ও যাবতীয় দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা এই গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ; অন্ততঃ আমাদের দেশে রাজনীতি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনীতিক দলের চারিত্রিক অবক্ষয়ের সংগে রাজনীতির অবক্ষয়ের সম্পর্ক কতখানি সম্পর্কিত এবং একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত ও কলুষিত হচ্ছে তাতে এই নির্বাচন আদৌ গণতান্ত্রিক কিনা তা যেমন আজ সঠিক ভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে তার চেয়ে আরও অধিক গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে যে বর্তমান রাজনীতি ও এই রাজনীতি অনুসরণকারী রাজনৈতিক দলগুলি এরা কেবল পরস্পরকে প্রভাবিত ও কলুষিত করছে তাই নয়, গোটা সমাজ জীবনকে পথভ্রষ্ট ও কলুষিত করে তুলছে। কাজেই গণতন্ত্রের নামে পরিস্থিতিকে এইভাবে চলতে দেওয়া ঠিক হবে? দেশের বর্তমান রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলির চারিত্রিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার ক্ষেত্র এই লেখা নয়; এই লেখার এই অংশের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—আমাদের দেশে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার পথে দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক পার্টিগুলির যে ভূমিকা ছিল তা

তারা পালন করছে না শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে অনৈক্য ও বিভেদের শক্তির উদ্ভব হচ্ছে এবং প্রসার ঘটছে তা বহুলাংশে এই রাজনৈতিক দলের অনুসৃত রাজনীতিরই অনিবার্য ফল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ঘোষিত হলো, কিন্তু ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সামনে ভারতবর্ষের যে মানচিত্রটি ছিল—দেখা গেল সে মানচিত্রটি আর নেই, দু'টুকরো হয়ে গেছে—ভারত ও পাকিস্তান, সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভিত্তিতে, দ্বিজাতীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে। অথচ আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান—এই সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভিত্তিতে কোন জাতির কোন অস্তিত্ব কোন দিনই ছিল না। স্বাধীনতার নামে সেদিন ক্ষমতার হস্তান্তরই ঘটেছিল এবং ক্ষমতারই ভাগ বাঁটোয়ারা হয়েছিল আর এই ভাগ বাঁটোয়ারায় সারা দেশের জনমত প্রতিফলিত হয়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা অর্জনের কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন দেশ ভাগাভাগির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁরা জনমত নেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নি। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে সব শক্তি কাজ করেছিল এবং যে সব ঘটনা ঘটেছিল —এখানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তা অনেকেরই জানা। তবুও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিটিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সেদিনের রাজনীতির চরিত্রটি স্বতন্ত্র করে না বুঝে উপায় নেই। কেননা স্বাধীনোত্তর যুগে চার দশক ধরে দেশের রাজনীতির চারিত্রিক বিবর্তন ঘটছে—সেই ধারণার ভিত্তি হচ্ছে ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা ভোগ ও ক্ষমতার ভাগাভাগি।

আজ দেশের যে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটছে—এই ঘটনার সংগে দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন, ঐক্য ও সংহতির কোন সম্পর্ক নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়। ক্ষমতা সর্ব সময়ই কেন্দ্রমুখী ও আগ্রাসী, আর রাজনীতি যখন ক্ষমতাভিত্তিক হয় তখন সে রাজনীতি ক্ষমতা ভোগের মানসিকতাকেই সর্বতোভাবে পরিপুষ্ট করে তোলে। ধর্মের ভিত্তিতে তো দেশ দ্বিখণ্ডিত হলো,

কিন্তু তাতে কি সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সমস্যার সমাধান হয়েছে? আর আমাদের দেশের কোন রাজনীতি দলই তো চায় না যে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক। এই অনৈক্যকে মূলধন করেই তো আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখল ও ভোগের আন্দোলনে শক্তি সংগ্রহ করে চলেছে। হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের বিভেদকামী কাজের ইন্ধন যোগায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলিই। আর ক্ষমতাভোগই যখন রাজনীতির মূল লক্ষ্য তখন রাজনীতিক দলের প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ সমর্থনেই তো বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং ফলে দেশের ঐক্য ও সংহতিও অধিকতর বিপন্ন হচ্ছে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ সমস্যাকে কেন্দ্র করে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় যে সংকট ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে উঠছে এবং যে সংকটের মীমাংসা আজ প্রায় আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে—এই সংকটগুলি যে সব ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে তো আছে আমাদের দেশের কোন না কোন রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় সমর্থন। এই ধরণের বিপজ্জনক সমর্থনের পেছনে যদি কারণ ও যুক্তি থাকে তাহলেই কোন না কোন ভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত। আর সে স্বার্থ আর কিছু নয়—কোন না কোন ভাবে ক্ষমতা দখল করা এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লী অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রটি দখল করা। ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া প্রত্যেকটি ক্ষমতা লিপ্সু রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কাজেই আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্ষমতার বিভাজন বর্তমান আগ্রাসী রাজনৈতিক দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অথবা স্বশাসনের দাবীতে এবং নানা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভবে। দেশ স্বাধীন হবার পর আঞ্চলিক ভিত্তিতে সীমানা পুনর্বিন্যাস করে কয়েকটি নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হলো। আঞ্চলিক স্বার্থের দাবীতে আরও কয়েকটি নতুন রাজ্য ও স্বশাসিত অঞ্চল গঠনের আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং যে সব রাজ্য বা স্ব-শাসিত অঞ্চল নতুন

করে গড়েছে সেই সব রাজ্য ও অঞ্চলেও নতুন নতুন আঞ্চলিক স্বার্থের দাবীতে আরও নতুন নতুন বিভাজনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে —এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিভাজনের প্রক্রিয়ার উদ্ভব হচ্ছে – দেশের কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ইন্ধন ও মদতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফলে নতুন নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলেরও জন্ম হচ্ছে। সেজন্য দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে; একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই নানা উপদলের উদ্ভব হচ্ছে। বিভাজন যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিভাজন তেমনি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই নানা উপদলের উদ্ভব হচ্ছে। দেশে ঐক্য ও সংহতির অভাব ঘটলে স্বাভাবিক ভাবেই দেশের রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই। সেজন্যই গোটা দেশের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও নেতৃত্ব দেওয়ার মত ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলেরই থাকছে না। কিন্তু তা সত্বেও ক্ষমতার কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে দখলের জন্য কিম্বা অন্তত এই শাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ছোট বড় সব রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য এবং এই নিয়ে পারস্পরিক বিরোধেরও অন্ত নেই। এই বিরোধ দেশ শাসনের কোন নীতিগত প্রশ্নে নয়; দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার প্রশ্নেও নয়। বহু শতাব্দী ধরে দেশের নানা প্রান্তে সমাজ জীবনে যে অবিচার ও অসাম্য চলে আসছে তার প্রতিকারের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে নয়। মন ভোলানো এই ধরণের কিছু বুলি থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ অর্থাৎ কোন না কোনভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রকে দখল করা, যদি পুরোপুরি না হয়, তাহলে অন্ততঃ ভাগাভাগি করেও দখল করা। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রেরণার উৎস হচ্ছে এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ দর্শন—সব কিছুকেই এই ক্ষমতাকে নিরংকুশ করার কাজে ব্যবহার করা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে; গণতন্ত্র তখন আর গণতন্ত্র থাকে না, দলতন্ত্রে পরিণত হয়; ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর

স্বেচ্ছাচারিতা চরম আকার ধারণ করে, মূল্যবোধ বলে আর কিছু থাকে না, দুর্নীতিতে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, গোটা রাষ্ট্রজীবন ভরে ওঠে। এ সবই বর্তমান রাজনীতির ফলশ্রুতি, আর রাজনৈতিক দলগুলিই হচ্ছে এই পরিস্থিতির স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক। রাজনীতি যদি সমাজ বিজ্ঞানের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের কলাকৌশলের বিদ্যায় রূপান্তরিত হয় তাহলে সমগ্র দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাপারটি গৌণ হয়ে পড়ে, মুখ্য হয়ে পড়ে ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা ভোগ; আর এক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়ে পারে না। আবার এই অবস্থার স্বাভাবিক অনুসংগ ফল হচ্ছে ক্ষমতার দখল নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ। রাজনৈতিক দলের স্বার্থেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে দেশ বিভাজনের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, বিভাজনের প্রক্রিয়াকে চালু রাখা। আজ দেশে সত্যিই কি কোন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে? এখানে যখন সাধারণ মানুষের ভোটই একটি রাজনৈতিক দলের শাসন যন্ত্র অধিকার ও ভোগ করার মাত্রাটি নির্ধারণ করে দেয় তখন এই ভোট আদায়ের জন্য যা করার তা করতেই হবে অর্থাৎ এখানে আদর্শ, লক্ষ্য, নীতি, পথ ও পদ্ধতির কোন বাদবিচার চলে না। দেশে কেন ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠছে না তার প্রধান কারণটি হচ্ছে যে রাজনৈতিক দল বা দলগুলির উপর এই ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করা এই দলগুলির পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ব্যাপারে দেশবাসীকে নতুন বিকল্প শক্তি ও ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হবে।

উল্লিখিত বিশ্লেষণের মধ্যে যদি কোন গুরুতর ভ্রান্তি বা ভুল না থাকে তাহলে আমরা দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ব্যাপারে যে দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হচ্ছে: এক—দেশের ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাটিকেই পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। দেশ বিভাগের পর খণ্ডিত হবার পরও আমাদের দেশ একটি বিরাট মহাজাতিক দেশ, রাজনৈতিক সংজ্ঞায় একটি জাতি বললে

যা বোঝায় সেই রকম একটি কোন বিশেষ জাতির দেশ এই ভারত নয়। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির যোগফল হচ্ছে এই ভারত। সেই হিসাবে ভারত ইউরোপের মত একটি মহাদেশ। কাজেই ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলায় ভাবনায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে বিস্মৃত হলে চলবে না, এগুলির বিনাশ সাধন করে কিম্বা দুর্বল করে দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ধারণাটিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্য বিধান ও পরিশীলনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে; কিন্তু সে প্রয়োজন কিভাবে সিদ্ধ হবে তা নিধারণ করার দায়িত্ব প্রধানতঃ আঞ্চলিক অধিবাসীদেরই। বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এক নয়; উন্নতি ও অবনতির প্রশ্নে আঞ্চলিক ভিত্তিতেও বহু অসামঞ্জস্য ও সমস্যা আছে। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নমনীয় নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে কোন সংরক্ষণ বা বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নীতি নয়; উন্নয়নের ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমস্যা দূরীকরণের নীতি হবে—সমাজে সবচেয়ে নীচে পড়ে আছে যে পরিবার বা যে মানুষটি, উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজটি সেখান থেকে শুরু করা। আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের চেতনা ও মানসিকতাকে দমন করে নয়, বরঞ্চ তাকে আরও পুষ্ট ও প্রসারিত করেই দেশের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্র নামে যুক্তরাষ্ট্র হলেও কার্যতঃ এটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। দেশকে পরিচালনা করার যা কিছু ক্ষমতা ও সুযোগ একটি কেন্দ্রীয় সরকারেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিভেদের বীজ এখানেই নিহিত আছে। ক্ষমতা ও সুযোগের ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ না করে দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা যায় না। এই সিদ্ধান্ত দুটি সম্পর্কে যদি কোন গুরুতর মতদ্বৈধ না থাকে, এক মতে আসতে পারি তাহলে এই সিদ্ধান্ত দুটির অনুষঙ্গ হিসাবে আমাদের সামনে যে দুটি মূল কর্তব্য এসে যায় তা হচ্ছে: এক—যে সংবিধানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা

হয়েছে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে অর্থাৎ একটি নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে। এই সংবিধানে এককেন্দ্রিক বা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার কোন সুযোগ থাকবে না। রাজ্যগুলি হবে স্বয়ংশাসিত। প্রতিরক্ষা, আন্তরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং রাজ্যগুলির সংস্কৃতি ও তাদের সমন্বয় সাধন প্রভৃতি কয়েকটি সর্বভারতীয় বিষয় ছাড়া অন্য সর্ব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণ, অর্থসংগ্রহ ও বণ্টন, শিল্পায়ন, শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসার সাধন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এগুলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারী হবে রাজ্যগুলিই। রাজ্যগুলির সংখ্যা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই একটি রাজ্যের অধিবাসী সংখ্যা দু কোটির বেশি হওয়া উচিত নয়। ধর্ম কোন ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ রাজ্য বা স্বয়ংশাসিত অঞ্চল গঠনের ভিত্তি হতে পারে না। মানুষের জীবন দর্শনকে নির্ধারণ করা ও নির্দেশিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের একটি বিশেষ স্থান আছে কিন্তু সে ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদকেই বাড়িয়ে তোলে, মানুষের সংহতি নষ্ট করে, মানুষ মাত্রেই যে অমৃতের সন্তান—এই বিশ্ববোধও সার্বজনীন ধারণাটিকেই নস্যাৎ করে। প্রয়োজন সমন্বয়ী ধর্মের। সমস্ত ধর্মের সার বস্তুর সমন্বয়ে যা গড়ে ওঠা সম্ভব, যা অখণ্ড মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন, বিকাশ ও কল্যাণের ধর্ম, মানব ধর্ম তা একদিন এই ভারতবর্ষের মহান ভারতীয় ধর্ম বা দর্শন নামে পরিচিত ছিল। রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর একটি মানবিক ধর্মের সৃষ্টি হওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবনা ও গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত ভারতীয় সংবিধানে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের স্বীকৃতি থাকবে না। প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের জীবনধারা পরিচালিত হবে এই ভারতীয় সাংবিধানিক অনুশাসনের কাঠামোর মধ্যেই।

রাজ্য ও স্বশাসিত অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণের

একমাত্র মাপকাটি প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং সম্পদ সংগ্রহ ও বিকাশের উৎস ও সুযোগ এবং সর্বোপরি মানবিক অনুভূতি এ সবগুলিকেই পৃথক রাজ্য বা স্বয়ংশাসিত অঞ্চল গঠনের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এই অনুভূতির পার্থক্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সমতলবাসীদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতার পার্থক্য, তেমনি সত্য দক্ষিণ বিহার ও উত্তর বিহারের মানুষের সামাজিক স্তরের পার্থক্য, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনজীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য। এই পার্থক্য যেমন রাজ্যে রাজ্যে, তেমনি একই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। এই পার্থক্যগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নয়, সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষিত করে তারই ভিত্তিতে রাজ্যগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন স্বয়ংশাসিত অঞ্চল সৃষ্টির প্রয়োজন হবে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা এই বহুমাত্রিক স্বয়ংশাসিত আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের ভিত্তিই হচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা। আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু আছে, পরিভাষায় তার অর্থ যাই হোক না কেন, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নয়। কাজেই দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হলে একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজন হবেই আর সংবিধানের সমস্ত অনুশাসনের প্রধান লক্ষ্য হবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। আর দ্বিতীয় কর্তব্যটি হচ্ছে : ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্যুত করা। সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থ যদি ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা দখল করা হয়, তাহলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবেই। ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নিত্য নূতন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হবে এবং ক্ষমতার দখল ও ভাগাভাগি নিয়ে সেক্ষেত্রে নির্বাচনী পদ্ধতিকে কলুষমুক্ত করা যাবে না। সমাজজীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের স্রোত ক্রমশই দুর্বার হয়ে উঠবে, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতালাভের শক্তি দেশের নানা প্রান্তে নানা সমস্যা ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে মূলধন

করে প্রবল আকারে দেখা দেবেই। এই অবস্থায় দেশের ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। আমরা তো আজ সেই রকম একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই বাস করছি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে গণতন্ত্র ও দলতন্ত্র এক জিনিষ নয়। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেই দলতন্ত্রের প্রসার ঘটে, সে দলতন্ত্র এক-দলীয় হোক বা বহুদলীয় হোক। দলতন্ত্রে দলের শাসনই প্রধান, গণ অর্থাৎ জনসাধারণের ভূমিকা এখানে সম্পূর্ণ গৌণ ও নগণ্য। কাজেই রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য ও অনস্বীকার্য—এই ধারণাকে বর্জন করে একটি দলহীন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। এ শুধু দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রসারের স্বার্থেই নয়, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মানসিকতা ও শক্তি যে সর্বত্র উগ্র হয়ে দেখা দিচ্ছে এই ক্রমবর্ধমান অশুভ প্রবণতা ও শক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে, সারা দেশব্যাপী ঐক্য ও সংহতির সুস্থ বাতাবরণ গড়ে তুলতে হলে ক্ষমতা-ভিত্তিক রাজনীতির অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরেই শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিদেশে সর্বত্র নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় ভাবিত বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির বহু লেখা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে; দেশেবিদেশে বিষয়টির উপর নানা গবেষণাও চলছে। প্রথিতযশা সমাজ বিজ্ঞানীরাও বর্তমান জটিল সমাজ বিবর্তনের পথে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার প্রভাব, তার কোন প্রতিফলন হচ্ছে কিনা তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখছেন। বলা যায়, বিষয়টি আর কোন বিশেষ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—ইতিমধ্যেই বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রাম উন্নয়ন, দেশ গঠন ও সমাজ সংগঠনের কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের কাছে তাঁদের আরব্ধ কর্মকাণ্ডে স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই; কেননা, তারা স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে দায়বদ্ধ হয়েই তো সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। কাজেই স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোন বিতর্ক সৃষ্টি করা বা বিষয়টি নিয়ে নতুন করে কোন আলোচনার সূত্রপাত করা তাঁদের কাছে নিতান্ত অবান্তর ও একেবারে অর্থহীন। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার প্রকৃত স্বরূপটি কি বুঝতে হলে সমাজসেবা ও গ্রাম উন্নয়ন কাজে ব্রতী কর্মীদের নিজেদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে এই সম্পর্কেও বহু কর্ম শিবির ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ যে কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। আমাদের দেশে বহু সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানও তাঁদের

অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ও সমাজ সংগঠনের কাজে স্বামীজীর সমাজ ভাবনার উপযোগিতাকে আজ আর কেউই অস্বীকার করছেন না। পূর্ণস্বীকৃতি দিয়েই চলার চেষ্টা করছেন, কাজেই স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা—এটি আমাদের সকলের কাছেই একটি প্রশ্নাতীত অনস্বীকার্য বিষয়।

বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনার অবকাশ কোথায় এবং তার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে; তা ছাড়া বিষয়টি নিছক আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয় নয়, বিষয়টির সঙ্গে আমাদের সকলের সামাজিক ব্যক্তি ও সমাজকর্মী হিসাবে একটি গুরুতর দায়দায়িত্ব রয়ে গেছে। এই দায়-দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে অথবা লঘু করে দেখে চলার অভ্যাস ও মানসিকতাটিকে যদি বর্জন করতে না পারি অর্থাৎ এই আলোচনা ও পর্যালোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের সামনে যে কর্তব্য আত্মপ্রকাশ করে, অবিচল নিষ্ঠার সংগে সেই কর্তব্য পালনে যদি আমরা দৃঢ় সংকল্প না হই তাহলে এই সব আলোচনার কোন সার্থকতাই থাকে না। বিষয়টি নিয়ে তাই সত্যই যদি আমরা কোন আলোচনা ও পর্যালোচনায় ব্রতী হতে চাই, তাহলে আমাদের কিছুটা স্বামী বিবেকানন্দের মানসিকতার অনুসারী হতেই হবে। তা যদি না হই, তাহলে বুঝতে হবে, স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোন আলোচনা একেবারে অর্থহীন—সমাজ কল্যাণের নামে তা হবে একটি প্রতারণা মাত্র। জাতীয় জীবনে স্বামীজী কোন ভণ্ডামী, নীচতা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেননি; যেখানে দুর্বলতা সেখানে কঠোরভাবে কষাঘাত করেছেন; যেখানে দেখেছেন সীমাবদ্ধতা, তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য সমগ্র দেশবাসী বিশেষভাবে দেশের যুব সমাজকে উদাত্ত আহ্বান দিয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তাই নতুন করে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে স্বামীজীর এই অমোঘ নির্দেশের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

স্বামীজীর গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—মন মুখ এক করা চাই—কথাটি অতি সাধারণ ও খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কথাটির গুরুত্ব ও ব্যঞ্জনা অনেক গভীর ও সুদূর প্রসারী; নিত্য নতুন আলোকে উদ্ভাসিত, মানুষের আত্মপোলব্ধির ও মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে শাশ্বত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে চলেছে। এই চিরায়ত মূল্যবান উক্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই উক্তির সঙ্গেই যে আর একটি মূল্যবান কথা যুক্ত করলেন তা হচ্ছে—কথা ও কাজ এক হওয়া চাই। আজ আমাদের কথার সংগে কাজের কোন মিল থাকে না—এটি বর্তমানে আমাদের জাতীয় চরিত্রে মূল ত্রুটি। 'এক টন কথার চেয়ে এক আউন্স কাজ অনেক ভাল, বহু গুণ শ্রেষ্ঠ'—এটি হচ্ছে স্বামীজীর উক্তি। ফাঁকি-বাজীর আশ্রয় নিয়ে জগতে কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না। স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধরণের কোন মন্তব্যের অবতারণা করা হয়ত অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে—কিন্তু একথা স্মরণ করা দরকার—দেশবাসী ও সমাজ কর্মীদের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার সঙ্গে স্বামীজীর সমাজ ভাবনার বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে। শেষোক্ত বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতাকে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকেও স্বাভাবিকভাবে অস্বীকার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা যতই গুরুগম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার কোন মূল্য থাকে না। এই কঠোর সত্যকে তুলে ধরে স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিকে এখানে উপস্থাপিত করা হচ্ছে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, সমগ্র মানব সমাজের মৌল প্রয়োজনের দাবীতে। আজ শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র মানবসভ্যতাই একটি গুরুতর সংকটের আবর্তে প্রায় নিমজ্জমান: এই সংকট থেকে গোটা মানব সমাজকে মুক্ত হতেই হবে। বুঝতে হবে আমাদের এলাকা-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম উন্নয়ন ও সমাজ সংগঠনের কর্মসূচীর মধ্যেই

স্বামীজীর সমাজ ভাবনার গণ্ডী সীমাবদ্ধ নয়। এই সমাজ ভাবনার একটি সার্বজনীন আবেদন আছেই, এই সমাজ ভাবনা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ ও উত্তরণের জন্য। তাই বিশাল বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই আজ স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিকে শুধু পর্যালোচনা নয়, গভীরভাবে অনুধ্যান ও অনুশীলন করারও প্রয়োজন হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিষয়টি একটি অসাধারণ গুরুত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সহানুভূতি থেকেই আমাদের বিষয়টির সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন ; তাই যাঁরা সমাজ সেবার কাজে ব্রতী তাঁদের নতুন করে ভাবারও বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের প্রায় দেড়শ বছর পরে আমরা স্বামীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবছি ; না ভেবে আমাদের সামনে কোন বিকল্প পথ খোলা নেই বলেই আমরা তা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি আজ এমনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং আগামী দিনে এই পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে তা যদি লক্ষ্য করি তা হলেই একথা দৃঢ়তার সংগেই বলা যায়—স্বামীজীর সমাজ ভাবনা শুধু আমাদের কাছে নয়, সমগ্র বিশ্ব মানবের সমাজ জীবনে একান্ত প্রাসঙ্গিক ও একেবারে অনস্বীকার্য। এ কোন গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী নয় ; কোন রহস্যবাদী অলৌকিক উক্তিও নয়, সত্যদ্রষ্টা ঋষির কথাও নয় ; সমাজ বিজ্ঞানের একজন অতি সাধারণ ছাত্র হিসাবেই এই ধরণের একটি অভিমত উপস্থিত করা যায় যে আগামী পঞ্চাশ বছরে সমগ্র মানব সমাজ যে যুগটির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে, সে যুগটি মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দের যুগ, আর এই বিবেকানন্দ নিছক কোন ব্যক্তি বিবেকানন্দ নয়, স্বামী বিবেকানন্দের যুগ। এই ধরণের একটি অভিমত এখুনি হয়ত অনেকের কাছে সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে—এই ধরণের অভিমতের পেছনে হেতুটি কোথায়, আর যুক্তিই বা কি। সেজন্য প্রসঙ্গটি নতুন করে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন হবে। তবে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার

আগে স্বামীজীর সমাজ ভাবনা বলতে আমরা কি বুঝি সে সম্পর্কে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা গড়ে তোলা দরকার এবং এই ব্যাপারে একটি ঐক্যমতে আসাও প্রয়োজন।

১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০২ সাল—এই দশটি বছর যদি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকের জীবনটিকে তাঁর কর্মময় ও ব্যবহারিক জীবন বলে মনে করি. তাহলে দেখা যাবে তিনি কখনও হিন্দু ধর্ম তথা বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবক্তা, অথবা কখনও ভারতীয় গণজাগরণের এক চারণ কবি ও আপোসহীন সংগ্রামের এক বীর সেনাপতি, কখনও তিনি আধ্যাত্ম জগতের মহান সাধক, আবার কখনও তিনি অমৃতপ্রাণ সমাজ বিপ্লবী. শোষিত, নিপীড়িত, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর পরম বন্ধু ও মহান পরিত্রাতা, কখনও তিনি বলিষ্ঠ সমাজ সংগঠক. আবার কখনও তিনি অসাধারণ মানব প্রেমিক, নতুন ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ পথিকৃত, অনির্বাণ আলোর দিশারী। এই যে যুগপৎ একাধিক সত্ত্বার প্রকাশ লক্ষ্য করি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে তা থেকেই তাঁর প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করা অনেকের কাছে অসুবিধাজনক হয় বলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী থেকে স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে এবং এখনও পর্যন্ত তিনি সেই ভাবেই ব্যাখ্যা হয়ে আসছেন। বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাপকাঠি সর্বত্র অভিন্ন নয় বলেই স্বামীজীর পূর্ণ সত্ত্বাটির স্বরূপ যদি দুর্বোধ্য থেকে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেউ ভেবেছেন স্বামী বিবেকানন্দ একজন গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী, ধর্মপ্রচারক, আবার কারও কাছে তিনি একজন বলিষ্ঠ সমাজ সংগঠক। একের কাছে তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী; আবার অন্যের কাছে তিনি ঘোর আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী। কিন্তু পূর্ণাংগ বিশ্লেষণে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একটি পূর্ণ মানব সত্ত্বারই সন্ধান পাই। ক্ষেত্র ও কাল অনুযায়ী সেই অখণ্ড সত্ত্বারই নানা প্রকাশ ঘটেছে মাত্র তার মধ্যে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনা, কোন খণ্ড সমাজ ভাবনা বা সমাজ সংগঠনের কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা চলে না।

এখানে মনের চিন্তা ও আধ্যাত্ম জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, পুঁজি ও শ্রম, সমাজ ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমষ্টি—আপাতদৃষ্টিতে যেগুলির সম্পর্ক বিপরীত ধর্মী ও ভেদসম্পন্ন বসে মনে হয় সেগুলি যে বস্তুত অভেদ এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির ঐতিহাসিক ধারায় পরস্পর ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত ও সঞ্চারণশীল ও ক্রমপ্রবাহমান—এই সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্য যুগনায়ক মহাপুরুষ ও মনীষীদের মত যে উপলব্ধি করেছিলেন শুধু তাই নয়, কিভাবে বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের মনোরাজ্যে এই অভেদ তত্ত্বের চিন্তা ও ধারণা ক্রিয়াশীল, বাস্তবে তা যে রূপায়িত হওয়া খুবই সম্ভব এবং তা আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে যাচ্ছে—এই বাস্তব ঘটনাটিকে দেখার মত দৃষ্টিশক্তি যা আমরা বিভিন্ন অবস্থার চাপে হারাতে বসেছিলাম, সেই হারানো দৃষ্টিশক্তিকেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মানুষ, মানুষের সমাজ ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণা, এই ধারণা মূলগতভাবে আমাদের প্রাচীন বেদান্তের ধারণা যা স্বামী বিবেকানন্দ অতি সহজ ও স্বচ্ছভাবে আয়ত্ব করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। সেই গুরুরই অমোঘ নির্দেশে তিনি শুধু তার দেশবাসীর কাছে নয় বিশ্বমানবের কাছে তুলে ধরেছেন। সেই সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধারণারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে স্বামীজীর সমাজ ভাবনা; কোন স্থানীয় বা বিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্যে এই ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটছে না। সমস্ত মৌলিক ভাবনার পিছনে থাকে একটি মহৎ ভাব, আর এই মহৎ ভাব থেকেই মৌলিক ভাবনার উদ্ভব হয়ে থাকে। স্বামীজীর সমাজ ভাবনা মানব সমাজের জীবনে সমাজ বিবর্তনের পথে একটি মহৎ ভাব সম্পন্ন মৌলিক ভাবনা। এটি যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রকেই সমাজ ভাবনা সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়েই বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

স্বামীজীর সমাজ ভাবনার উৎস সন্ধানে যদি আমরা যাই, এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আমার সময়কার একটি

ছোট ঘটনার কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় প্রচণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পর নরেন্দ্রনাথের সংসার ত্যাগের বাসনা প্রবল হয়ে উঠে। নরেন্দ্রনাথ কিভাবে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করতে পারেন এবং সংসারের সমস্ত মোহ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারেন তার সন্ধান বলে দেওয়ার জন্য তিনি তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ব্যাকুল আকুতি জানান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের সেই ব্যাকুলতায় বিচলিত না হয়ে তাঁকে তীব্র ভৎর্সনা করে বলেন: ছিঃ নরেন, এ তুই কি বলছিস. আমি যে তোর সম্পর্কে অনেক আশা করে বসে আছি। তুই কোথায় হবি একটি বিরাট বটবৃক্ষ, বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত ও প্রসারিত, তোর ছায়ায় শত শত পরিশ্রান্ত হতাশায় অবসন্ন মানুষ এসে দাঁড়াবে, ক্লান্তি দূর করবে, নতুন শক্তি নিয়ে তাদের পথে নতুন করে যাত্রা শুরু করবে, তুই কোথায় তাদের সেই চলার পথ দেখাবি, তা না করে তুই নিজের সুখ চাইছিস, মুক্তি কামনা করছিস?'··· ···শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মানস নয়ন একেবারে উন্মীলিত হয়ে গেল—ঈশ্বর প্রাপ্তি, ধর্মপোলব্ধি, আধ্যাত্ম সাধনা সমস্ত কিছু গূঢ় তত্ত্বের এমন সহজ মীমাংসা ও সরল উত্তর, জীবন জিজ্ঞাসার সব উত্তর নরেন এক নিমেষে পেয়ে গেলেন। মানুষকে ভালবাসা, ভালবেসে তাদের জন্য কাজ করা, তাদের দুঃখ মোচনে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করা—তাদের সুখ, শান্তি ও মুক্তির মধ্যেই তাঁর জীবনের পরম শান্তি ও চরম মুক্তি এই সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথ একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন; গভীর আবেগের সংগে বলে উঠলেন—অনেক দর্শন পড়েছি, বহু ধর্ম শাস্ত্রের কথা শুনেছি, বহু মনীষী ও সাধুর সংগে সঙ্গলাভ ঘটেছে, কিন্তু মুক্তিলাভের এমন পথের কথা এমনভাবে এর আগে কোথাও শুনিনি। ঐ একটি উক্তিতেই নরেন্দ্রনাথের সাধক জীবনের দীক্ষা হয়ে গেল। বলা যায়, ঐ দিনই ঐ ঘটনার মধ্যেই সিমলার নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার প্রকৃত অর্থ জানার ও স্বরূপ

উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই সমাজ কর্মীদের অনেকের কাছেই ঘটনাটি জানা সত্বেও পুনঃ উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম। শিব জ্ঞানে জীব সেবা—যা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবনের মূল মন্ত্র, যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর সীমিত জীবদ্দশার মধ্যেই মুষ্টিমেয় গুরুভাই ও গৃহী ভক্তদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। এই ধরণের আর একটি উক্তির আমরা সন্ধান পাই যার মধ্যে স্বামীজীর সমস্ত আধ্যাত্ম সাধনা ও সমাজ ভাবনার মূল সূত্র নিহিত; দেখা যায় এখানে জীব সেবা, অর্থাৎ মানুষের সেবা ও আধ্যাত্ম সাধনা পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্ম ও লীন হয়ে গেছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবস্থান এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনই দেবত্ব প্রাপ্তি এবং শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সৎভাবে মানুষ যদি ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে তাহলে তার মধ্যেই তার ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে যায়। এখানে নিরাকার ও সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কোন বিবাদ, বিতর্ক এমন কি কোন প্রশ্নের আর অবকাশ থাকে না।

পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে সমাজ দর্শন সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা হচ্ছে—ধর্ম সাধনা সেখানে অপর অনেকগুলি কর্তব্য কাজের অন্যতম, সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনের কর্তব্য; কিন্তু ভারতবর্ষে মানুষের প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে ধর্ম সাধনা, এখানে কাজ ও ধর্ম সাধনা অভিন্ন। পাশ্চাত্যে রিলিজিয়ন কথাটি সমার্থকও নয় ভারতীয় ধর্মের; এখানে ধর্মের আবেদন আরও অনেক বৃহৎ। এখানে ধর্মে নানা পদ্ধতি ও উপচারকে কেন্দ্র করে নানা বিচ্যুতি ও ব্যভিচার ঘটেছে সত্য, কিন্তু তবুও ধর্মকে কেন্দ্র করে এখানে মানুষের জীবন ও জীবন সাধনা, ধর্মকে ভিত্তি করেই ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আর তা হয়েছে বলেই ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীতে প্রাচীনতম সভ্যতা হয়েও আজও তা কালজয়ী, এখানে ধর্ম ও দর্শন অভিন্ন যার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও মেলে না। ভারতে বহু ধর্মের আবির্ভাব ঘটলেও বেদান্তই হচ্ছে এই সব ধর্মের মূল ভিত্তি, আর বেদান্তের ধর্ম কোন বিশেষ

মহাপুরুষ বা অবতারের সৃষ্ট ধর্ম নয়। চরিত্র বৈশিষ্ট্যে এই ধর্ম সমন্বয়ের ধর্ম — ধর্ম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ব্যাখ্যা — যত মত তত পথ। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে অকাট্য যুক্তি ও সত্যের বলে তা হচ্ছে : পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেখানে ধর্ম বিস্তার ও ধর্মান্তরকরণের নীতি গৃহীত ও অবলম্বিত হয়েছে কিন্তু ভারতীয় হিন্দু ধর্মে এই নীতির কোন স্থান নেই, এখানে ধর্মে ধর্মে শুধু সহযোগিতার কথাই বলা হয়নি, মানুষের জীবনে পূর্ণতা লাভের জন্য অন্য ধর্মে যা কিছু ভালো দ্বিধাহীন ভাবে সেই ভালোকে গ্রহণ করার কথাই জোরের সংগে বলা হয়েছে ; কিন্তু এই ধর্ম সাধনা পার্থিব কর্তব্যকে অস্বীকার করে নয়, অবহেলা করে নয়। প্রতিটি কর্মই পবিত্র ; নির্ধারিত কর্মকে সুসম্পন্ন করার মধ্যেই ধর্মের প্রকৃত সাধনা ও সাফল্য। কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে পার্থিব জীবন ও জগতে যা প্রয়োজন, তাকে এড়িয়ে চলার অর্থই ব্যক্তি জীবনকে অস্বীকার করা ; এই ধারণা ধর্ম সাধনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বামীজী যখন বলেন—ক্ষুধার্ত পেটে ধর্ম হয় না, এটি তাঁর কোন মামুলি উক্তি নয়, এটি এদেশে ধর্ম সাধনার প্রাথমিক মৌল দাবী এবং সেজন্যই এদেশে ধর্ম সাধনার মধ্যে মানুষের সেবার কাজটি এতটা প্রাধান্য লাভ করেছে। সেবা কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখি, কিন্তু সেই সংগে তাঁর ধারণার একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ছবিও আমরা লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি, সেবার কাজটি ব্যক্তি সেবা থেকে সমষ্টি উন্নয়নের কাজে রূপান্তর ঘটছে এবং পরিণতি ঘটছে সমাজ রূপান্তরে বা একটি নতুন ধরণের সমাজ বিপ্লবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারতম্য অনুযায়ী সেবা কথাটি যদিও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু এই বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করলে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। নিঃস্বার্থ ও আসক্তিহীন সেবাকে স্বামীজী কোনক্রমেই উদ্দেশ্যহীন কর্তব্য বলে মনে করেন নি। সেবার মাধ্যমে যেমন সেবা গ্রহীতার আত্মবিশ্বাসকে

জাগাতে হবে, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এই সেবার মধ্যে গ্রহীতার সত্তার একটি রূপান্তর বা বিকাশের ধারণাও আছে, তেমনি ধারণা আছে সেবকের জীবন-দর্শন ও মানসিকতা ক্রমবিকাশের। এই ধারণারই পরিণতি ঘটছে একজন কর্মীর সমাজ ভাবনায়।

আবার স্বামীজীর কাছে সেবামূলক কাজ নিছক কোন উপকারমূলক কাজও নয়, এমনকি সাধারণ অর্থে উন্নয়নমূলক কাজও নয়, ব্যক্তিজীবন এবং সামাজিক পরিস্থিতিকে নতুন করে গড়ে তোলারই কাজ। যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—হ্যাঁরে তুই উপকার করার কে, সেবার মাধ্যমে মানুষের পূজা কর, তখন সেবা কথাটি আর তার সাধারণ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, একটি নতুন ব্যঞ্জনা নিয়েই দেখা। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার ধ্যান ধারণা এই মূল সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—তার নানা উক্তি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি কোথাও বলেছেন—আমি একজন ব্যবহারিক বৈদান্তিক (Practical Vadantist) আবার কোথাও বলেছেন আমি একজন সমাজতন্ত্রী (Socialist) আবার কোথাও এই বলেও নিজের পরিচয় দিচ্ছেন আমি একজন বৈপ্লবিক (Revolutionary) – কোন Tit Bit সংস্কারে (Reforms) আমি বিশ্বাসী নই। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারে বারে ঘোষণা করেছেন—জাতীয় জীবনে আমরা দুটি গুরুতর পাপের শিকার হয়েছি। পাপ দুটি হচ্ছে : (১) আমাদের দেশবাসীর একটি বৃহত্তম অংশকে পদদলিত করে রেখেছি, একটি অতি নিম্নস্তরের জীবন যাপনে বাধ্য করছি এবং তাদের স্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি; এবং (২) সমাজ জীবনে নারী জাতিকে কোন যোগ্য স্থান দিতে চাইনি, এক হীন অসম্মানজনক অবস্থার মধ্যে বাস করা ছাড়া তাদের কাছে আমরা অন্য পথ খোলা রাখিনি। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারে স্বামী বিবেকানন্দ যে পথ বা ব্যবস্থাটিকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও চূড়ান্ত বলে নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে :—শিক্ষা,-শিক্ষা,-শিক্ষা। সেইজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান দুটি কাজই হচ্ছে সেবা ও শিক্ষা। কিন্তু যে শিক্ষা

তাঁর সময়ে চালু ছিল এবং আজও চলছে—এই শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর ধারণায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে :—মানুষ তৈরী করা (Man making) যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে (Character Building); এই শিক্ষার সঙ্গে কেরাণী, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। চালু শিক্ষার ফল (Output) সম্পর্কে স্বামীজীর অতি রূঢ় নির্মম উক্তি – Graduates are traitors who having the education at the cost of the people do not fulfil the social commitment. তিনি মনে করতেন, অগণিত মানুষের মধ্যে যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণের উপাদান নিহিত আছে, তথাকথিত স্কুল কলেজের বাইরেও তাদের কর্মমানের উন্নয়ন ও জীবনের গুণগত মান সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ আছে—প্রয়োজন একটু সহানুভূতি নিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং পৃথিবীর নতুন নতুন জ্ঞানের বিষয়গুলি তাদের পরিবেশের মধ্যেই সহজভাবে তুলে ধরা।

স্বাক্ষরতার শিক্ষাটি অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু এই শিক্ষার কাজটি কি দেশের শিক্ষিত সমাজ তাদের সামাজিক জীবনে অবশ্য কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে পারে না ? বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, উপর থেকে পরিকল্পনা করে কর্মসূচী নির্ধারণ করে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না স্বামী বিবেকানন্দ, বলা যায়, ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সেই অনবদ্য বাণীটির কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয় : পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য একটি গ্রামে নিয়োজিত করলেও গ্রামটির যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হল, গ্রামের মানুষ প্রকৃত শক্তিমান হয়ে উঠল তা ভাবা যায় না। ব্যবহারিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী ও স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, এই সত্যটি স্বামীজীর মত এমন করে আর কেউ কি তুলে ধরতে পেরেছেন ? রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের চিন্তা যদি দেশের সাধারণ মানুষের চেতনা ও প্রয়োজনের অনুভূতি ও তাগিদের ভিত্তিতে গড়ে না উঠে, তাহলে রাষ্ট্র সেখানে শোষণ ও মুষ্টিমেয়ের প্রভুত্ব স্থাপনের কেন্দ্র

হয়ে উঠে, গণতন্ত্র মুষ্টিমেয়ের স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা জনস্বার্থের পরিপন্থী, ব্যক্তি মানুষের পূর্ণতা লাভের পক্ষে প্রতিবন্ধক এবং মানব সমাজের কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর –এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণী আজ আমাদের কারও কাছেও অজানা নয়। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনি অকুণ্ঠ স্বাগত জানিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল ভিত্তিই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে আমাদের দেশের অনগ্রসরতাকে দূর করা এবং একটি সুস্থ স্বাবলম্বী এবং সমৃদ্ধ জাতীয় জীবন গড়ে তোলা যে অসম্ভব, তা স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবে বুঝেছিলেন এবং এই বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার জন্য তিনি আমাদের যুব সমাজকে যেভাবে আহ্বান করেছিলেন এমন কণ্ঠে এবং দ্বিধাহীন ভাষায় ইদানীংকালে কোন সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে অস্পষ্টতা লক্ষ্য করি স্বামীজির সমাজ চিন্তায় তার লেশ মাত্র ছিল না। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে কোনদিন মানুষের পূর্ণতা লাভের পক্ষে যে একমাত্র প্রয়োজন এইরূপ কোন সর্বাত্মক গুরুত্ব তিনি আরোপ করেন নি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কেও আমাদের যথেষ্ট অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানভিত্তিক যে জ্ঞান তা স্বামীজীর উপলব্ধিজাত জ্ঞানাতীত যে জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত বা চৈতন্য নামে আখ্যাত তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। মানুষের জৈব প্রয়োজনে বিজ্ঞানের অবদান নিঃসন্দেহে অতীব মূল্যবান এবং সে অবদানের সম্ভাবনা আজ সীমাহীন, কিন্তু এই বিজ্ঞান যদি জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে এই বিজ্ঞান সমগ্র মানব জাতির ঘোরতর অকল্যাণের কারণ হয়ে উঠতে পারে—এই সত্য স্বামীজীর সমাজ ভাবনায় যেভাবে উপলব্ধি হয়েছিল এবং এই বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও ব্যভিচার সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের কাছে বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানগর্বী মানুষের কাছে স্বামীজী যেভাবে ঘোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন, বর্তমানকালে তার অসংখ্য নজির মিলবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ শূদ্র জাতির জয়গান করে গেছেন। শূদ্র কথাটিকে

স্বামীজী একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতেন। স্বামীজীর শূদ্র হচ্ছেন শ্রমজীবী মানুষ যাঁরা সবরকম অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করেও পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ সৃষ্টি করে। স্বামীজী এই শূদ্র জাতির অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন ; তারা যে সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল নিয়ামক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না—এই প্রত্যয়ের কথা তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শূদ্র অভ্যুত্থান যে কোন শিল্প উন্নত দেশে হবে না, হবে রাশিয়া ও চীন দেশে তা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করে গেছেন। ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা—কোন শিল্প উন্নত দেশেই শূদ্র অভ্যুত্থান অর্থাৎ শ্রমিক বিপ্লব ঘটেনি, শ্রমিকের রাজত্ব অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজতন্ত্র যদি কোথাও হয়ে থাকে যা পরবর্তীকালে দাবী করা হয়েছে, তা প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে এবং ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি অনুন্নত দেশে। তা হলে স্বামীজীর এই বিশ্বাসের ঘোষণাটি ছিল কি কোন দৈববাণী ; আদৌ তা নয়। সমাজ বিবর্তনের মূল ধারাটিকে স্বামীজী গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী স্বরূপটি তিনি একটি গভীর অনুধ্যানের ফলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ইদানিংকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী। এই সংগে অধিকতর বিস্ময়ের সংগে স্মরণ করতে হয় যে স্বামী বিবেকানন্দ এই শূদ্র নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থাটিকে স্বাগত জানিয়েও, এটি যে শ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা এমনকি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা তা মনে করেন নি। এই সমাজ ব্যবস্থার অর্থাৎ তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং শেষ পর্যন্ত এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও ব্যক্তি, মানুষ ও মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণে ব্যর্থ হবে, সে সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। স্বামীজীর ভাবনায় যে সমাজ ব্যবস্থাকে সর্ব মানবের ও সর্বকালের গ্রহণযোগ্য ও সর্বোত্তম সমাজব্যবস্থা যে আমাদের কাছে উপস্থিত করে গেছেন, তা হচ্ছে :—চারটি মহৎ গুণের ভিত্তিতে

প্রাচীন ভারতে যে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেই চারটি মহৎ গুণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সাহস ও শক্তি, বৈশ্যের অর্থনীতি ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধির তত্ত্ব এবং শূদ্র অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা—এই চারটি মৌলিক গুণের সমন্বয়ে যে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তাই হবে আগামীদিনের মানব সমাজের কাছে শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের ছিল আমাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান, তাঁর জীবনের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশ।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার একটি ক্ষুদ্র মডেল বা রূপরেখা। স্বামীজীর সমাজ ভাবনার সব দিকগুলি যে তুলে ধরা হল এখানে তা দাবী করা হচ্ছে না। আমাদের দেশে যারা সমাজ সেবা ও গ্রামোন্নয়ন কিংবা দেশ গঠনে ব্রতী হয়েছেন এবং আগামী দিনে যারা এই কাজে ব্রতী হবেন, কোন্ বাতাবরণে তারা সেই কাজে অগ্রসর হবেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার একটি রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা হল মাত্র। এ সম্পর্কে স্বামীজীর লিখিত মাত্র দু'খানি বইয়ের উল্লেখ করা যায়, যে বই দু'টি একটু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে স্বামীজীর সমাজ ভাবনার সমগ্র রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই বই দু'টি হচ্ছে—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ও বর্তমান ভারত। প্রায় একশো বছর আগে উপস্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনা—এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে আজও আমাদের দেশে সমাজকর্মীদের কাছে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বুঝতে হলে এই প্রসঙ্গে আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবশ্যই বোঝার দরকার হবে তা হচ্ছে: বিগত নব্বই বছর ধরে আমাদের দেশ ও সমগ্র পৃথিবী কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং আজ সেই পরিস্থিতি আমাদের সামনে কি আকারে এসে হাজির হয়েছে—তা' জানা ও বোঝা। এই লেখার সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমগ্র মানব সভ্যতাই আজ ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন এবং এই সংকটের আভাস স্বামীজী তার জীবদ্দশাতেই

দিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশের বহু মনীষী এই সংকট নিয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আজও করছেন। সংকট শুধু আজ আমাদের মত অনগ্রসর দেশেই নয়, শিল্পোন্নত প্রাচুর্য্যময় উন্নত দেশেও। কেবলমাত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে নয়, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও এই সংকট ঘনীভূত এবং এই সংকটের অশুভ প্রকোপ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও মুক্ত থাকতে পারে না। বর্তমান পরিস্থিতির স্বরূপটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি না করি তাহলে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করি না কেন তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়ে পারে না। সেজন্য বর্তমান পরিস্থিতির যথার্থ বিশ্লেষণের বিষয়টি আমাদের সমস্ত সেবা ও গঠনমূলক কাজের অংগীভূত হওয়া যথেষ্ট প্রয়োজন। আমাদের সমাজসেবী কর্মীদের কাজের আদর্শ ও লক্ষ্য কি হবে, কাজের ধারা ও পদ্ধতি কি হবে, কোন কোন কর্মসূচীকে তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন, গ্রাম-সংগঠনের রূপটি কি হবে এবং সর্বোপরি এই যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সমাজ কর্মীদের ভূমিকা কি হবে, এ সবই সঠিক-ভাবে নির্ধারিত হতে পারে, আমরা কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি এবং এই পরিস্থিতির গতি কোন দিকে মোড় নেবে তা সঠিক নির্ধারণের উপর। বিষয়টি বিশদ আলোচনার জন্য আর একটি লেখার প্রয়োজন হবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী বিরেশ্বরানন্দের একটি ইংরাজী উদ্ধৃতি দিয়ে এই লেখাটি শেষ করতে চাই : স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়টির গুরুত্ব কতখানি তা' অনেকখানি স্পষ্ট হবে। "Rebuilt-India"s পুস্তিকাটির মুখবন্ধে স্বামী বিরেশ্বরানন্দ লিখছেন—"Since independence, there has been a great deal of enthusiasm, specially among our young men, to rebuilt our Nation ; it is very commandable, but then, before one takes up this work one must have a clear idea of the India that is to

be ....an engineer before he begins the construction of a building, he first gets complete information as to what purpose the building will be used — School, Hospital, Public Office or residence ? After that, he draws the plan and then constructs the building accordingly. So we too must have a clear picture for the future India, then begin building the nation." আমাদের প্রয়োজন অন্ন চাই, স্বাস্থ্য চাই, শিক্ষা চাই, উন্নতমানের জীবিকা ধারণের ব্যবস্থা চাই। কিন্তু তিনি বলেছেন—Something more is to be required besides all these. এই অত্যাবশ্যকীয় অতিরিক্ত প্রয়োজনটি কি এবং এর প্রয়োজনটির পূরণ কি ভাবে সম্ভব তা বর্তমানকালে মানব সমাজের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নেরই মীমাংসার পথ নির্দেশ করে গেছেন প্রায় একশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ আর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন তাঁর নিজের দেশবাসীর উপর —একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়ে। সেই প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়েই তিনি ডাক দিয়ে যেতে পেরেছেন—"ভারত এবার কেন্দ্র"। সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যাঁরা ব্রতী সেইজন্যই তাঁদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার বিষয়টি কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক শুধু তাই নয়, স্বামীজীর সমাজ ভাবনার পরিকাঠামোর মধ্য দিয়েই তাঁদের অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের সামনে খোলা নেই, এই সত্যকে তাদের উপলব্ধি করতেই হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রাম উন্নয়নের চিন্তা ও কাজ

স্থিতাবস্থাকে মেনে নেওয়া অর্থাৎ আমরা যে যেখানে আছি সেই অবস্থায় পড়ে থাকা জীবনের ধর্ম নয়। জগৎ কথাটির মধ্যেই একটি নিত্যক্রিয়াশীল গতি অন্তর্নিহিত আছে; যেহেতু আমরা মানুষ এই বৃহৎ বিশ্বজগতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই আমাদেরও গতিশীল হতেই হবে; চরৈবেতি হচ্ছে তাই আমাদের কাছে সরকারের অমোঘ আহ্বান। একটি সামাজিক পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েই যেমন আমাদের অগ্রসর হতে হয় এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য আমরা যদি এই সামাজিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করি তবেই সমাজের পরিবর্তন ঘটে, নতুন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়—এটি হচ্ছে বিজ্ঞানের মৌলিক কথা মানুষের সমাজ দর্শন, আবার জীবন চর্চার মাধ্যমে চলতি জীবন থেকে নৈতিক জীবনের দিকে যে যাত্রা তাই হচ্ছে মানুষের জীবন দর্শন। যে ব্যক্তি বা জাতির জীবনে এই জীবন দর্শন ও সমাজ চেতনা যতখানি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, সেই ব্যক্তি বা জাতি সেই পরিমাণেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; মানব সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আবার তারই প্রতিফলন ঘটে। সমৃদ্ধি বা উন্নয়নের অন্য কোন অর্থই অবাস্তব ও অর্থহীন।

কোন সমাজকর্মী যিনি গ্রাম উন্নয়ন ও সমাজ সংগঠনে ব্রতী হবেন, তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি—এ সম্পর্কে তাঁদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কোন পরিমণ্ডলে তাঁরা এই কাজে ব্রতী হচ্ছেন—তাও তাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। এই পরিমণ্ডলে আবার দুটি দিক আছে—একটি জাতীয় বা স্থানীয় দিক (aspect) অন্যটি আন্তর্জাতিক। কিন্তু এই দুটি দিকই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত—সেজন্য পরিমণ্ডলের এই দুটি দিককেই সমাজ বা গ্রামকর্মীদের গুরুত্ব দিয়ে জানা ও বোঝার দরকার হবে। আমাদের গ্রামকর্মীদের

উন্নয়নের কর্মসূচী যতই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হোক না কেন বিশ্ব পরিস্থিতিতে যে সব বৃহৎ ঘটনা ঘটছে, বিশ্ব পরিমণ্ডলে যে সব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে অথবা সাধিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে—আমাদের জীবনেও তার প্রভাব প্রতিফলিত না হয়ে পারে না আর তাই গ্রামকর্মীদের কর্মকাণ্ডও এই প্রভাব নিরপেক্ষ হতে পারে না। অর্থাৎ সমাজসেবী গ্রামকর্মীদেরও এই ধারণাটি আয়ত্ব করতে হবে, কেননা এই ধারণার প্রেক্ষাপটেই তাঁদের কাজ করতে হবে। এখানে কর্মীদের চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসারের প্রয়োজনটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম-উন্নয়ন ও সমাজ সংগঠনের পুরানো অথবা চলতি ধ্যান ধারণার ধারাবাহিক সংস্কার ও পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন হবে—সমগ্র বিষয়টিই সেজন্য যথেষ্ট অনুধ্যান ও অনুশীলন-সাপেক্ষ। গ্রাম উন্নয়ন ও সমাজ সংগঠনের কাজে কোন একটি নিদিষ্ট ছক কাটা পথে চলা ঠিক হবে না কিন্তু তবুও গ্রামকর্মীদের সামনে তাদের নিদিষ্ট কর্মের একটি ছক বা নকসা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। মূল কাঠামোটিকে ঠিক রেখে পরিস্থিতির প্রকার ভেদে ও পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ছক বা নকসারও পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে—সেজন্য কর্মীদের চিন্তা ও আচরণ সর্বপ্রকারের গোঁড়ামী ও সংস্কারমুক্ত হওয়া চাই। একজন সমাজসেবী গ্রামকর্মীর মৌল আচরণ বিধি হচ্ছেঃ তিনি হবেন একাধারে সংস্কারমুক্ত ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি-সম্পন্ন, গতিশীল ও সৃষ্টি ধর্মী। একদিকে যেমন হবেন তাঁরা নিষ্ঠাবান সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র অন্যদিকে তাঁরা হবেন একটি মহৎ জীবন দর্শনের অনুসারী, সমাজ বিবর্তনের সংগ্রামে নির্ভীক সৈনিক : কাজটি খুব সহজ ও সরল নয়—গ্রামকর্মীদের জীবনে এই কাজ একটি সাধনার বিষয় ; নিরলস ও ধারাবাহিক প্রস্তুতি ছাড়া এই ব্রত সাধনে যে মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন—তা কিছুতেই সম্ভব হবে না। সমাজসেবী গ্রামকর্মী হিসাবে গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনগুলিকে সাধারণভাবে জানা এবং কতকগুলি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী মারফৎ সেই প্রয়োজনগুলিকে পূরণ করার মধ্যেই তাঁদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয় ;

সে কর্তব্যের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত, আবেদন আরও বৃহত্তর। সে কর্তব্যের লক্ষ্য হচ্ছে : গ্রামীণ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনা, চালু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন পরিবর্তনের বাস্তব ভিত্তি রচনা করা। পথটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথ।

গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও সমাজ সংগঠনে ব্রতী কর্মীদের ধ্যান ধারণা ও গ্রামের কাজ সম্পর্কে এখানে যে প্রেক্ষাপট উপস্থিত করা হলো—সেই পরিকাঠামোর মধ্যে গ্রামকর্মীদের জন্য অবশ্য অনুসরণ-যোগ্য কর্মসূচী হিসাবে কতকগুলি ন্যূনতম কর্মসূচীর কথা ভাবতে পারি যেগুলিকে গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও সমাজ সংগঠনের কাজে পূর্ব শর্ত হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলি কোন উন্নয়ন কর্মসূচী নয়, উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলিকে মূল লক্ষ্য পথে পরিচালিত করার কর্মসূচী—যা প্রতিটি গ্রামকর্মীকে নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে। সংক্ষিপ্তভাবে কর্মসূচীগুলি হচ্ছে :

এক—গ্রাম কর্মীর মানসিক প্রস্তুতি যে কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর সাফল্যের উপরই গ্রাম উন্নয়নের অন্যান্য যাবতীয় কর্মসূচীর সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। গ্রামের কাজে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার মত সাহস ও দৃঢ়তা, ত্যাগ ও সহনশীলতা, নিপীড়িত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য বেদনাবোধ এবং তাঁদের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য হৃদয়ের আকুতি অর্থাৎ যে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটি গ্রামকর্মীর কর্মজীবনের মৌল উপাদান—এই উপাদানগুলি আয়ত্ব বা অর্জন করার মাধ্যমেই কর্মীর মানসিক প্রস্তুতির কাজটি গড়ে ওঠে এবং ক্রমশ শক্তিশালী হয় এবং বিস্তার লাভ করে। এই প্রস্তুতির কাজটি কোন সাময়িক ব্যাপার নয়, ধারাবাহিক ও নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়। গ্রামকর্মীরাও বর্তমান গ্রামীণ সমাজ ও দেশের বর্তমান পরিবেশের মধ্যেই জন্মলাভ করেছেন এবং সমাজ ও পরিস্থিতির মধ্যে যে প্রতিকূল ও অশুভ প্রবণতাগুলি

ক্রিয়াশীল—তাঁরাও তা থেকে মুক্ত নন। একটি কঠোর আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন একটি মনন অর্জন করতে হবে যা বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে কর্মীকে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। জীবন সম্পর্কে একটি উন্নত ধরণের ভাব ধারাই এই সংগ্রামে গ্রামকর্মীদের একমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গত বৎসর লোকশিক্ষা পরিষদ আয়োজিত সচিব সম্মেলন—সারা রাজ্যে কতকগুলি এলাকাভিত্তিক বিবেকানন্দ স্টাডি ক্যাম্প এই নামে আলোচনা শিবির অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কতকগুলি আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও শোনা গেছে। গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তির সাথে সাথে এই কর্মসূচীর গুরুত্ব আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকামূলক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে যদি উন্নয়ন কর্মসূচীর সংখ্যা ও পরিধি কিছুটা হ্রাস করতে হয়—তাহলেও তা করতে হবে। কাজের তাগিদে যদি অন্য সময়ে সম্ভব না হয়ে ওঠে, তাহলে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার আগে প্রতিটি গ্রামকর্মীকে প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্যও একান্ত পাঠের সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার উপর লিখিত কিম্বা স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত রচনাবলী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী প্রভৃতি মনীষীদের সমাজ ভাবনার সংগে পরিচিত হওয়ার জন্য তাঁদের লেখা ও তাঁদের চিন্তা ও লেখার উপর যে সব মূল্যবান পুস্তক প্রদর্শিত হয়েছে—সেগুলিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পাঠ ও আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই সংগে ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রাথমিক জ্ঞানগুলি গ্রামকর্মীদের অর্জন করার প্রয়োজন হবে। প্রতিটি সমাজসেবী সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকেই।

গ্রামকর্মীদের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই কাজে গাফিলতি করা যে-কোন সমাজসেবী সংস্থার পক্ষেই একটি অমার্জনীয় অপরাধ। গ্রামকর্মী

ও সংস্থা সংগঠকগণ যদি নিজেরাই মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত না হন অথচ গ্রাম উন্নয়ন ও নতুন সমাজ গঠনের কাজের নেতা ও কর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, এই প্রহসন চলতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিৎ নয়।

তুই—গ্রাম কেন্দ্রের এলাকাধীন গ্রামগুলির সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া অতি অবশ্যই প্রয়োজন। গ্রাম জরিপের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এমনকি মাইক্রোলেবেল সার্ভে পদ্ধতিতে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় সেই রিপোর্টে এলাকার আর্থিক অবস্থার ও পরিবারভিত্তিক, জনসংখ্যার একটি চিত্র পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির কোন সঠিক চিত্র সেই রিপোর্টে আদৌ প্রতিফলিত হয় না। গ্রাম উন্নয়নের কাজের সংগে যদি সমাজ বিবর্তনের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড জড়িত হয়ে পড়ে তাহলে এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতির সম্যক স্বরূপটি সম্পর্কে কর্মীদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতেই হবে। যাদের জন্য কাজ তাদের যদি গ্রামকর্মীরা সব দিক থেকে না জানেন তাহলে এখানেও একটি বড় রকমের ফাঁক থেকে যায় এবং এই ফাঁককে স্বীকার করে নিয়ে গ্রাম উন্নয়নের কাজে ব্রতী হলে উন্নয়নের মূল লক্ষ্যে কোনদিন পৌঁছান যাবে না। সেজন্য এলাকার সঠিক অবস্থা জানার বিষয়টি গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

তিন—গ্রামের মানুষের সংগে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Identification with people। এই Identification গ্রামের মানুষকে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কর্মসূচীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, কর্ম এলাকার পরিধি যত বিস্তৃত হয়, অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ যত বাড়ে, গ্রামকর্মীদের উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ততই হ্রাস পেতে থাকে; কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যাপারটি তখন বেতনভুক বা ভাতাপ্রাপ্ত কর্মীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সরকারী কার্য-পদ্ধতিতে এই ব্যাধি প্রকট। তুঃখের বিষয়, এই ব্যাধিতে সমাজ-সেবী সংস্থার কর্মীরাও আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। প্রতিমাসে একটি গ্রামের

গ্রাম কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হল—এই সভার ফলে গ্রামের মানুষের সংগে গ্রাম কর্মীদের প্রকৃত সংযোগ ঘটে গেল এ রকমটি ভাবার কোন কারণ নেই। উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যদি গ্রামের ব্যাপক জনসাধারণের সংগে গ্রাম কর্মীদের আচার আচরণ, ধ্যান ধারণার কোন সত্যকার সংযোগ না ঘটে তাহলে সেইসব গ্রামকর্মীরা গ্রামবাসীদের পরম আপনজন বলে কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেক্ষেত্রে গ্রাম-উন্নয়নের কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হচ্ছে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখানে সমস্যা হচ্ছে—গ্রামের মানুষের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার মত গ্রামকর্মীদের সময় কোথায়, আর মানসিকতাই বা আমাদের গ্রামকর্মীদের মধ্যে কতজনের আছে? প্রশ্নটির মীমাংসা একটু কষ্টসাধ্য বলেই বিষয়টিকে আমরা অনেকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। গ্রামকর্মীরা কতখানি আন্তরিকতা নিয়ে গ্রামের মানুষের সংগে মিশছেন, তাদের মধ্যে তাদের মত করে কথাবার্তা বলছেন, মাঝে মাঝে গ্রামেই তাদের সংগে রাত্রি বাস করছেন—গ্রাম কর্মীদের আচরণ বিধির মধ্যে এই বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিষয়ীভূত হওয়া উচিৎ এবং গ্রাম কেন্দ্রের বার্ষিক বিবরণীতে গ্রামকর্মীদের এই কাজের ধারাটি প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

চার—কর্মসূচীর সংখ্যা ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি অনাবশ্যকভাবে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য কর্মী গড়ে না তুলে যদি কর্মসূচীর সংখ্যা ও কার্যের এলাকা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী এবং যেসব গ্রামবাসীর জন্য ঐসব কর্মসূচী এ দুটির মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি হবেই। গ্রামবাসীদের প্রয়োজন ও তাগিদে, তাদের ধ্যান-ধারণা ও গ্রহণ করার ক্ষমতার ভিত্তিতে যদি সংস্থাগুলি উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ না করে তাহলে গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঐ একই বিপদের সম্মুখীন হবে। গ্রামকর্মীরা সর্বত্রই এই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি বহু আলোচিত এবং সর্ববাদী স্বীকৃত হলেও সর্বত্রই উপর থেকেই গ্রাম-উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি গ্রামের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মসূচী করার আগে সেই কর্মসূচীকে সফলভাবে কার্যকরী করার

জন্য গ্রামবাসীদের যে মানসিকতা ও গ্রামের যে পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার এই বিষয়টির প্রতি একেবারেই যে গুরুত্ব দেওয়া হয় না তা নয়, কিন্তু সর্বত্রই সে প্রয়াস নিছক আনুষ্ঠানিক স্তরে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। এখানে কোথাও কোন পরিকল্পনা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। গ্রাম-উন্নয়ন কর্মসূচী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংস্থার সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী বা আর্থিক সহায়তা বা অনুদান প্রাপ্তি সম্ভাবনার উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেন। এই প্রবণতা গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পথে আদৌ সহায়ক নয়। অল্প অর্থে অধিক সংখ্যক গ্রামবাসীর স্বার্থ পূরণ হতে পারে এবং যে কর্মসূচীতে গ্রামবাসীরাই নিজেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই ধরণের কর্মসূচী গ্রহণের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিশু ও গ্রামের মহিলাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত আছে এমন সব কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এই প্রসংগে সংস্থা পরিচালক ও গ্রামকর্মীদের গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের ভূমিকাটি কি তা বিস্মৃত হলে চলবে না। একটি গ্রামের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নয়ন করা কোন সমাজসেবী সংস্থার পক্ষেই সম্ভব নয়, আর তাদের প্রকৃত ভূমিকাও তা নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অল্প ব্যয় সাপেক্ষ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এই সংযোগের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা—এই কাজটি হচ্ছে সমস্ত গ্রাম-উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

স্বাবলম্বী সমাজ গঠনের ভিত্তি গ্রামবাসীদের সমাজ সচেতনতার বৃদ্ধির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আমাদের গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমরা যে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চরিত্রের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না; পক্ষান্তরে আমরা সর্বত্র একটি বিপরীত প্রক্রিয়াই লক্ষ্য করছি। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় গ্রামের মানুষের জীবনে যতটুকু আর্থিক উন্নয়ন হচ্ছে মানুষ ঠিক সেই পরিমাণেই নিজের আত্মশক্তি, স্বাধিকার ও মর্যাদাবোধ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন, পরনির্ভরতা ও সুবিধাবাদী মানসিকতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই

নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটির প্রতি সমাজসেবী সংস্থা ও সংস্থার কর্মীদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে।

পাঁচ—সংগঠন। গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর সাফল্য এবং এই সাফল্যের স্থায়িত্ব সংগঠনের বিষয়টির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি উন্নয়ন কর্মসূচীর তাৎক্ষণিক ফল আমাদের গ্রাম কর্মীদের কাছে অত্যন্ত উৎসাহজনক বলে মনে হতে পারে; কিন্তু এই ফল স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তিক হবে কিনা তা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁরা এই ফলের গ্রহীতা তাঁরা এই কর্মসূচী রূপায়নের কাজে সচেতনভাবে সংহত হচ্ছেন কিনা, এমন সংগঠনশক্তি গড়ে তুলছেন কিনা যার বলে উন্নয়নের ধারাকে পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কর্মসূচী তো আমাদের লক্ষ্য নয়, এমন পদ্ধতি বা উপায়ে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা যে গ্রাম সংগঠনই হবে। আগামী দিনে নতুন গ্রাম সমাজ বা গ্রাম স্বরাজ গড়ে তোলার প্রধান শক্তি। এই গ্রাম সংগঠনের ভূমিকার সঙ্গে গ্রামের তথা সারা দেশের অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা আমরা জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে যেখানে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি—তার সুষ্ঠু সমাধানের প্রশ্নটির সঙ্গে এই সংগঠনের বিষয়টি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে আছে, কাজেই কেবল কতকগুলি কর্মসূচী ও এইসব কর্মসূচীর লক্ষ্য মাত্রা পূরণের মধ্যে গ্রাম কর্মীদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। গ্রাম সংগঠন ও দৃঢ়ভিত্তিক গ্রাম সংগঠন সমস্ত গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্যের মাপকাঠি হচ্ছে এটাই। আবার গ্রাম সংগঠন বলতে এখন আমরা যা বুঝি গ্রামের পুরুষ মানুষের সংগঠন। গ্রামের মহিলাদের সংগঠনের চিন্তা আমাদের কাছে আজও অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু বুঝতে হবে—আগামী দিনের নতুন সমাজ ভাবনা ও তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে সেই পরিমাণে যে পরিমাণে গ্রামের মহিলা সমাজ গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে। গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠনের বিষয়টি গ্রাম-সংগঠনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া বিশেষ জরুরী এবং সেজন্যই গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন

কর্মসূচী নির্বাচন করা দরকার যেসব কর্মসূচীর মধ্যে গ্রামের মহিলাদের ব্যাপকতম অংশকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করা যায়।

এই লেখাটির শিরোনামা থেকেই অনুমান করা যায় যে এটি কোন গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পূর্ণাংগ আলোচনা নয়। এখানে গ্রাম-উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি নিয়েও কোন বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে না। গ্রামকর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবিকার সমস্যা নিয়েও কোন আলোচনা হচ্ছে না। কোন্ ধ্যান-ধারণা পরিকাঠামোর মধ্যে গ্রামকর্মীরা গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্রতী হবেন সংক্ষিপ্তাকারে তারই একটি নক্‌শা বা ছক এখানে উপস্থিত করা হয়েছে মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উন্নয়নের পূর্ব সর্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

'এক পা এগোও, দু'পা পিছু হটো'—ক্ষেত্র বিশেষে এটি রাজনীতির একটি সার্থক কৌশল বলে স্বীকৃত হলেও এই রণকৌশলকে নিছক ব্যতিক্রম হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। তা যদি না হয়, তাহলে কোন সংগ্রামের মূল লক্ষ্যে কোনদিনই উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; লক্ষ্য থেকে চিরকালই বহু পশ্চাতে পড়ে থাকতে হয়। আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলেই এই রণকৌশলের প্রসঙ্গটি এসে গেল। স্বাধীন হবার পর একটি নির্দিষ্ট সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দেশবাসীকে তাদের ন্যূনতম যে পাঁচটি প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন —এই প্রয়োজনগুলি পূরণের যে প্রতিশ্রুতি এই সংবিধানে দেওয়া হয়েছিল তার কোন একটিরও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ এগুলি পূরণের জন্য একটি সময়সীমাও নির্দিষ্ট ছিল এবং সেই সময় সীমা আমরা প্রায় ত্রিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে চলে এসেছি। ইতিমধ্যে সাত সাতটি যোজনা পর্ব শেষ হয়েছে কিন্তু এখনও আমরা আমাদের লক্ষ্য মাত্রা থেকে বহুদূরে পড়ে আছি এবং দেশের উন্নয়ন ধারা যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে আমরা কেউ নিঃসন্দেহ হতে পারছি না যে আগামী বিশ পঁচিশ বছরেও দেশের সমস্ত মানুষের উল্লিখিত প্রয়োজনগুলি পূরণ হবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের অনগ্রসরতাকে কাটিয়ে আমাদের দেশ একটি উন্নত শক্তিশালী দেশে পর্যবসিত হচ্ছে এ দাবী নিতান্ত হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। পরিসংখ্যানে কিছুটা তারতম্য ঘটলেও প্রায় চুয়াল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হবার পর আজ দেশের চিত্রটি হচ্ছে মোটামুটি এইরকম —দেশের শতকরা চল্লিশটি পরিবার কঠোর দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে, প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষের (পুরুষ, মহিলা, শিশু সব

মিলিয়ে) ন্যূনতম অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়নি ; মোট জনসংখ্যার প্রায় ষাট ভাগ এখনও নিরক্ষর, শতকরা প্রায় ত্রিশটি পরিবারের কোন নির্ভরযোগ্য স্থায়ী বাসগৃহ নেই, আর স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে এরকম জনসংখ্যাতো হিসাবের বাইরেই। কারণ হয়তো একাধিক এবং বিভিন্ন ধরণের ; *কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটি মোটামুটি এইরকমই এবং চিত্রটি যে আদৌ সুন্দর আশাপ্রদ নয়, অতীব ভয়ংকর তা যদি আগে সম্যক উপলব্ধি করে নাও থাকি তাহলে এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না ; করলে তা হবে—মারাত্মক জাতীয় অপরাধ।* এই অপরাধের ফল ইতিমধ্যেই নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে এ তো আর কোন অজানা ঘটনা নয়। এটা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেজন্য আমরা সকলেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

'৪৭ সালে আমরা যেখানে ছিলুম আজও আমরা সেখানেই পড়ে আছি বা তা থেকে পিছিয়ে গেছি—ঘটনাটি তা নয় ; অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি যথেষ্ট আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক এবং সেকারণে কিছুটা কৃতিত্বের দাবী করলেও অসঙ্গত হবে না। কিন্তু দেশের উন্নয়নের মূল লক্ষ্যটি কি, দেশের উন্নতি বলতে আমরা কি বুঝি—এই প্রশ্নটি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে ; নানা অজুহাতে সুকৌশলে যাঁদের উপর দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব ছিল তাঁরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন এবং আজও সেই চেষ্টা চলেছে। ফলে স্বাধীন হবার পর এই দীর্ঘ চার দশকে দেশে যে সব ঘটেছে, পরিবর্তন এসেছে তাতে সংখ্যায় সামান্য তারতম্য ঘটলেও দেশের একটি বিপুলসংখ্যক মানুষের খাদ্য বস্ত্রের প্রয়োজন মেটেনি, নিরক্ষরতা ঘোচেনি, বাসোপযোগী আবাসন মেলেনি, স্বাস্থ্যহীনতা ও সুচিকিৎসার অভাবে ভুগছে যেন গোটা দেশটাই। অথচ একটি দেশ উন্নত বা অবনত, অগ্রসর বা অনগ্রসর—এটি বিচারের প্রাথমিক ও প্রধান মাপকাঠিই তো হচ্ছে এগুলি। দারিদ্র্য, বেকারী, অশিক্ষা, বাসগৃহের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টির অভাব—অনগ্রসরতার এই

সব লক্ষণগুলি যদি বিরাট বোঝার মত দেশের একটি বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে চেপে বসে থেকে এবং তা চেপে বসে থাকে সাত আটটি উন্নয়ন যোজনা পর্বের পরও, তাহলে এইসব যোজনার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে দেশের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন যারা তাদের দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সংশয় না এসে পারে না। স্বীকার করতেই হবে: আমাদের দেশে দেশ গড়ার নীতি ও কৌশলগত পদ্ধতি নিয়ে দুটি পরস্পর বিপরীতধর্মী উন্নয়ন ধারণা (Concept of development) চালু আছে। এই উভয় ধারণার প্রতিভূ হচ্ছেন একদিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর অন্যদিকে মহাত্মা-গান্ধী। একজনের ধারণায় উন্নয়ন হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধি, অন্যজনের বিশ্বাস, সকলের জন্য সরল সহজ জীবনযাত্রায়; সোজা কথায় বলা যায়: একটি উপর থেকে পরিকল্পিত চাপানো উন্নয়ন আর অন্যটি নীচু থেকে গড়ে তোলা সহজ স্বাবলম্বী সমাজ জীবন; একটির মূল উপাদান হচ্ছে—বিজ্ঞান ও যন্ত্র, অন্যটির শক্তি হচ্ছে—মানুষের শ্রম ও সাধারণ-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

প্রথমোক্ত ধারণাটিরই পরীক্ষা চলেছে গত চার দশক ধরে এবং সেই পরীক্ষারই ফসল হচ্ছে দেশের বর্তমান জটিল পরিস্থিতি, নানা দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্যে ভরা আমাদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। দ্বিতীয়টি এখনও আলোচনার স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে; যদিও কোথাও কিছু পরীক্ষার চেষ্টা হয়ে থাকে তা হয়েছে সম্পূর্ণ বেসরকারী স্তরে ও গতানুগতিক ধারায়। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই গান্ধীজীকে মূলধন করার চেষ্টা হয়েছে এবং সেজন্য নতুন সমাজ গঠনে গান্ধী ধারণার প্রকৃত প্রতিফলন কোথাও ঘটেনি। পণ্ডিত নেহেরু কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তাই নয়; তিনি ছিলেন মূলতঃ পাশ্চাত্য জীবন ধারার অনুসারী, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থারও সমর্থক ও অনুসরণকারী। পাশ্চাত্য জীবন ধারায় পুঁজিবাদ ও সমাজবাদে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই: উভয় ধারণারই প্রতিযোগিতা একটি

লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে—তা হচ্ছে উন্নত থেকে উন্নততর মানের জীবনযাত্রার অধিকারী হওয়া। পণ্ডিত নেহেরু এই দেশের জন্য সেই রকম একটি পাশ্চাত্য মডেলের সমৃদ্ধ জীবন ধারা কল্পনা করেছিলেন। সেই কল্পনার প্রভাব আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে যে স্পষ্ট তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই পরিকল্পনাগুলি যে দেশ-বিদেশের শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর শিল্প বিকাশ ও পণ্য আমদানী রপ্তানীর কর্মকাণ্ডে সহায়ক তাও সহজে অনুমান করা যায়। আবার আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় মূলতঃ দেশ গঠনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পণ্ডিত নেহরুর চিন্তা ও পদ্ধতির অনুগামী, তা নাহলে নাকি প্রগতিবাদী হওয়া যায় না। এখানে তাদের মধ্যে যদি কোন বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব থেকে থাকে তাহলে নিছক মাত্রা বা degree নিয়ে। পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সমাজবাদের দ্বন্দ্ব যে ক্রমশ মিটে আসছে এ ঘটনা তো আজ আমাদের দেশেও স্পষ্ট। উভয় পক্ষেরই স্বার্থ উপর থেকে চাপানো পরিকল্পিত দেশ গঠন ও সমাজ উন্নয়ন ; কিন্তু তাদের একই আকাংখা তা হচ্ছে এই পরিকল্পিত উন্নয়নের যাবতীয় ফলভোগ করা। দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা যদি কিছু থাকে তাহলে এই ফলভোগের ভাগাভাগি সম্পর্কে। এই ধরণের উন্নয়ন ধারার সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। আজ আমাদের দেশে যত কিছু বিরোধ, যত কিছু অশান্তি তার মূল অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। আমাদের দেশে যে নেহরু প্রবর্তিত উন্নয়ন ধারা ও এই উন্নয়ন ধারা ক্রিয়াশীল হচ্ছে যে শক্তিসমূহের কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এই বৃত্তভূমিতে। গান্ধীজী কল্পিত পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত স্বাবলম্বী সমাজ ব্যবস্থা এবং পণ্ডিত জুহরলাল প্রবর্তিত যে সমাজবাদী ঘেষা পরিকল্পিত কেন্দ্রাশ্রয়ী উপর থেকে চাপানো উন্নয়নভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এখানে এ দুটি ব্যবস্থার কোন সঠিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না ; বর্তমান আলোচনায় তা বহুলাংশে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তবুও সূচনায় বিষয়টির উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা এজন্যই যে, উন্নয়নের যে ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে আমাদের দেশের অনগ্রসর আর্থ-সামাজিক

অবস্থার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন তো দূরের কথা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও আনা যায় নি। আজও আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক যে-কোন মানদণ্ডে অনগ্রসর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে, নানা রকমের সামাজিক অবিচার ও শোষণেব শিকার হচ্ছে। কৃষি ও শিল্পের আয়তন বেড়েছে, উৎপাদনও নিশ্চয়ই অনেক গুণ বেড়েছে; ফলে এই চার দশকে জাতীয় সম্পদের পরিমাণও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছে দেশের সমৃদ্ধি ঘটানোর দৃষ্টিকোণ থেকে। দেশ বহুলাংশে যে সমৃদ্ধ হয়েছে এই সত্যকে অস্বীকার না করেও বলা যায় কিন্তু এই সমৃদ্ধির বৃত্তটি আবর্তিত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসমষ্টির মধ্যেই যাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েও আজ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের উন্নয়ন পরিচালনার মৌলিক ত্রুটি এখানেই। আমরা পুরানো দিনের কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুত ছিলাম এবং আমাদের সংবিধানে সেই সব প্রতিশ্রুতির কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। একাধিক যোজনা পর্ব আমরা উত্তীর্ণ হয়ে এলুম, বহু উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হলো, হাজার হাজার কোটি টাকা এই সব উন্নয়নের কর্মসূচীতে বিনিয়োগ করা হলো —আর এই বিনিয়োগ করতে গিয়ে দেশের উপর বিরাট বৈদেশিক ঋণের বোঝা চেপে বসলো: আজও সেই বোঝা থেকে আমরা মুক্ত নই, অদূর ভবিষ্যতে মুক্ত হবার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এই যে মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন—এর কোন একটিরও কি জাতীয় স্তরে সমাধান করতে পারা গেছে? তা যদি পারা না গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ একথা ভাবা ভাবের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়: এ আত্মশ্লাঘা আমাদের সাজে না। কাজেই উন্নয়নের চালু নীতি ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করে নয়, এই নীতি ও পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তনই আজ বিশেষ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নেহেরুর দেশ গঠনের ধারণা বনাম গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের ভাবনা—

হয় প্রথমটি না হয় দ্বিতীয়টি। একটির বিকল্প অপরটি—দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ভাবনাটি এই ধরণের কোন বিতর্কের মধ্যে আজ সীমাবদ্ধ নয়। কেননা বিশ শতকের শেষ ভাগে এবং একুশ শতকের সূচনা অধ্যায়ে এই পর্বের পরিস্থিতির মধ্যেই একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাচ্ছে—যার মূল্যায়ন উন্নয়নের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা দিয়ে করা সম্ভব নয়।

উন্নয়নের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে এই যে বিতর্ক আপাততঃ তার মধ্যে না গিয়ে ও আমরা একটি ব্যাপারে এই ঐক্যমতে আসতে পারি যে দেশের জনসংখ্যা ক্রমশ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কঠোরভাবে তাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে আমাদের দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি উন্নত মানের জীবনযাত্রার পরিধি আনা যে কোন দিনই সম্ভব হবে না শুধু তাই নয়, ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার চাপে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বা সারা দেশের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন তার কোনটিরই পূরণ করা যাবে না; দেশের একটি বিরাট অংশ মানুষকে চিরকাল অনগ্রসর জীবনের অভিশাপ বহন করে চলতেই হবে; দেশের বুক থেকে দারিদ্র্য, বেকারী, অশিক্ষা কোনদিনই ঘুচবে না। উন্নয়নের নীতি ও পদ্ধতি যে ভাবেই নির্ধারিত হোক না কেন, উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রাকে দেশের জনসংখ্যা সবসময়ই অতিক্রম করে যাবে এবং এই অসম প্রতিযোগিতা চিরকাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলতে থাকবে। আর তা যদি চলে তাহলে আমরা দেশের সমস্ত মানুষের জন্য একটি উন্নত, সুখী ও শান্তিময় সমাজ জীবনের কথা যা আমরা ভাবছি তা কোন দিনই বাস্তবে রূপ নেবে না; দেশের সমস্ত মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের যে কল্পনা তা শেষ পর্যন্ত কল্পনা স্তরেই থেকে যাবে। ক্রম বর্দ্ধমান জনসংখ্যা থেকে যে সমস্যা উদ্ভব হচ্ছে সেটি যে কেবল আমাদের দেশেরই একান্ত নিজস্ব সমস্যা তা নয়, এটি আজ একটি বিশ্ব সমস্যা। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে যে সব দেশ অনগ্রসরতার সাধারণ মানদণ্ডে একেবারে নীচের দিকে অবস্থান করছে আমাদের দেশের স্থান তাদের মধ্যেই। সেজন্য

—আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আর নিছক ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা চলে না, জরুরী ভিত্তিতেই এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আমাদের সামনে অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। দেশকেউন্নত করা, স্বাবলম্বী করা, শক্তিশালী করার জন্য আমরা যে কোন নীতির দ্বারাই পরিচালিত হই না কেন, যে কোন কর্মসূচীই গ্রহণ করি না কেন আমাদের দেশের উন্নয়ন ধারা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে অনির্দিষ্টকাল আবর্তিত হতে থাকবে—এক পা এগিয়ে যাও, দু পা পিছু হটো—এই পুরানো রণ কৌশলের মধ্যে—যার অনিবার্য ফল হচ্ছেঃ দেশের জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশের মানুষের অনগ্রসরতা স্থায়ী হওয়া এবং এই অনগ্রসরতার প্রভাব কেবলমাত্র দেশের একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে থাকছে না, দেশের সমগ্র সমাজ জীবনকে সক্রামিত ও বিপর্যস্ত করে তুলবে—দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সত্যকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। জাতীয় স্তরে আমরা যে সব বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সে সবেরই উৎস হচ্ছে দেশের একটি বিপুল অংশ মানুষের জীবনের অনগ্রসরতা। এই অনগ্রসরতাকে কেন্দ্র করেই তো আজ দেশের বুকে সর্ব প্রকারের সমাজজীবনের সর্বস্তরে নানা অন্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। উন্নয়ন সম্পর্কে জাতীয় আশা আকাংখা একটি বিরাট মাত্রা লাভ করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই আশা আকাংখা পূরণের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কাজেই এর ফলে এক দিকে যারা এই উন্নয়নের ফলের অংশীদার হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে, আরও উন্নতর পর্যায়ের যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে যেমন হিংস্র প্রতিযোগিতা চলছে—তেমনি এই অসম প্রতিযোগিতার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি পর্যায়ে ঘোরতর সমস্যা থেকেই যাচ্ছে : দরিদ্র, বেকারী ও অশিক্ষার গভীর অন্ধকার থেকে দেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ কিছুতেই মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এই ভয়াবহ অবস্থাকে একটি স্থায়ী রূপ দিতে চলেছে। দেশের জনসমষ্টির একটি অংশ অবশ্যই উন্নত

মানের জীবনযাত্রা লাভের সুযোগ পেয়েছে এবং আগামী দিনে এই অংশের সংখ্যা নিশ্চিন্তভাবেই কিছুটা বাড়বে। তা ঘটবে দেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে সেই সম্পদের সিংহভাগ তাদের মধ্যে বণ্টন করেই। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে কি তারা ও তাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য এই উচ্চমানের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব আশা করতে পারে? কলিকাতা, বোম্বে প্রভৃতি দেশের বৃহৎ শহরগুলির কথা বাদ দিলেও প্রতিটি রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে, হাট বাজারে, ট্রেনে বাসে মানুষের যে ভীড়, এই ভীড়ের চাপে তো সহর ও গঞ্জে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করা ও সহজ ও সুস্থ জীবন যাত্রা তো ইতিমধ্যেই দুরূহ হয়ে উঠেছে—আরও পঞ্চাশ বছর পরে যখন দেশের লোকসংখ্যা এই হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে তখন সুস্থভাবে জীবন ধারণের সমস্যাটি কি আকার ধারণ করবে তা ভাবলেও আতংকিত না হয়ে পারা যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য বস্ত্রের অভাব ঘটছে, বেকারী বাড়ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না—সমস্যাটি কেবল দেশের উন্নয়ন ও অনগ্রসরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জনসংখ্যার চাপে দেশের সমগ্র অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। দেশের একটি নির্দিষ্ট আয়তন (geographical area) আছে, প্রাকৃতিক সম্পদও সীমাহীন নয়—একথা তো একেবারে বিস্মৃত হওয়া চলে না।

জনসংখ্যার চাপ যদি নির্দিষ্ট মাত্রাকে ছাপিয়ে যায় তাহলে প্রকৃতিই বা তা সহ্য করবে কিভাবে? এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য। আর তা যদি হয়—তাহলে আমাদের মধ্যে যারা উন্নত মানের জীবন যাত্রার অধিকারী—তাদের ভবিষ্যতও তো বিপন্মুক্ত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব-কেও বিপন্ন করে তুলছে, দেশের ঐক্য ও সংহতিকেও বিপন্ন করছে। ইতিমধ্যেই লক্ষণগুলি নানাভাবে নানা স্তরে আত্মপ্রকাশ করেছে; আগামী দিনে এইগুলি আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। জনসংখ্যা

বৃদ্ধির সমস্যাটি কেবলমাত্র অনগ্রসর দরিদ্র নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যা নয়, তাদের সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যতের দায়দায়িত্ব না বুঝে যদি তারা তাদের পরিবারের সভ্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে তাহলে তারাই তার কুফল ভোগ করবে—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক ও দেশের সামগ্রিক স্বার্থেরও অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি আর কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়, এটি হচ্ছে আজ দেশের জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যাকে লঘু করে দেখে কিম্বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আমরা দেশকে নতুন করে গড়ার যে কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাই করি না কেন, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না দেশের জনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়। তাই আমাদের দেশের যাবতীয় উন্নয়নের পূর্ব সর্ত হচ্ছে ; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচী।

আমাদের দেশে বর্তমান (১৯৮৭ সাল) জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় বিরাশি কোটি। ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয়ে যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন এই সংখ্যাটি ছিল পঁয়ত্রিশ কোটির নীচে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গত তেতাল্লিশ বছরে দেশের জনসংখ্যা প্রায় সাতচল্লিশ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এক কোটি বিশ লক্ষ এই হারে। যদি এই হারেই লোকসংখ্যা আরও ষাট বছর বৃদ্ধি পায় তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে দেড়শো কোটিরও উপর অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণের প্রায় কাছাকাছি। আরও সুদূর ভবিষ্যতকে হিসাবের মধ্যে না এনেও যদি আগামী এই ষাট বছরের হিসাবটিকে বিবেচনার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে কি আমরা এই অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি না যে এই বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মত সম্পদ কি আমরা দেশে সৃষ্টি করতে পারি? প্রয়োজনটি শুধু এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দু'বেলা পেট ভরে খাদ্য যোগান দেওয়ার মত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি ঠিকই যে বিগত তেতাল্লিশ

বছরে আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশে খাদ্য উৎপাদন-এর পরিমাণ ছিল সব মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন, এখন সেই স্থানে কৃষিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। তাই আমরা দাবী করি যে আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে এই সময়ে একটি সবুজ বিপ্লব ঘটে গেছে। এটি সম্ভব হয়েছে—আমাদের দেশের কৃষক সমাজ কৃষি উৎপাদনে সর্ব রকমের উন্নত ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই। বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে তাতে দেশে কোন বড় রকমের খাদ্যাভাব থাকা উচিত নয়। তবুও দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশের খাদ্যাভাব ঘটে, পুষ্টিকর খাদ্য মেলে না—তার কারণ আমাদের দেশের চালু আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেই রয়ে গেছে: দেশ গঠনের যে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক ত্রুটি থেকে গেছে যার ফলে ঐ আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। এই পরিবর্তন আনার জন্য যে সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তা নানা স্বার্থের চাপে সঠিকভাবে পরিচালিত করা হয়নি এবং আজও হচ্ছে না। কাজেই উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্য রয়েছে তার নিরাকরণে নতুন ভাবে ভাবনা চিন্তা করার ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই বিষয়টির সমাধান হলেও যে প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকেই যাচ্ছে তা হচ্ছে দেশের কৃষি-ব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা কি সীমাহীন? উন্নতমানের ফসল উৎপাদনের তো একটি সীমা আছে, কৃষিক্ষেত্রের আয়তনও তো সীমিত, কৃষি উৎপাদনে কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারেরও একটি সীমা আছে। দেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর সেই অনুপাতে দেশের কৃষিযোগ্য ক্ষেত্রও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাবে কাজেই জন-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, দেশে খাদ্যাভাব ঘটবে না—এমন একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কি কিছুতেই কল্পনা করতে পারা যায়? তাছাড়া খাদ্যের প্রয়োজনটাই মানুষের একমাত্র প্রয়োজন নয়; সুষম খাদ্যের প্রয়োজন, বস্ত্রের প্রয়োজন, বাসগৃহের প্রয়োজন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের

প্রয়োজন—যে কোন উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে—একটি দেশের সমস্ত মানুষের এই ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি পূরণের সুযোগ করে দেওয়া ও ব্যবস্থা করা ; আর তা করতে হলে গ্রাম ও সহরের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বাড়াতে হবে। ছোট, বড়, মাঝারি শিল্পকারখানার পত্তন ও প্রসার ঘটাতে হবে। লক্ষ লক্ষ অতিরিক্ত বাসগৃহ তৈরীর প্রয়োজন হবে, আর এ সবের জন্য প্রয়োজন হবে আরও কয়েক লক্ষ হেক্টর জমির। কিন্তু দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে বলে দেশের আয়তনও কি দ্বিগুণ করা যাবে? ১৯৪৭ সালের দেশের যে আয়তন ছিল—সেই আয়তন তো আজও আছে এবং দেশের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সেই আয়তনকে তো কোনমতেই বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই দেশে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ধারণ ও বহন করার ক্ষমতা দেশের নেই, এই বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টিকে নিয়ে আজও যে দেশ কোন রকমে চলছে তার একটিই কারণ—তা হচ্ছে : দেশের শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পরিবার দারিদ্র্য ও অনগ্রসর সীমার মধ্যে আজও বাস করছে। যারা এখন উন্নতমানের জীবনযাপন করছে তাদের মধ্যে জীবনযাত্রার বর্তমান মান বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠতো যদি দেশের সমস্ত মানুষের এই একই ধরণের জীবনযাপনের সুযোগ ঘটতো। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে হারে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বৃদ্ধির গতি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে অধিকতর জমির প্রয়োজন হবে এবং যে পরিমাণে এই জমির আয়তন বাড়বে, সেই পরিমাণে কৃষিযোগ্য জমির আয়তন হ্রাস পাবে। নিত্য নতুন শহর গড়ে ওঠার জন্য, এইসব শহর গঞ্জের আয়তন বাড়ার জন্য, অসংখ্য বসতবাটীর প্রয়োজন। রেল লাইন ও সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনে কত হাজার হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্রুতহারেই এই ব্যবহারের প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। এ দৃশ্য তো আমাদের সকলেরই চোখের উপরই ঘটছে।

এই প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বিরাট বিরাট বনজঙ্গলেরও আয়তন নিষ্ঠুরভাবে হ্রাস করতে হচ্ছে। আর বন সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করলে তার যে কি বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে তাও তো মানব সমাজের জীবনে আর একটি ঘোরতর বিপদ। কাজেই অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেবে, দেশে ইতিমধ্যেই যে বিরাশি কোটি মানুষ জন্মলাভ করেছে তাদের সকলের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম প্রয়োজন সেগুলি মেটানো কষ্টকর হবে তাই নয় এই সংখ্যা যদি আরও বেড়ে যায় তাহলে দেশের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আমরা আজ যে অনগ্রসর অবস্থার মধ্যে আছি তা কাটিয়ে উঠা তো যাবেই না। আমাদের অনগ্রসরতা আরও ব্যাপক হবে, স্থায়ী হবে, শেষ পর্যন্ত জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আছে এবং কোন দেশই এই সমস্যা থেকে ষোল আনা মুক্ত হতে পারবে না। তার কারণ, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর সব দেশেই মৃত্যু হার হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষের জীবনী শক্তি বাড়ছে এবং এই আনুপাতিক হ্রাসবৃদ্ধিব প্রভাব প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার উপর স্বাভাবিক ভাবেই পড়ছে। মৃত্যু হার যদি হ্রাস পায় এবং একই সঙ্গে জন্মহার যদি ক্রমশঃ পৌনপুনিকভাবে বেড়েই চলে—তাহলে যে কোন দেশের জনসংখ্যার একটি বিস্ফোরণ ঘটবেই আর তাতে সেই দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশ এই রকম একটি পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়েছে। এটি সকলেরই জানা যে দেশে অনগ্রসর শ্রেণীর পরিবারগুলির মধ্যেই জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী আর এই জন্মহার বেশী বলেই তাদের মধ্যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীই সার্থক হয়ে উঠছে না। আর্থিক দিক থেকে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটুকু উন্নয়ন আনার চেষ্টা হচ্ছে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই চেষ্টাকে ব্যাহত করে দিচ্ছে। সমস্ত রকমের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরও দেখা যাচ্ছে: উন্নয়নের একটি পর্যায়ে এসে অনগ্রসরতার চাপ আর কিছুতেই হ্রাস পাচ্ছে না। এই অদ্ভুত

পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতারা, পরিকল্পনা রচয়িতারা, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীরা—সকলেই দিশাহারা হয়ে পড়ছেন। তারা কেউ সংকটের মূলে যেতে চাইছেন না ; চাইলেও সেখানে তাঁদের পদক্ষেপ খুবই দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত। সমস্যাটির চরিত্র বুঝতে তো কোন পাণ্ডিত্যের দরকার করে না, বিশেষ গবেষণারও কোন প্রয়োজন হয় না। দুয়ে দুয়ে চারের মত ব্যাপারটি তো অতি সহজ ও সরল। পৃথিবীর সম্পদ অফুরন্ত নয়, সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনারও একটি সীমা আছে। তাছাড়া যে প্রকৃতি থেকে আমরা মানব সমাজ জীবন-ধারণের মূল উপাদানগুলি লাভ করছি সেই প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট পথ ও নিয়মেই চলছে। আমাদের প্রয়োজন বাড়ছে বলেই প্রকৃতির রাজ্যে আমরা অনর্থ সৃষ্টি করতে পারি না, একটি ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেই হবে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশকেই নিজ নিজ দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এই মূল সত্যটিকে মাথায় রেখেই তাদের উন্নয়নের কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে; আর সেজন্যই এই নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বা একই সঙ্গে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করলেও কোন কর্মসূচীর উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নির্ধারণের প্রশ্নটি সব সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের পক্ষে প্রশ্নটি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমাদের দেশ দেশবাসীর মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য মাত্রা থেকে বহু পিছনে পড়ে আছে, আমাদের স্থান পৃথিবীর সব চেয়ে অনগ্রসর দেশ যেগুলি তাদেরই মধ্যে। প্রসঙ্গতঃ বুঝতে হবে দিল্লী, বোম্বে ও কলিকাতাই আমাদের দেশ নয় : অথবা বাহুল্যময় জীবনযাপন করছে শতকরা যে ত্রিশ থেকে চল্লিশটি পরিবার তারাও গোটা দেশ নয়। এই সীমানার বাইরেই পড়ে আছে দেশের জনসংখ্যার যে বৃহৎ অংশ তাদের নিয়েই দেশ, আসল দেশ হচ্ছে তারাই। এই রূঢ় সত্যকে স্বীকার করে নিলে দেশবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্যটি কি তা নির্ধারণ অনেক সহজ হয়ে যায়। দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে

সমস্যাটিকে কোন ভাবেই কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই সমস্যা—এই সমস্যা সমাধানের দায়দায়িত্ব অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরই, কেননা জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আর তার ফলভোগ করছে তারাই—সমস্যাটিকে এভাবে গ্রহণ করা যে একটি চরম নির্বুদ্ধিতা শুধু তাই নয়, এটি হবে একটি জাতীয় অপরাধ। বুঝতে হবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে আজ সব চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। কাজেই জাতীয় উন্নয়নের আবশ্যিক সর্তই হচ্ছে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে আমাদের দেশে উন্নয়নের পথে একটি প্রধান বাধা তা যে আমরা আজ নতুন শুনছি তা নয়; আবার জনসংখ্যার সমস্যাটি যে কেবল আমাদের দেশেরই সমস্যা তাও নয়। পরিসংখ্যানে জানা যায় ১৯৫০ সালে যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল দুশো পঁচিশ কোটি, এখন সেই জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে সাড়ে পাঁচশো কোটি অর্থাৎ বিগত চল্লিশ বছরে ভারতের মত পৃথিবীর জনসংখ্যারও বৃদ্ধি প্রায় একই হারে ঘটেছে। কিন্তু এই হার বৃদ্ধি ঘটেছে পৃথিবীর কতকগুলি অনুন্নত দেশেই, আমাদের দেশ যাদের মধ্যে অন্যতম; এবং এই সব দেশের অনগ্রসরতা দূরীভূত হচ্ছে না যেসব কারণে তার মধ্যে প্রধান কারণই হচ্ছে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ভারত, চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও বার্মা ও শ্রীলংকা বর্তমান এই ছয়টি দেশের জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় আড়াইশো কোটি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চীন বিগত এক দশক ধরে কয়েকটি কঠোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সারা চীনব্যাপী একটি সুসংহত প্রচার চালানো হচ্ছে—ফলে চীনে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা একেবারেই মামুলী ও দুর্বল। সেজন্য এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারে কোন তারতম্য ঘটছে না; যতটুকু ঘটছে তা ঘটছে সমাজের উপরতলার পরিবারগুলিতেই যাদের সংখ্যা মোট পরিবারের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। আমরা আর নিজেদের দেশকে অনুন্নত বলে ভাবতে চাই না, ভাবছি উন্নয়নশীল দেশ বলে। আমাদের

দাবী : অতি দ্রুত আমাদের দেশ উন্নত দেশগুলির সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। একটি দেশকে উন্নত হতে গেলে যে সব বড় ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার—যেমন দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কারখানা পত্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার—প্রভৃতি এই ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে আর এইসব কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে যে ঘটছে না তাই নয়, কিন্তু সে উন্নয়ন হচ্ছে একটি সীমিত বলয়ের মধ্যে। এই উন্নয়নের ফলকে কোথাও কোথাও তৃণমূল পর্যন্ত ক্ষীণধারায় প্রবাহিত করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ; কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে তা কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি ইউরোপের দেশগুলি, আমেরিকা ও জাপানের কাছে কোন বড় সমস্যা নয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসুচী এইসব দেশের রাষ্ট্র ও জনসাধারণের কাছে তাই কোন বৃহৎ জাতীয় কর্মসুচীও নয়। এইসব দেশের উন্নয়নের মডেলটিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা সেই মডেল গ্রহণ করে কোনক্রমেই আমাদের দেশকে অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারি না, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আনতে পারি না। চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আমাদের সমস্যারই অনুরূপ। এই সমস্যার সমাধানে চীনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও চীনের জনসাধারণ একটি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে - এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই। চীনের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি আমরা যোল আনা গ্রহণ করবো কিনা কিম্বা যোল আনা গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে কিনা—অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা অবশ্যই বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জনজীবন যে বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তাকে ঠেকাতে হলে আমাদের অনুরূপ কোন পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হবে! কাজটি কোন দয়ামায়ার ব্যাপার নয়; এটি একটি দুরূহ জাতীয় সমস্যা।

আমাদের অনেকের ধারণা এবং কারো কারো অভিযোগ : আমাদের দেশের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা একেই অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন

যে যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে তাদেরই পারিবারিক জীবন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দরিদ্রতা ও অভাব থেকে তারা মুক্ত হতে পারছে না, তবুও জনসংখ্যার বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের কোন কর্মকাণ্ডে তাদের বিশেষ উৎসাহিত করা যাচ্ছে না. তাদের মধ্যে থেকেই একটি প্রচণ্ড বাধা দেওয়ারই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষভাবে গ্রাম ও বস্তি এলাকায় সরকারী ও বেসরকারী স্তরে যে সব কর্মী জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীতে নিযুক্ত, তারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই প্রতিরোধের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীকে সফল করা যাচ্ছে না। ঘটনাটি যে সর্বৈব অসত্য তা নয়। এই সব শ্রেণীর মানুষ যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যুগ যুগ ধরে কালাতিপাত করে এসেছে এবং এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে—জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনকে সীমিত করার ধারণাটি তাদের কাছে একেবারে নতুন ও অদ্ভুত বলে মনে হবে—এটি তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি আমরা নিছক জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসুচী রূপায়ণের একটি ব্যাপার বলে মনে করছি·· এর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত একটি বদ্ধ মানসিকতার পরিবর্তনের বিষয়টি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে আর এই মানসিকতার পরিবর্তনের কাজটি যে অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়—তা আমরাও অনেকে বুঝছি না। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের দেশে অগ্রসর ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটি ভুল বোঝাবুঝিরও অবকাশ ঘটছে এবং এর ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসুচীই বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। বঞ্চনা ও শোষণ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় মৌলবাদীদের অপপ্রচারের প্রভাব—দীর্ঘকাল ধরে এ সবের মারাত্মক প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের সমাজের একটি স্তরে— অনগ্রসরতা তো সেই প্রতিফলনেরই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষকে যদি এই অবস্থায় এনে ফেলা হয়ে থাকে এবং কয়েক যুগ ধরে এই অবস্থাকে

একটি স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে, তাহলে রাতারাতি অতি সহজে এই অবস্থার রূপান্তর ঘটে যাবে—এই ধরণের কোন আশা করা কি সঙ্গত হবে? এখানে প্রয়োজন ধৈর্যের, প্রয়োজন সহানুভূতির, প্রয়োজন সমস্যার গভীরে যাওয়ার মানসিকতার। আর এ প্রয়োজন মূলতঃ তাদেরই যারা সত্যই মনে করছে—দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটি একটি সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য। অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা তাদের স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসছে না, জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী গ্রহণে তাদের অনীহা —এই কাজে এই ধরণের অভিযোগ অর্থহীন ও ক্ষতিকর; অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্যও নয়। প্রসঙ্গত আরও বোঝা দরকার যে, যে সামাজিক বাতাবরণে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠেছে এবং মূলতঃ যাদের সামাজিক স্বার্থে এই বাতাবরণ গড়ে তোলা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল কায়েম করে রাখার পরিকল্পিত চেষ্টা হয়েছে—সমাজের সেই শ্রেণীরই একাংশ সেই একই স্বার্থে আজও পরোক্ষে সেই সমাজ পরিবর্তন-বিমুখী অচলায়তন মানসিকতাকে জিইয়ে রাখার কাজে ইন্ধন যোগাচ্ছে। ব্যাধি আজ আর কোন বিশেষ শ্রেণী বা স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সমাজের গুণগত পরিবর্তনের সর্বস্তরেই একটি মানসিক অনীহা লক্ষ্য করা যায়। তবে এর কারণ দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন চরিত্রের। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা যদি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে থাকে, তাহলে সমাজের উপর তলার মানুষদেরও একাংশ অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তি লাভের তাগিদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থে অনগ্রসর শ্রেণীর মানসিকতায় অধিকতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, তাদের ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা অর্জনের পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আবার এর সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীদের অভিসন্ধিমূলক ভ্রান্ত প্রচার যুক্ত হয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। ভগবান যখন জীব সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবের আহার যোগাবেন, এতে মানুষের কি করার আছে—এখনও কিছু লোকের মধ্যে এ দেশে এই ধরণের ধর্মীয় প্রচার মন্ত্রমুগ্ধের মত

কাজ করে। আইন করে কিম্বা চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যে জন্মনিরোধের যে সব আধুনিক বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে বা প্রক্রিয়া গ্রহণের কথা হচ্ছে তা ধর্মের অনুশাসন বিরোধী অনেক শিক্ষিত মনেও মানুষের এই ধরণের প্রচার প্রভাব বিস্তার করে। যদিও অত্যধিক সন্তান সন্ততির জন্ম ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করবেন না, গান্ধীজী, মাদার টেরেজার মত মানবতাবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত নেতারা কিন্তু এ ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার সম্পর্কে সংযমের উপরই গুরুত্ব দেবার কথা বলেন, অন্যকোন ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ ও পদ্ধতিকে তাঁরা সমর্থন করেন না। এঁদের অভিমতের প্রচারও কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং গোঁড়া ধর্মীয় নেতারা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এই অভিমতকে হাতিয়ার করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করছে। এই সব প্রচার ও প্রভাবকে কাটিয়ে সংস্কারমুক্ত হওয়া অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজেই অনগ্রসর মানুষেরা তাদের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং তাদের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ তাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যাবৃদ্ধির কথা জেনেও তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীতে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করছে না—এ অভিযোগ নিতান্ত একপেশে, সর্বৈব সত্য নয়।

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে আমাদের দেশের রাজনীতি যে এ ব্যাপারে কতখানি দায়ী তাও আমাদের হিসাবের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। দেশ স্বাধীন হবার পরেই দেশের রাষ্ট্র নেতারা বুঝেছিলেন যে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কত গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং সেইজন্যই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হবার শুরু থেকে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আইন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিবিধ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে দেখা গেছে এইসব আইন ও কর্মসুচীর সুযোগ গ্রহণ করেছে দেশের অগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরাই; অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোন সাড়া জাগায়নি। তার প্রধান কারণ যে আন্তরিকতা নিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে এই কর্মকাণ্ডে

উদ্বুদ্ধ করা উচিত ছিল, এই ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল—তা হয়নি ; ফলে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা মধ্যে নতুন মানসিকতারও সৃষ্টি হয়নি। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার-কল্যাণ পরিকল্পনা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধে ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এই পদক্ষেপটি যে সঠিক ছিল এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কের ধূলিঝঞ্ঝায় ও নানা অপপ্রচারের প্রচণ্ড দাপটে সেই পদক্ষেপ পথভ্রষ্ট হলো. অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মনকে আতংকিত ও বিষাক্ত করা হলো এবং এই ইন্দিরা গান্ধী যে ৭৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণই ছিল এই কর্মসূচী গ্রহণ। কর্মসূচীর পদ্ধতির মধ্যে কোথাও কোথাও যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না. কিন্তু তার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানোর মধ্যে হয়তো বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু এই সঙ্গে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধে যে একটি নতুন ভাবনা চিন্তা ও উদ্যোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ এসেছিল তা নস্যাৎ করে দেওয়া হলো। ঐ ঘটনার পর আরও প্রায় বারোটি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যদিও পরিবার-কল্যাণ পরিকল্পনার কর্মসূচী আগের মতই চালু আছে, কর্মসূচী রূপায়ণে সরকারী-বেসরকারী স্তরে কর্মীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, অর্থ জোগানও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—এ সবই সত্য ; কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মোদ্যোগে সে জোয়ার সৃষ্টি করা আর সম্ভব হয়নি। ভোটের সংখ্যা দিয়েই যেখানে রাজনীতির উপযোগিতা নির্ধারিত হয় সেখানে অনগ্রসর মানুষের মধ্যে চালু সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিবর্তনে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর মত কি শেষ পর্যন্ত এই অনগ্রসর মানুষের ভোটগুলি হারাতে হবে ? আর এই শ্রেণীর মানুষের ভোটের সংখ্যাই তো বেশী।

বিগত পাঁচ দশকের মাঝামাঝি সময় ; আমিও তখন রাজনীতির

মধ্যে, কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। একটি বড় গোছের কৃষক সম্মেলন, সম্মেলনের প্রধান বক্তা একজন জাতীয় স্তরের প্রখ্যাত কৃষক নেতা, তাত্ত্বিক ও সুবক্তা। তৎকালীন জাতীয় সরকারের কাছে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি তখনই একটি সমস্যা হিসাবে অনুভূত হচ্ছে এবং এই সমস্যার নিরাকরণে সরকারের পক্ষ থেকে পরিবার-পরিকল্পনার জন্য কতকগুলি কর্মসূচীও গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির সমালোচনায় ঐ নামী বক্তার ভাষণে স্বাভাবিকভাবেই এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি এসে গেল। পরিবার পরিকল্পনা মূলতঃ একটি বুর্জোয়া সরকারের নীতি ; দেশের মানুষকে পেট ভরে খেতে দিতে পারার ব্যর্থতাকে ঢাকার একটি সুকৌশল যুক্তি, চীনের জনসংখ্যা আমাদের দেশের জনসংখ্যার অনেক বেশী, সে দেশের সরকার তো জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলছে না; সোভিয়েত রাশিয়ায় যে সব মহিলা অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততির জন্ম দিতে পারছে তারা সরকার থেকে পুরস্কৃত হচ্ছে; তার কারণ চীন ও রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছে, কাজেই সে সব দেশে খাদ্যাভাবের কথা ভাবার কোন সুযোগই নেই। কাজেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নও নেই। বয়সের সঙ্গে ছেলের পা দুটো বড় হয়েছে, পুরানো জুতোয় আর কাজ হচ্ছে না, নতুন কেনারও ক্ষমতা নেই, তাই বাপের নির্দেশ হচ্ছে—পায়ের আঙুলগুলিকে ছেঁটে দিয়ে পা ছোট করে দাও, তাহলেই ঐ পুরানো জুতোতেই চলে যাবে, নতুন জুতা কেনার ঝামেলা থাকে না—দেশের সরকারের পরিবার পরিকল্পনার নীতি এই ধরণের একটি শোষণের শয়তানী নীতি। এই নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ধাপ্পাবাজির অপচেষ্টা চলবে না ইত্যাদি—সংক্ষেপে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে উক্ত কৃষক নেতার ছিল এই মর্মে একটি কঠোর সমালোচনা। বলা বাহুল্য এই বক্তব্য ঐ সম্মেলনে সমবেত দরিদ্র কৃষকের দ্বারা খুবই অভিনন্দিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে একজন স্থানীয় কৃষক

নেতা তাঁর ভাষণে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন: এই ধনীকদের সরকার দেশের গরীব মানুষদের খেতে দিতে পারছে না, থাকতে দিতে পারছে না, জীবনে আনন্দভোগের সব সুযোগ এই সব শয়তান নেতারা কেড়ে নিয়েছে; শত বঞ্চনার মধ্যেও গরীব মানুষেরা স্ত্রী পুরুষ যে রাত্রে সুখ ভোগ করছে সেই আনন্দটুকুও এই সরকার কেড়ে নিতে চায়। দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করার পক্ষে এই ধরণের প্ররোচনামূলক বক্তব্য ও চমকপ্রদ যুক্তি কতটা কার্যকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীকালে চীনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সে দেশের সরকারকে কি কঠোর আইন চালু করতে হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এখনও যে খাদ্যাভাব আছে —এসবই তো সত্য ঘটনা এবং তা পরবর্তীকালে জানা গেছে। রাজনীতি আলোচনা করা এই লেখার আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ তাদের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানসিকতাকে পরিত্যাগ করে নতুন দিনের আলোয় বেরিয়ে আসছে না তার মূলে তারাই যে কেবল দায়া ষোল আনা তা সত্য নয়। তারা যাতে দীর্ঘদিনের অচলায়তন কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য আমাদের দেশে দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এমনই বিভ্রান্তকর প্রচার ও অপচেষ্টা চালানো হয়ে থাকে—প্রসঙ্গত তারই নজীর হিসাবে ঘটনা তুটির উল্লেখ করা হলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে দেশের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে, কাজেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা অনগ্রসর সমাজের মানুষেরই সমস্যা—এভাবে ভাবা কোনক্রমেই উচিত হবে না, ভাবলে, তা হবে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী, জাতীয় উন্নয়ন বিরোধী।

জন্মহার বৃদ্ধির কারণ পৃথিবীর সব দেশেই যে একই রকম হবে তা নাও হতে পারে। বিষয়টি নৃতত্ব, জীববিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গবেষণার বস্তু। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ যে অবশ্যম্ভাবী তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না; এ ব্যাপারে অন্য কোন বিকল্পের কথা ভাবা

যায় না। আর্থ-সামাজিক অবস্থায় গ্রামোন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এ দুটি ঘটনা কোনক্রমেই কোন দেশেই পাশাপাশি চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটি উন্নত, সুস্থ ও স্বাবলম্বী সমাজ কিম্বা একটি অনগ্রসরতার চাপে ভগ্নপ্রায়, উদ্যমহীন বিশাল জনাকীর্ণ দেশ এই দুটি সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যে আমাদের একটিকেই বেছে নিতে হবে। তা যদি হয়, তাহলে প্রথমটিকে বেছে নিলে সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জন্মহার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য কোন ভাবে সম্ভবও নয়। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যতই ক্রমোন্নয়ন ঘটবে, সেই দেশের মৃত্যুহার ততই হ্রাস পাবে, মানুষের জীবনীশক্তি বা আয়ু বৃদ্ধি পাবে; ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সেই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কাজেই প্রত্যেকটি দেশকেই তাদের জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের দেশের সামনে যে দুটি পথ খোলা আছে তা হচ্ছে: এক—একটি নতুন ধরণের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা এমন একটি মানব সমাজ গড়ে তোলা অথবা গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করা যে পরিবেশে ব্যক্তি, পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরুষ ও মহিলা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবনধারা ও তাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করবে। আর দ্বিতীয়—কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলার প্রজনন ক্ষমতাকে নিরন্ত্রণ করে তাদের সন্তান সন্ততির জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করা। দুটি পথের মধ্যে প্রথমটি যে অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং জন্মহার নিয়ন্ত্রণে এই পথটি গ্রহণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই পথে সাফল্যলাভ করা একটি দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এবং সম্ভবত: এই পথে ষোল আনা সাফল্য লাভ কোন দিনই সম্ভব হবে না। একটি উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা নতুন সমাজ চেতনার ভিত্তিতে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং এইভাবে দেশের জনসংখ্যা

বৃদ্ধির প্রতিরোধ করা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কিছুতেই সম্ভব নয়; আর সমস্যাটি আমাদের জাতীয় জীবনে এমন একটি ব্যাপার যার নিরাকরণে আমাদের পক্ষে অধিককাল অপেক্ষা করে থাকা যায় না। সমস্যাটির প্রকৃতি যে আমরা বুঝিনি তা নয়, কিন্তু যে সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে উদ্যম ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা নিয়ে সমস্যাটির মোকাবিলায় আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল তা আমরা করিনি; সরকারী বে-সরকারী সর্ব স্তরেই এই ক্রুটী থেকেই গেছে। পরিবার-কল্যাণ পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নে আমরা কখনো লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অত্যুৎসাহে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছি, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই এই কর্মসূচীকে একটি দায়সারা কাজ হিসাবেই গ্রহণ করেছি, একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করিনি।

এই ব্যাপারে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের দ্বিবিধ পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। কোন দম্পতিরই দুটির বেশি সন্তান হবে না— এর বেশি সন্তান হওয়ার অর্থ জন্মলব্ধ শিশুগুলির পক্ষে তো বটেই, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও ক্ষতিকর। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট নীতিকে প্রত্যেকটি পরিবার ও দম্পতিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এই নীতি অমান্য করা একটি অসামাজিক অপরাধ এবং এই অপরাধ সমাজের কল্যাণেই শাস্তি যোগ্য এই মর্মে সরকারের পক্ষ থেকে আইন হওয়া চাই এবং সেই আইন যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য কবার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও সঠিক তদারকি ব্যবস্থাও গড়ে ওঠা দরকার। কিন্তু কেবলমাত্র আইনের সাহায্যেই এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচীকে সফল করা যাবে না। বিষয়টির সঙ্গে শুধু দৃঢ়মূল কুসংস্কার ও অজ্ঞতাই যে জড়িত হয়ে আছে তাই নয়, বিষয়টির সঙ্গে একটি দীর্ঘকালীন মানবিক অনুভূতি ও সংবেদনশীল মনেরও গভীর সম্পর্ক আছে। তাই এ ব্যাপারে কেবল কঠোর হলেই চলবে না, যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হতে হবে। আর এই কাজ কেবল মাত্র বেতনভূক কর্মচারীদেরও কাজও নয়—বিশেষভাবে দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে যখন কর্ম সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবক্ষয়

ঘটছে। সেজন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের এ ব্যাপারে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও তাদের সেই দায়িত্ব পালন করছে না। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি আবশ্যিক শিক্ষাক্রম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি—আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতির ত্রুটি গুরুতর দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সংশোধন হওয়া দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকেই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি অন্যতম শিক্ষাক্রম হিসাবে বাধ্যতামূলক করা জরুরী প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় অনুশাসন গ্রাহ্য হবে না—আমাদের সংবিধানে এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা চাই, এই মর্মে সংবিধানকে সংশোধন করতে হলে তাও করতে হবে; এখানে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে সুযোগ দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। অনগ্রসর শ্রেণীর পরিবারগুলির মধ্যে যারা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণে সার্থক হবে অর্থাৎ জন্মহার নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হবে—তাদের কর্মসংস্থান করে দেওয়া ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক ব্যবস্থা করা দরকার হবে। কোন দম্পতীর পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা কোন লজ্জা বা অসম্মানের কাজ নয়, এটি একটি পারিবারিক দায়িত্ব ও সমাজ কল্যাণকর কর্তব্য এই বোধ যদি অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের চিন্তার মধ্যে একবার সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায় তাহলে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। স্বীকার করতেই হবে—আমাদের দেশে সেই পরিমণ্ডল এখনও গড়ে ওঠেনি; এই সুস্থ পরিবেশটি গড়ে তোলাই জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে আজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে, পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীতে সমান অংশীদার হতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। কারণ অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততির মা হওয়ার যে কি দুঃখ ও বেদনা মহিলাদেরই তো তা সবচেয়ে

বেশি অনুভব করতে হয় এবং সেজন্য পরিবারের সভ্য সংখ্যাকে সীমিত রাখার ব্যাপারে তারা যে বেশী আগ্রহী হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। যদি হীনমন্যতার পুরানো নিগড় থেকে আমাদের মহিলা সমাজ একবার মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী রূপায়ণ করা অনেক সহজসাধ্য হয়ে যায়। এখানে দেশের মহিলা সংগঠনগুলিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলারা যদি একবার এই ধরণের কোন কাজে সক্রিয় অংশ নেওয়ার মত সাহসী হয়ে ওঠে ও আস্থা লাভ করে তাহলে শুধু দেশের অনগ্রসরতা দূরীকরণে নয়, সমাজের যাবতীয় অনাচার অপনোদনের সংগ্রামে এমন একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে যার ফলে তারা সমগ্র সমাজেরই দ্রুত রূপান্তর ঘটাতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে সাফল্য নির্ভর করছে—কিভাবে এবং কতটা সহানুভূতির সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজসেবীরা অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের কাছে সমস্যাটি উপস্থাপিত করছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক ব্যবস্থাগুলিকে সহজলভ্য করতে পারছে. এবং এই ব্যবস্থায় তাদের অংশীভূত করতে পারছে তার উপর। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরও বিকাশ সাধন সম্ভব এবং তা করা বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ; আর এই সমাজ হচ্ছে অখণ্ড, এর কোন অংশকেই অবহেলা করা চলে না। দেশের সম্পদ সীমিত, সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সীমাহীন নয়। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নানা ত্রুটিতে ভরা, এই ত্রুটিগুলি দূরীভূত হলে সমগ্র সমাজের একটি রূপান্তর ঘটবে এবং তা আমাদের দেশেও ঘটবে এ আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি। কিন্তু এই পরিবর্তন বহুলাংশে আমাদের দেশের জনসংখ্যা হ্রাস অথবা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। তাই জাতীয় পুনর্গঠন ও দেশোন্নয়নের অন্যতম আবশ্যিক সর্তই হচ্ছে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—বিষয়টির তাৎপর্য্য এই পরিপ্রেক্ষিতেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিশ্বস্বাস্থ্য একটি মহাজাগতিক সমস্যা

২০০০ বছরের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য—এটি বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রধান দাবী। এই দাবীকে কার্যকরী করার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মসূচী উপস্থিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দেশেই নিজ নিজ দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব কর্মসূচীকে যথাসাধ্য পালনের চেষ্টাও চলেছে। কর্মসূচীগুলি কি কি এবং সেগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই কিছু কিছু ধারণা আছে সেজন্য তা নিয়ে এখানে কোন বিশদ্ আলোচনা করা হচ্ছে না। কর্মসূচীগুলি মূলতঃ জনস্বাস্থ্যমূলক ও পরিবেশদূষণমুক্ত রাখা সংক্রান্ত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সংগ্রাম মানুষের ইতিহাসে তা কোন নূতন বা অভিনব ব্যাপার নয়। নানা প্রাকৃতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেদিন থেকে তার সংগ্রাম শুরু হয়েছে সেইদিন থেকেই বলা যায় তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সংগ্রামের সূত্রপাত। জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ও প্রসারের প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের প্রকৃতিভেদ ঘটলেও মানুষেয় সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকেই এই সংগ্রামের শুরু। কাজেই এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে জনস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যাটি নিছক আধুনিক বা অধুনাকালের। প্রাচীন-কালেও আমাদের দেশের গ্রাম ও শহরের ভৌগোলিক অবস্থান, বাসগৃহের পরিকাঠামো, মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার ধ্যানধারণা, সেচ ও পয়ঃপ্রণালী সংগঠন, বন-মহোৎসব, বৃক্ষরোপণ—ঐ সবের মধ্যেই সেদিনের মানুষ যে একেবারে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অনবহিত ছিল তা নয় তা বোঝা যায়। সুদূর অতীতেও আমাদের দেশ চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত ছিল এরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে অগ্রগতির হার ছিল অত্যন্ত সীমিত ও

মন্থর এবং সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পিত নয়। তখনকার প্রেক্ষাপটে তাই ছিল স্বাভাবিক। কার্যকারণ সম্পর্কে তখন মানুষের জ্ঞান ছিল অল্প এবং সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে চলতো। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে এই প্রেক্ষাপটের একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধির অনেক প্রসার ঘটেছে এবং অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, মানুষ সব ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করছে এবং সর্বব্যাপারে ক্রমশঃই যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে উঠছে কাজেই জনস্বাস্থ্যের সমস্যা সম্পর্কে পুরানো ধ্যানধারণার যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে তা খুবই সাধারণ ঘটনা। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে পরবর্তীকালে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে এবং পুরানো সংস্কারগুলি থেকে মানুষ যতই নিজেকে মুক্ত করতে পারছে ততই তার শারীরজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা স্বচ্ছ হচ্ছে। ব্যাধির নানারকম প্রকাশ (Symptom) থেকেই মানুষ এখন নিজেই বহুক্ষেত্রে ব্যাধির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে নিতে পারে এবং লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেই অনেক সময় বহুরোগের নিরাময়ের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। তা যদি না হতো তাহলে নানা ব্যাধির সংক্রমণ ও প্রকোপ আমরা আজ যে আকারে দেখছি তার সংখ্যা, পরিমাণ ও পরিধি আরও বহুগুণ বেড়ে যেতো এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে মনুষ্যজাতির অংশের বিলোপ ঘটতো। তা ঘটছে না কারণ মানুষের সহজাত বুদ্ধি এবং বেঁচে থাকার প্রচণ্ড আগ্রহ তাকে নানা ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে তার অকালমৃত্যু রোধ করছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার সংগ্রামে মানুষ প্রকৃতি থেকেই সব মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল কথা বহিঃপ্রকৃতি থেকে যে সব শক্তি বা উপাদানের সমন্বয়ে মানুষের অন্তপ্রকৃতি শক্তিঘটিত সেই শক্তির স্বাভাবিক বিকাশে প্রাকৃতিক কারণেই এমন কতকগুলি বাধা ও বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে যে বাধা বিরোধগুলির মীমাংসাকল্পে প্রকৃতি থেকেই কতকগুলি উপাদান সংযোগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চিকিৎসা-

বিদ্যার ভূমিকা হচ্ছে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা ও ঘাটতি পূরণের ভূমিকা। ব্যাধির ঔষধগুলিও সেই উপাদানে প্রস্তুত হয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত মানুষের স্বকীয় শক্তি ও জোর ছাড়া নিছক কোন ঔষধ দ্বারা তার রোগমুক্তি ঘটে এ ব্যাপারটি আদৌ সত্য নয়।

এদিক থেকে বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞানে যতগুলি শাখা আছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্থান মানের বিচারে প্রায় সকলের নীচে। শল্য-চিকিৎসা বাদ দিলে চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি সার্থক বিজ্ঞান হিসাবে আজও গড়ে ওঠেনি। এই বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। মানুষ কেন রোগাক্রান্ত হয়, নানা শারীরিক জটিলতায় ভোগে এসব ব্যাধি ও জটিলতার মূলে যাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা এই সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ব্যাধির ও শারীরিক জটিলতার উপসম সাময়িক নিরাকরণের মধ্যেই এই চিকিৎসাবিদ্যা এখনও মূলতঃ সীমাবদ্ধ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে এই সব ব্যক্তির জন্মলাভ কিভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে আধুনিক চিকিৎসকদের এসব প্রশ্নের বিশেষ জবাবদিহি করতে হয় না। প্রাত্যহিক জীবনের দায়দায়িত্ব নিয়ে মানুষ এতই ব্যস্ত এবং এমন একটি দুর্নিবার প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থার বাতাবরণে চলার নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যেখানে কোন ব্যাধির সাময়িক উপশমকে তারা অধিকতর প্রয়োজনীয় কাম্য বলে মনে করে এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার এই দুর্বলতার উপর ভিত্তি করেই এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। চিকিৎসকমণ্ডলী চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুণীজনের একটি অদ্ভুত মানদণ্ডও এর ফলে সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে, বহু রোগের সাময়িক নিরাময় হলেও যে শারীরিক ও মানসিক পরিমণ্ডলে বাস করলে মানুষ সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তার কোন পরিবর্তন ঘটছে না। এমনও অভিযোগ শোনা যায় আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা পৃথিবীকে ব্যাধিমুক্ত করছে না। ব্যাধির সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি করছে। অভিযোগটি যে একেবারে ভিত্তিহীন তা নয়। যদি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি যথেষ্ট

নির্ভরযোগ্য হতো তাহলে জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নটি আজ এত জরুরী হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে দেখা দিত না।

জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার বিষয়টি আজ সবদেশে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা শুধু এইজন্যই নয় যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যয়বহুল। দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষের পক্ষে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেইজন্য জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে দেশের অধিকাংশ মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে হবে। বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা যাচ্ছে না বলেই অল্প ব্যয়সাপেক্ষ জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে বিষয়টিকে এভাবে ভাবা আদৌ ঠিক নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান বা চিকিৎসাশাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার দিকটি তুলে ধরার প্রয়োজন হলো এইজন্যই যে, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগনিরাময় প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েও জনস্বাস্থ্যের বাতাবরণটি কিভাবে সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গড়ে তোলা যায় এবং সেই বাতাবরণটিকে সাধারণ মানুষেরাই নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি উদ্যোগের মাধ্যমে রক্ষা করে দেশব্যাপী একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও এই বিজ্ঞানের ছাত্রগণ ও সমগ্র চিকিৎসক সমাজ তাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে এই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় ও সার্থক অংশীদার হওয়া, এই ভাবনায় ভাবিত হওয়া, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া। দুঃখের বিষয়, চিকিৎসাশাস্ত্র মানুষের রোগ নিরাময়ে যতটা আগ্রহী, রোগের মূলীভূত কারণ নির্ণয় ও তার বিলোপসাধনে ততটাই নির্বিকার। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গতির এই মোড় ফেরানো একান্ত প্রয়োজন। যদি তা না করা হয় তাহলে এই চিকিৎসাবিজ্ঞানকে আগামীদিনে একটি গুরুতর বিচ্যুতি ও অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। ব্যাধির উপশম করার নামে তারা যে বহু নূতন নূতন দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টিতে সহায়ক হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যের পরিমণ্ডলকে অধিকতর জটিল ও কলুষিত করে তুলছে এ-দায় থেকে তারা কিছুতেই মুক্ত হতে

পারে না। জনস্বাস্থ্যের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌল বিষয় হওয়া উচিৎ এবং এই বিষয়টিকে যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের গড়ে ওঠেনি তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই আলোচনা ; তাই, এই আলোচনায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার বিষয়টিকে এড়ানো যায় না। বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্যটিকে পূরণের আবেদন উপস্থিত করেছে—তা থেকে মানুষ যে উপকৃত হচ্ছে না তা ঠিক নয়। পৃথিবীর বহু দেশেই জন-স্বাস্থ্যের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে ঐ সব দেশে বহু সাধারণ সংক্রামক ব্যাধির শুধু প্রশমন নয় বিলোপ ঘটেছে ; শিশু-মৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। অপুষ্টিজনিত রোগে মা ও শিশুরা আর ভুগছে না। ভুগলেও তার প্রকোপ আর তত ভয়াবহ নয়। মানুষের আয়ু ও জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। জনসংখ্যার ও মৃত্যুহার দুইই ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তথ্য দিয়ে এই পরিবর্তনের প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কেননা এটি সত্য ঘটনা এবং অনেকেরই জানা। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের দেশের দাবী খুবই দুর্বল। নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে, নানা প্রচেষ্টার ফলেও আমরা আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে অগ্রগতি লাভ করেছি তুলনামূলক ভাবে তা যে আদৌ সন্তোষজনক নয় শুধু তা নয়, অনেকক্ষেত্রে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর ও হতাশাজনক। বলা যায়, জনস্বাস্থ্যের বাতাবরণ গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা প্রায় একই স্থানে অবস্থান করছি। নিঃসন্দেহে এতে আমাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় প্রকাশ পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে তো বটেই বহু অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশেও কলেরা, উদরাময়, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগুলি হয় একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা এইসব ব্যাধির প্রকোপ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এইসব ব্যাধি বর্তমানে আমাদের দেশে সংক্রামক আকারে দেখা না দিলেও আমাদের দেশ এসব ব্যাধির প্রকোপমুক্ত—এ দাবী করা যায় না।

আমাদের দেশের জন্মহার যেমনি লাগামছাড়া, মৃত্যুহারও তুলনা-মূলকভাবে তেমনি বহুগুণ বেশী। শিশু মৃত্যুর হার যে-কোন দেশের সংখ্যাকেই আজও ছাপিয়ে যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এখনও সর্বত্র গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। বসবাসের পরিবেশ বহুক্ষেত্রেই অমলিন ও অস্বাস্থ্যকর। গ্রামাঞ্চলে মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি বলা যায়। জনস্বাস্থ্যের চিন্তা ভাবনা শুধু গ্রাম এলাকার মানুষের মধ্যে নয় শহরবাসীর মধ্যেও জনস্বাস্থ্যের ধারণা যে কত দুর্বল তাও আজ আর কোনো অজানা ব্যাপার নয়। যে সব দেশের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারীর সমস্যা প্রবল, ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সেখানে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা ও গড়ে তোলার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যে কোন চেষ্টা চলছে না তা নয় কিন্তু চেষ্টার সমস্যাটি আজও যে ভয়াবহ আকারে রয়েছে তার সমাধানকল্পে অতি নগণ্য এবং যতটুকু চেষ্টা হচ্ছে তাও পরিকল্পনাবিহীন। সংক্ষেপে বলা যায় জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে আমাদের দেশের স্থান একেবারেই নীচের দিকে। আবার দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গেই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; জনস্বাস্থ্যই হচ্ছে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যেরই অন্য নাম বা নামান্তর মাত্র। তাহলে দেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষা গড়ে তোলার সমস্যাটি অনেকগুলি সমস্যার মত আরেকটি সমস্যা এভাবে লঘু করে দেখা যায় না। সেইজন্যই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জনস্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ২০০০ সালের মধ্যেই সকলের জন্য স্বাস্থ্য, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য এই দাবী পূরণের জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে উদ্যোগী ও দৃঢ়সংকল্প হওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

আমাদের দেশ তুলনামূলকভাবে অনেক পিছনে পড়ে আছে তা ঠিকই কিন্তু এখানেও যে একটি উদ্যোগ চলেছে তাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় জীবনে বহু নৈরাশ্যের মধ্যে একটি আলোর দিক। কিন্তু বিশ্বজনস্বাস্থ্যের বিষয়টি আজ আর কোন পুরানো বা গতানুগতিক জনস্বাস্থ্য রক্ষার ধ্যান-ধারণা বা ব্যবস্থা

গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনেক মৌলিক, গভীর ও ব্যাপক। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যেই কেবল বিষয়টির গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্ব-রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে যে বিষয়টি জড়িত হয়ে পড়ছে এইভাবে বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সেইজন্যই বলা হচ্ছে বিশ্বস্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যা আজ একটি মহাজাগতিক সমস্যা। এই সমস্যার চরিত্র ও ব্যাপকতা আজ আর কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন কি ভৌগোলিক পর্যায়ে আমরা যে পৃথিবীর মধ্যে বাস করছি সেই পৃথিবীর মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। যা একদিন ছিল ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয় তা কালক্রমে ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করে সর্বদেশের গোটা ভূমণ্ডলের পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়েছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়টি আজ তাই বিশ্বপরিমণ্ডলের সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেইজন্যই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকে বলা হচ্ছে একটি global issue অথবা problem of the universe আর এই বিষয় (affair) অথবা সমস্যা (problem) বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সমস্যা। বিষয়টির প্রকৃতি ও চরিত্র যদি তাই হয় তাহলে আমরা জনস্বাস্থ্যের সমস্যাটি নিরাকরণে যে ধরণের ধ্যানধারণায় পরিচালিত হচ্ছি অথবা এই সমস্যার সুষ্ঠু নিরাকরণ যে ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে সম্ভবপর ও সম্পূর্ণ করে তুলতে চাইছি তাতে যে শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। শুধু আমাদের দেশ নয় সমগ্র পৃথিবী যে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে পরিস্থিতি যে সেইদিকে মোড় নিচ্ছে একটু স্থির ও যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে লক্ষ্য করলেই তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এমন একটি সহজ ব্যাপার বোঝার পথে অবশ্যই একটি অন্তরায় আছে, আর সে অন্তরায় মানুষেরই একাংশের সৃষ্টি। ঘটনাটিকে সমগ্র মানব-জাতির আত্মহত্যার সামিল বলেও গ্রহণ করা যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে সব থেকে মারাত্মক ঘটনা হচ্ছে, এই সর্বনাশের জন্য আমরা

প্রায় সকলেই হয় সক্রিয় অংশীদার. নয় সমর্থক। তাই যদি এই বিপর্যয় আগামী দিনে সত্যিই ঘটে তাহলে তার দায়ভার আমাদের সকলকেই গ্রহণ করতে হবে সেইজন্যই বিষয়টি নিয়ে শুধু আলাপ আলোচনা নয়, বিতর্ক নয়, গভীর আলোড়ন হওয়া দরকার। সারা দেশব্যাপী নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি তার বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে ওঠা দরকার।

১৯৬০ সালে উপনীত হ'তে আর মাত্র দশটি বছর বাকী। এই বছরের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য চাই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশেও জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা চলেছে তার গুরুত্বকে আদৌ লঘু করে দেখা হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের চিন্তার প্রতিপাদ্য বিষয় আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি যে আকারে ও যে প্রকৃতি নিয়ে দেখা দিচ্ছে তার সুষ্ঠু নিরসন বা মীমাংসা কী বর্তমানে আমাদের গৃহীত জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের মধ্যে সম্ভব হবে? কর্মসূচীগুলি যদি ষোল আনা রূপায়িত হয় তাহলেও কি তা সম্ভব হবে? প্রশ্নটি কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, কোন ভাবাবেগ থেকেও প্রশ্নটি উত্থিত হচ্ছে না। আজ সব দেশের চিন্তাশীল মনীষী ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কাজেই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সেইজন্যই বলা হয়েছে তা হবে আমাদের সকলের মানবজাতির আত্মহত্যার সামিল। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও গড়ে তোলার কর্মসূচী হিসাবে আমরা যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছি বা করতে চাইছি তার মধ্যে যেগুলি প্রধান তা হচ্ছে সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রতিষেধক টীকা ও ইঞ্জেকশন গ্রহণ, শিশুপুষ্টি ও সুষম খাদ্য সরবরাহ। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা। সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণ, গৃহে গৃহে ধোঁয়াহীন চুল্লীর প্রবর্তন, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক বনসৃজন, জন্মহার নিয়ন্ত্রণ, নেশা ও ধূমপান বর্জন ইত্যাদি। এটা ঠিকই যে সব দেশের মানুষ জনস্বাস্থ্যের এইসব মূলকর্মসূচীগুলি স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে অনুসরণ করছে তারা

তুলনামূলকভাবে নীরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। অন্ততঃ আপাতঃ-দৃষ্টিতে ও পরিসংখ্যানের বিচারে তা প্রমাণিত হয়। এই মানদণ্ডে আমাদের দেশ অনেক পিছনে পড়ে আছে এবং সেজন্য এখানে জন-স্বাস্থ্যের সমস্যা ও প্রকৃতিটি একটু স্বতন্ত্র ধরণের এবং জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য যে প্রাথমিক দায়িত্ব আছে সে দায়িত্বকে আমরা অবহেলা করতে পারি না কিন্তু স্থানীয় পরিবেশের স্বাস্থ্যের বিষয়টি যদি সম্পূর্ণ-ভাবে বিশ্বপরিবেশের স্বাস্থ্য ও দূষণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং কোন একটি বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় এবং সীমিত এলাকায় সেই নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের জনস্বাস্থ্যের সমগ্র বিষয়টির ধ্যানধারণা এবং আমাদেরও আমূল পরিবর্তন আনতে হয় এবং সেক্ষেত্রে আমরা উল্লিখিত মামুলী বা গতানুগতিক জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচীগুলিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করতে পারলেই দেশের জন-স্বাস্থ্যের সমস্যাটির স্থায়ী ও দৃঢ়ভিত্তিক সমাধান হয়ে যাবে এই চিন্তাটি যে আজ সম্পূর্ণ একপেশে ও ভ্রান্ত তাও বুঝতে হবে।

মানুষের সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ জীবনযাপনের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার তিনটি প্রধান পূর্বসর্ত হচ্ছে : ১। বিশুদ্ধ পানীয় জল, ২। নির্মল বাতাস, ৩। সুষম পুষ্টিকর খাদ্য ও ৪। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এ সর্তগুলি অবশ্য মানুষের শরীরে স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষের ভিতরে মন বলে একটি বস্তু আছে এবং সেজন্য মানুষকে তাই মনটিকেও সুস্থ রাখতে হয়। মনটি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ একটি মানুষ যদি মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট স্থির ও সুস্থ না থাকে তাহলে এই অসুস্থতার উপসর্গ তার শরীরের মধ্যে প্রকাশ পাবেই সেইজন্য জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতা গড়ে তোলা বা অর্জন করার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটি জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার বিষয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলোচনার সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আজও আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশ কেন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে সব দেশ খুব উন্নত সেই সব দেশেও চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও খুবই অনগ্রসর;

আসলে এই চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষকে সুস্থ ও নীরোগ রাখার পক্ষে কোন সার্থক ও সামগ্রিক বিজ্ঞানই নয় একটি সম্পূর্ণ আংশিক ও খণ্ডিত বিজ্ঞান কেন না এই চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপযোগিতা অথবা সার্থকতা মানুষের রোগের উপশমের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ। ব্যাধির মূল সন্ধান ও দূরীকরণ এই অবস্থায় এসে উপনীত হওয়ার মতো এই চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে নি, রুগীকে বাদ দিয়ে রোগের চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে আজও এই সীমাকে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র হলেও জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও যে কি ভূমিকা আছে, তাই এই চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও একটি সঠিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে এবং তাই সে পর্যালোচনা জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়টির মধ্যে না এসে পারে না। বিশেষভাবে যখন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধ্যানধারণার মধ্যে মানুষের ভিতরকার মানসিক সুস্থতার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিসত্তা কোন খণ্ডিত শক্তি নয়। ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তি মানুষ পূর্ণতালাভের অধিকারীও নয়। সমষ্টির কল্যাণ ও স্বার্থকতার মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ ও স্বার্থকতা। এখানে মানুষের পূর্ণতা লাভেরও কতকগুলি শর্ত আছে। সে শর্তগুলি পালন করলেই তবে মানুষ শরীর ও মন উভয় দিক থেকেই নীরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে, কাজেই একথা বিস্মৃত হলে চলে না যে দেশের জনস্বাস্থ্যকে গড়ে তোলা ও দৃঢ়ভিত্তিক করার বিষয়টি নিছক কতকগুলি বহিঃপ্রকৃতির শর্তপূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বিষয়টির সঙ্গে মানুষের মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতার একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে।

আপাততঃ আমাদের যদি জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত গড়ে তোলার ব্যবহারিক (material) শর্তগুলিকে অবশ্য পালনীয় ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি তাহলে বর্তমানে শুধু পৃথিবীর [illegible] বিশ্বসমস্যাগুলো আজ যে রূপে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে তাতে কি আমরা [illegible] বিশ্বাস করতে পারি যে [illegible] দেশে কিংবা অঞ্চল, অঞ্চলে

বাতাস, সুষম পুষ্টিকর খাদ্য, সবরকমের দূষণমুক্ত পরিবেশ এর কোনটাই কি আমাদের কারুরই পক্ষে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা বা অর্জন করা সম্ভব। পুকুর, ডোবা, নদী, নালা এমনকি ইন্দারা, কুয়োর জলও যে পানীয় জলের পক্ষে উপযোগী নয় এবং এতদিন পর্যন্ত অনুসৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা (source) গুলিকে বর্জন করেছি এবং ভূগর্ভ থেকে নির্গত নলকূপের (tubewell) জলকে বিশুদ্ধ পানীয় জল বলে গ্রহণ করছি। এখন পর্যন্ত নলকূপের জলই আমাদের দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল বলে স্বীকৃত হচ্ছে কিন্তু নলকূপ মারফৎ ভূগর্ভ থেকে যে জল নির্গত হচ্ছে এবং যা আমরা বিশুদ্ধ পানীয় জল বলে গ্রহণ করছি সেই জল যে সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল এ-সম্পর্কেও তো এখনি গভীর সংশয় ও বৈজ্ঞানিক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এই জল যে বীজাণুমুক্ত নয় সেইজন্যই পাশ্চাত্ত্য উন্নত দেশের মানুষ ইতিমধ্যেই এই নলকূপের জলকে বিশুদ্ধ পানীয় জল বলে গ্রহণ করছে না। তারা পানীয় হিসাবেই বিকল্প ব্যবস্থা ভাবছে ও গ্রহণ করছে। সেসব দেশে সে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে কেননা সেসব দেশের মানুষ বিপুল বিত্তের অধিকারী। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের জোরে এবং তাদের প্রয়োজন অত্যন্ত সীমিত বলেই আমাদের দেশে এখনও প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবারের জন্য নলকূপ মারফৎ পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশের সরকারের অষ্টম যোজনার ঘোষণায় সে প্রতিশ্রুতি আছে এই প্রতিশ্রুতি সত্যিই কতখানি রক্ষিত হবে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে কেননা আমাদের দেশে প্রতিশ্রুতির সঙ্গে প্রকৃত কাজের সামঞ্জস্য রাখার যে দায়দায়িত্ব আছে আমরা কেউ তা মনে করি না। ধরা যাক আগামী দশবছরের মধ্যে সারা দেশের সর্বপ্রান্তে আরও কয়েক লক্ষ নলকূপ স্থাপন করে সকলের জন্য পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলো। তাহলে ও কি আমরা সুনিশ্চিত হলাম যে, আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা ও গড়ে তোলার প্রথম প্রাথমিক শর্ত যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করা তা সম্ভব হলো? নলকূপ মারফৎ ভূগর্ভ থেকে যে জল নির্গত

হচ্ছে তা যদি নানা বীজাণুতে ভরা থাকে তাহলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যাটিতো আগের মতো থেকেই গেল। সমস্যাটি দূরীভূত হ'লো কোথায়? আর তা যদি হয় আমাদের সামনে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের বা পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থাটি কি হওয়া সম্ভব। ফুটন্ত জলকে ঠাণ্ডা করে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা অথবা বীজাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করে জলকে বীজাণুমুক্ত করে সেই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা—এভাবে জল পরিশুদ্ধ করার সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে দেশের কোটি কোটি মানুষের সার্বজনীন ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা কি এতই সহজ ও সরল? বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার জন্য এভাবে সময়, শ্রম ও জ্বালানীর অপচয় করা আমাদের মতো গরীব দেশে কি সম্ভব? কিন্তু এখানেও যে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে তা হচ্ছে: ৫০০—১০০০ ফুট নীচে ভূগর্ভে যে জল সঞ্চিত থাকে সেখানে যেসব বীজাণুর দ্বারা জল দূষিত হচ্ছে সে সব বীজাণু তো সেই স্থানে থাকার কথা নয় এতো ভূবিজ্ঞানীদেরই অভিমত তাহলে ভূগর্ভে এই সব বীজাণুর আবির্ভাব ঘটলো কিভাবে? আর এই জিনিস যদি ঘটতেই থাকে তাহলে ভূগর্ভের জলকে পানীয় জল বলে গ্রহণ করা যায় না, দূষিত জল বলে তা বর্জন করতে হয়। আর তা যদি হয় তাহলে জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার প্রথম শর্তটিতো গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ নলকূপ নির্গত যে জলকে আমরা বিশুদ্ধ পানীয় জল বলে গ্রহণ করছি আসলে সেই জলও যে নানা বীজাণুতে পরিপূর্ণ দূষিত জল, বিশুদ্ধ পানীয় জল নয় তা আমাদের শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হবে।

এখন নির্মল বাতাসের প্রশ্নে যদি আসি তাহলে দেখবো এক্ষেত্রে অবস্থাটি আরও ভয়াবহ। ওজন (ozen) সমন্বিত শুদ্ধ বাতাস যা আমাদের ফুসফুসকে সতেজ ও সচল করে রাখে, রক্তকে পরিষ্কার করে ও রক্তবৃদ্ধিতে সাহায্য করে সমস্ত তন্ত্রী ও স্নায়ুগুলিকে সক্রিয় করে শরীরকে সবল ও সুস্থ করে তুলে—যে নির্মল বাতাসকে বলা যায় মানুষের প্রাণশক্তি স্বরূপ সমগ্র বায়ুমণ্ডল যদি কলুষিত ও বিষাক্ত হয়ে পড়ে

তাহলে আমরা দেশের কোন একটি প্রান্তে আমাদের স্থানীয় পরিবেশকে ষোলো আনা দূষণমুক্ত রাখারও চেষ্টা করি তাহলেও কি আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি যে, ঐ বিশেষ এলাকার মানুষেরাও শুদ্ধ বীজাণুমুক্ত বাতাস গ্রহণ করার অধিকারী হবে ? শিল্প-বিপ্লবের আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি ও গুণগত মান যে অবস্থায় ছিল, আজ তার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর সে পরিবর্তনের সমগ্র বায়ুমণ্ডলের অবক্ষয় ঘটেছে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বায়ুর উৎস ও বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষার মূল উপাদান হচ্ছে সমুদ্র আর বন। গত তিনশত বৎসর ধরে সারা পৃথিবীতে—সারা দেশেই বিরাট বিরাট শিল্প-কারখানা যেমন গড়ে উঠেছে এবং সর্বত্রই এই সংখ্যা যেমন আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি কি উন্নত দেশ, কি অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশে পুরানো গ্রামগুলির অবলুপ্তি ঘটিয়ে ছোট বড় অসংখ্য শহর তৈরী হচ্ছে। এই বিপুল শিল্পায়ন ও শহর উন্নয়নের মাধ্যমে যে আধুনিক সভ্যতার প্রসার হচ্ছে সেই সভ্যতার দাবীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একদিকে যেমন সমগ্র নদীনালা, সমুদ্র প্রভৃতি ভূ-পৃষ্ঠের জলভূমিকে সংকুচিত ও বিষাক্ত করা হচ্ছে, তেমনি বিশাল বিশাল অরণ্যানীর বিনাশ ঘটছে। এই হচ্ছে বর্তমান শিল্প নগর সভ্যতার অনিবার্য অবদান ও অমোঘ পরিণতি। কাজেই আজ আমরা বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা আশা করবো কোন যুক্তিতে কোন বিশ্বাসের ভিত্তিতে ? আমার দেশে বনজসম্পদ রক্ষার জন্য সামাজিক বনসৃজনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, এবং সরকারী ও বেসরকারী স্তরে গ্রামে গঞ্জে, গ্রাম ও শহরের রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষরোপণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনসৃজনের প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক ও সুসংহত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যতই ব্যাপক ও সর্বাত্মক হোক না কেন, এই ধরণের প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতাটুকুও আমাদের বুঝতে হবে যে সমগ্র বায়ুমণ্ডল যে দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে, তা থেকে সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে মুক্ত করা কোন বিকল্প ফলপ্রসূ পথ নয় এই বন সৃজন। বন সৃজনের পথ অনেক সীমিত। এ থেকে যদি বায়ু দূষণের হাত থেকে কোন সুফল লাভের আশা করা যায় তাহলেও সে সুফল হবে একান্ত

প্রান্তিক (marginal)। দেশ ও পৃথিবী সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা ও গড়ে তোলার পক্ষে তা হবে নিতান্ত নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিশাল বিশাল বনরাজী যে সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি কোন দু এক শতাব্দীর ফসল নয়। হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির কোলে অসংখ্য নাম জানা ও নাম না জানা বৃহৎ বৃহৎ বিশাল বনসম্পদ গড়ে উঠেছিল। এই গড়ে উঠার পিছনে মানুষের কতখানি ভূমিকা ছিল বা আদৌ ছিল কিনা তা আজও জানা যায় নি। বলা যায় এই বিপুল জনসম্পদ প্রকৃতিরই সৃষ্টি। জীব জগতের কল্যাণে প্রকৃতিরই অকৃপণ দান—এই বন সম্পদকে মানুষ সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে নির্বিচারে ধ্বংস করবে বনসম্পদ সৃষ্টির পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্যে তা নয়। মানুষের জীবন ধারণের যে মূল উৎস দুটি বাতাস ও জল তার প্রধান আধার হচ্ছে এই সব বিশাল বিশাল বনরাজী। জ্বালানীর প্রয়োজনে এবং তার চেয়েও বড় প্রয়োজন শিল্প ও শহর উন্নয়ন ও আধুনিক বাসগৃহের দাবী মিটাতে গিয়ে যদি মানুষের একাংশ প্রকৃতি সৃষ্ট এই বন সম্পদকে এক যুগের মধ্যেই শেষ করে দিতে উদ্যোগী হয় তাহলে কয়েকশ বছরে হয়তো শহরের পর শহর গড়ে উঠবে, বাসগৃহগুলি নানা আসবাবে সমৃদ্ধ হবে, কিন্তু তার ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলে যে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুমণ্ডল যে ক্রমশই দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভরে যাচ্ছে তা থেকে মনুষ্য সমাজের পরিত্রাণের কোন আশা নেই। ঐ একই কারণে সমুদ্র গর্ভে ও পৃথিবীর সমস্ত জলাভূমিতে যে পরিবর্তন ঘটছে, যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে তারও প্রতিফলন হচ্ছে সমগ্র বায়ুমণ্ডলে। এছাড়া হাজার হাজার শিল্প কারখানা, লক্ষ লক্ষ যানবাহন রেলগাড়ী, বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক থেকে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ টন ধোঁয়া বাষ্প গ্যাস প্রভৃতি নির্গত হয়ে সমগ্র বায়ুমণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও কলুষিত হচ্ছে এবং সেই বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই তো আমাদের দেশ ও পৃথিবীর অবস্থান। কাজেই স্থানীয় ভিত্তিতে যতই আমরা পরিবেশ দূষণ মুক্ত হওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করি না কেন বায়ু দূষণের শিকার না হয়ে আমরা কেউ কি রক্ষা পেতে পারি? সংখ্যা তত্ত্ব ও পরিসংখ্যান দিয়ে এই বায়ুমণ্ডল

কি ভাবে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়ছে তার ফলে সমগ্র মানব সমাজ জীবনে স্বাস্থ্যহানি কিভাবে ঘটছে তা তুলে ধরলে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমরা এমনই একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিদিন পর্বত প্রমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সাথে অনুরূপ পরিমাণ সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড মিশছে নদী নালার প্রবাহ ধারার সংগে এবং শেষ পর্যন্ত এই সব বিষাক্ত দ্রব্যগুলি পতিত হচ্ছে সমুদ্রগর্ভে। এ সবেরই মারাত্মক প্রতিফলন হচ্ছে আকাশে বাতাসে পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে আকাশ বাতাস সবই ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে আর পৃথিবীর মানুষ আমরা সেই বিষাক্ত বাতাবরণের মধ্যেই বাস করছি। এই দূষিত পরিমণ্ডলেই মানুষের জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল ও নির্মল বাতাস পাবার সুযোগ ক্রমশই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কেন এই পরিণতি? কারণ হিসাবে সংক্ষেপে বলা যায় এ হচ্ছে বর্তমাম সভ্যতার সুযোগের অধিকারী হওয়ার কঠিন মূল্য, এই মূল্যটুকু না দিলে বর্তমান আধুনিক সভ্যতার ছত্রতলে বাস করা যায় না।

বিশুদ্ধ পানীয় জল বা নির্মল বাতাসের মত সুষম পুষ্টিকর খাদ্য লাভের ব্যাপারটিও যে সহজ প্রাপ্য ও সহজ সাধ্য নয় এবং এই সমস্যাটিও যে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু আজকে বাজার অর্থনীতির সমাজ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফল ও ফসলের সংগে উৎপাদকের কোন সম্পর্ক নেই সমস্ত উৎপাদনী ব্যবস্থাটাই পরিচালিত হচ্ছে পণ্য ও লাভালাভের মানদণ্ডে। সেজন্য খাদ্যবস্তু যারা প্রস্তুত করে সেই চাষী ও উৎপাদক শ্রেণীর একটি বড় অংশকে তাদেরই উৎপন্ন ফসলের ভোগের জন্য শেষ পর্যন্ত বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়, এবং যেহেতু এইসব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বছরের একটি সময়ে এদের হাতে যেহেতু কোন উপার্জনযোগ্য কাজই থাকে না সেজন্য এদের পক্ষে সকলেরই দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার মত খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করা দুরুহ হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সুষম

পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। সমস্যাটির সংগে সারা দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও পুনর্বহালের প্রশ্নটি গভীর ভাবে সম্পর্কিত। প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে যদি আমরা কেউ মনে করি বিশেষ ভাবে যে গ্রাম এলাকায় কোটি কোটি মানুষ বাস করছে তাদের আমরা সুষম পুষ্টিকর খাদ্যের আওতায় আনতে পারব তাহলে সেরকম ভাবনাটি হবে একেবারে অবাস্তব ও অর্থহীন। তবে সীমিত অবস্থায় আমরা অল্পমূল্যে তাদের সকলকে কিছু না কিছু শাক-সবজি ও ফলমূল বৃক্ষাদিরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। এখানে রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবীদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু এখানেও একই মৌল প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—প্রশ্নটি হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির গরজ আজ সর্বস্তরের। আমাদের দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যেভাবে ঘটছে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ন্যূনতম প্রয়োজন কোন রকমের বর্ধিত উৎপাদনেও সামাল দেওয়া যাবে না। সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলা প্রথম ও প্রধান কর্মসূচী হওয়া উচিৎ। এখানে ভাষা জাতপাত কোন কিছুরই বিচার চলবে না। সমগ্র দেশবাসী ও মানব সমাজকে নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে জনসংখ্যাকে একটি সীমিত সীমার মধ্যে রাখতেই হবে। এই ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই, এখানে কোন রাজনীতি চলে না। অথচ দুঃখ ও লজ্জার কথা আমার দেশে এমন একটি গুরুতর সমস্যা নিয়েও রাজনীতি চলে এবং প্রধানত রাজনীতির স্বার্থেই সমস্যাটিকে আমার দেশে আজও কার্যত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। শুনা যায় আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৫০ কোটিতে, তা যদি হয় তাহলে এই ১৫০ কোটি মানুষের কোন রকমে দুবেলা পেট ভরে ভাতের সংস্থান করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় তাদের সকলের জন্য সুষম পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি করতে পারব এমন কথা কি ভাবতে পারি? কাজেই সকলের জন্য সুষম পুষ্টিকর খাদ্য যেটি জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার পক্ষে তৃতীয় সর্ত তা আগামী ১০ বছরের মধ্যে কতটা বাস্তব ও ফলপ্রসূ হবে বিশেষ ভাবে

আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে এই আমাদের দেশে এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর। কিন্তু এটি একটি সম্পূর্ণ সতন্ত্র বিষয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার সবদিক বিষদ আলোচনা করার জন্য একটি সতন্ত্র পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হবে।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়; পৃথিবীর সর্বত্র ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক সংগঠিত প্রচেষ্টা চলেছে, নিঃসন্দেহে তা প্রয়োজনের তাগিদেই চলেছে। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ; মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষের জীবনযাত্রা ও বসবাসের মানও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের সংখ্যা না বাড়লেও হাট, বাজার, গঞ্জ ও শহরের সংখ্যা বাড়ছে, ছোট বড় নানা ধরণের রাস্তার প্রসার ঘটছে, ফলে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না, অনেকক্ষেত্রে হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই অল্প পরিমাণ জমিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির খাতিরে কৃষিজমিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধাদির ব্যবহার হচ্ছে। এ শুধু কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে নয় মৎস্য, হাঁস, মুরগী চাষ ও গো-পালনের ক্ষেত্রেও রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক সার মিশ্রিত উন্নতমানের খাদ্য ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার চলেছে। একই পদ্ধতিতে উন্নতমানের বীজ তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। এগুলি সবই আধুনিক কৃষি ও পশুবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি হিসাবেই আমরা লাভ করেছি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে একটি বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে এবং এই পরিবর্তন না এলে আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যা যে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়ে আমরা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। প্রশ্নটি হচ্ছে; এক—প্রয়োজনের অনুভূতি যেভাবে বাড়ছে আমরা কি তার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমোন্নতির পথে বরাবর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো? ইতিমধ্যেই তো এই ক্রমোন্নতির সীমা প্রায় প্রান্তঃসীমায় (Saturation point) পৌঁছে গেছে। যদি পৌঁছে গিয়ে

থাকে তাহলে প্রয়োজনের অনুভূতি এবং প্রকৃত উৎপন্ন ভোজ্য দ্রব্য এই দুটির মধ্যে তো একটি গভীর ফাঁক থেকেই যাচ্ছে এবং সেই ফাঁক ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে। ফলে, বাজারে প্রয়োজন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি অসম প্রতিযোগিতা দেখা দেবেই। বাজারে ক্রমঃবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব ঘটবে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই। দ্বিতীয় প্রশ্ন: এইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে আমরা যে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টায় ব্রতী হয়েছি তা কি শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করছে না সাংঘাতিক-ভাবে বিপন্ন করে তুলছে। অধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধাদির ব্যবহারের ফলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলেও এই সব বিষাক্ত সার ও ঔষধের ব্যবহারে কৃষি জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তিকে কি শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব করা হচ্ছে না। কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে সব কীটপতঙ্গ ও ভূমিজ পোকামাকড় প্রভৃতির প্রকৃতি-তত্ত্ব প্রয়োজন ছিল সেগুলিকে তো ক্রমশঃই সবংশে বিনষ্ট করা হচ্ছে। উচ্চফলনশীল ফসল বলে যে ধান, গম, শাকসবজি, মাছ, ডিম, মাংস প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা পুষ্টিকর খাদ্য বলে সুষম খাদ্য তালিকায় বিশেষভাবে চিহ্নিত করি খাদ্য হিসাবে সেগুলির গুণগত মান সত্যই তদনুরূপ কিনা এ-সম্পর্কে একদল খাদ্যবিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই গভীর সংশয় প্রকাশ করছেন, এমন কি এইসব খাদ্য সুস্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক নয় এমন সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন। তাছাড়া আছে খাদ্যে ভেজালের সমস্যা। ভেজাল তো বর্তমান বাজার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল ও নির্মল বাতাসের পর যেটি তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ সুষম পুষ্টিকর খাদ্য তা আমাদের মতো দরিদ্র অনগ্রসর দেশে সকলের জন্য সংগ্রহ করা বা সরবরাহ করা কতখানি সম্ভব এ প্রশ্ন তো আছেই, এমনি এইসব খাদ্যের সঠিক মান সম্পর্কেও সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। সারা পৃথিবীতেই সুষম পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সমস্যাটি ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিকে ঠেকানোর কোন উপায় নেই। সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

যদি কলুষিত বিষাক্ত হয়ে ওঠে, যদি সমুদ্র ও নদীর জল দূষিত হয়ে পড়ে ও বীজাণুতে ভরে যায়, পৃথিবীর সর্বত্র বনসম্পদ যদি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, কৃষিজমি তার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হারিয়ে ফেলে, জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর বিলোপ ঘটে, ভূগর্ভস্থ জল ও নানা বীজাণুতে ভরে যায় তাহলে আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলির মানের যে অবনতি ঘটবে তাতো একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুষম পুষ্টিকর খাদ্য মিলছে না বলেই দেশ-বিদেশের ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। অজস্র অর্থ ব্যয় করে সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি প্রভৃতি যাবতীয় প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রলুব্ধ করে পুষ্টিকর খাদ্যের নামে নানারকমের প্যাকেট খাবারে বাজারকে ভরিয়ে তুলছে। এই প্যাকেট খাবারের বাজার আসলে একটি নকল নিম্নমানের খাদ্য বাজার, ভেজাল খাদ্যের বাজার। যে সব দেশ উন্নত যেখানে জনসংখ্যা সীমিত তারা এই মেকি ও ভেজাল খাদ্যবস্তুর বাজারকে চালান দিচ্ছে আমাদের মতো অনগ্রসর দেশগুলিতে। ভিন্ন আকারের এটি আরেক ধরণের এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের শোষণ। এই শোষণের প্রথম শিকার হচ্ছে শহরের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারগুলি ক্রমে তা সংক্রামিত হচ্ছে গ্রামে, গঞ্জেও। বর্তমান বাজার অর্থনীতির যে ধারা ও প্রক্রিয়া চলছে তাতে তাজা সবজি, ফল, মাছ, দুধ পাবার সম্ভাবনা ক্রমশঃই সংকুচিত হয়ে আসছে। সাময়িক ভাবে কোনো বিশেষ এলাকায় রপ্তানী মারফৎ এই পরিস্থিতিকে সামাল দিবার চেষ্টা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সর্বব্যাপক হতে বাধ্য। সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ঘটনা (Phenomena) না হয়ে পারে না। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হলেও নানা জাতীয় খাদ্যসম্ভার সৃষ্টি হলেও খাদ্যবস্তুর অন্তর্নিহিত গুণগত মান কিছুতেই বজায় রাখা যাবে না তার প্রধান কারণ আজ সমগ্র বিশ্বপরিবেশ খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান রক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, মুনাফাভিত্তিক বাজার অর্থনীতি যেখানে মানুষের খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, বিবেচিত হয় বাজারের পণ্য

হিসাবে—কাজেই জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য যে মূল উপাদানগুলি একান্ত প্রয়োজন সেগুলিরই যদি চূড়ান্ত অভাব ও অবক্ষয় ঘটে থাকে তাহলে সেই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে আমরা কি সত্যই কোথাও জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার ভিতকে শক্ত করতে পারি, বিশ্বের সমস্ত মানুষ নীরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এ আশ্বাস দিতে পারি? আগামী দশ বছরের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই যে আহ্বান তাকে কি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব? অসম্ভব মনে হলেও এই সত্যকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারি না কেননা অসম্ভব এই স্বীকৃতির মধ্যেই মানুষ হিসাবে আমাদের এই দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অসুস্থ শরীর ও মন নিয়ে ভুগতে ভুগতে পৃথিবীর গোটা মনুষ্য সমাজের অবলুপ্তি ঘটবে এমন জিনিস আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারি না। মানুষ তো বিশ্বপ্রকৃতিরই সন্তান। প্রকৃতি কোনদিনই মানুষের প্রতি কৃপণা ও নিষ্করুণা ছিল না আজও নয়। তাহলে ঘাটতি ও বিচ্যুতিটি কোথায়? ঘাটতি ও বিচ্যুতি অবশ্যই ঘটেছে আর তা ঘটেছে মানুষের মধ্যে। আজ যদি গোটা মনুষ্য সমাজ কোনো বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে তাহলে সে বিপর্যয়কে ঠেকাবার দায়িত্ব এই মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আজ প্রয়োজন মানুষের মনোরাজ্যে একটি প্রচণ্ড আলোড়ন দ্বারা চলতি ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন। প্রয়োজন একটি নূতন জীবনবোধের, একটি নূতন সভ্যতার।

এই যে নূতন জীবনবোধ বা নূতন সভ্যতার প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছে এর প্রয়োজন কিন্তু কোন খাপছাড়া বিক্ষিপ্ত প্রয়োজন নয়। সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য যদি আমরা আশা করি সারা পৃথিবীব্যাপী একটি সুস্থ সবল সমাজব্যবস্থার কথা ভাবি তাহলে সেই প্রয়োজনের দাবীতেই এই প্রয়োজনের দাবী অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। আর এই প্রয়োজনটি কি সার্থকভাবে পূরণ করা মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব? বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে যা কিছু সৃষ্টি তাতো মানুষেরই সৃষ্টি; সমাজ, রাষ্ট্র, যন্ত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা

যা কিছু ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেও মানুষের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। আজকের অবস্থায় এগিয়ে নিয়ে এসেছে এ সবই তো এই মানুষই সৃষ্টি করেছে। কাজেই একদল মানুষের মূঢ়তায় যদি গোটা মানব-সমাজের অকল্যাণ দেখা যায়, বিপর্যয় ঘনীভূত হয়ে উঠে তাহলে সে মূঢ়তার অবসান ঘটাতে আরেকদল মানুষ এগিয়ে আসবেই। এই মানুষের সংখ্যা তো বিপুল আর প্রয়োজনটি যখন সার্বজনীন। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় মানব সভ্যতার মূল স্রোতধারা থেকে একটি বিচ্যুতি ঘটেছে। এখানে যে যন্ত্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনভোগের এমন কতকগুলি বিরাট সম্ভাবনার উৎস মুখ খুলে দিল যার প্রচণ্ড আকর্ষণে মানুষ জীবনভোগের উপরই মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিল। ফলে জীবনের প্রকৃত অর্থটি গেল সম্পূর্ণ গুলিয়ে। এই অর্থহীন জীবনভোগের খেসারত দিতে গিয়ে মানুষ আজ একটি নূতন ধরণের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। যন্ত্রশিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সমগ্র মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে না পেরে সে নিজেই যন্ত্রশিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দাসে পরিণত হচ্ছে। নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের সুষ্ঠু লেনদেনের জন্য যে বাজারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কালক্রমে সে নিজের সৃষ্ট বাজারের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাজার অর্থনীতির দাসে পরিণত হচ্ছে। বলা যায় উৎপাদক পরোক্ষভাবে নিজেই একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। আবার এও সত্য যে, এই যে বিচ্যুতি বা অশুভ পরিবর্তন ঘটেছে তারও পিছনে আছে মানুষের আর একটি দল, সংখ্যায় তারা যতই অল্প হোক না কেন। আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, আলো, সমুদ্র, পাহাড়, বন, জঙ্গল যেগুলির সহযোগিতা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এগুলি মানুষের জীবন ধারণের মৌল উপাদান। এগুলির কোনটাই কিন্তু মানুষের সৃষ্টি নয়। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় বলীয়ান হয়ে আমরা এই সত্যটিকেই বিস্মৃত হচ্ছি। যে বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের রক্ষার জন্য অকৃপণ হাতে জীবনধারণের এইসব মৌল উপাদান দান করছে এগুলি ধ্বংস করলে শেষপর্যন্ত নিজেদের ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে উঠে আমরা বৈজ্ঞানিক মনস্ক ও

যুক্তিবাদী হয়েও কেমন করে এই সহজ সত্যটিকে বিস্মৃত হচ্ছি তা ভাবতে অবাক লাগে। কাজেই আমাদের এই হারিয়ে যাওয়া চিন্তা ও চেতনার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হয়েছে। এখানে স্বভাবতই জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য এই বিষয়টি আমাদের সামনে না এসে পারে না। আমরা আমাদের জীবন বলতে কি বুঝি একটি সার্থক জীবনের অধিকারী হতে হলে মানুষের কি কি গুণ থাকা দরকার তা কি কোন বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। গোটা মানুষ সমাজের কাজে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে মানুষ হিসাবে আমরা কি ধরণের জীবন যাপন করতে চাই। আরও সোজাভাবে প্রশ্ন করা যায় আমরা আমাদের জীবনযাত্রার মান কোন নিরিখে বিচার করবো। তথাকথিত উচ্চমানের জীবনযাত্রার সঙ্গে যে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছে অথবা বিপরীত পক্ষে বলা যায় যে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির উপর আমরা আমাদের উচ্চমানের জীবনযাত্রার কাঠামো গড়ে তুলছি তাতে সকলের জন্য সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বিপরীতপক্ষে এই পথে অগ্রসর হলে সমগ্র মানব সমাজের ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে উঠবে। মানব সমাজের একটি অংশে বিলাসবহুল জীবনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে স্বাস্থ্য—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই সব দেশেই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে কাজ হচ্ছে। আমাদের দেশেও সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা-গুলির কর্মযোগ মিলিত হয়েছে এবং নানা কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার আয়োজন চলছে। সেই কর্মযোগের গতিকে শিথিল করা অথবা অনুসৃত কর্মসূচীগুলির গুরুত্বকে লঘু করে দেখানো এই লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় নয় জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার সংগ্রামের মূল অস্ত্র হচ্ছে স্বাস্থ্য সচেতনতার বা স্বাস্থ্যশিক্ষার। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজসংগঠনকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সেই বিষয়টি হচ্ছে সমাজ সচেতনতা অর্থাৎ কোন, সামাজিক বাতাবরণে তারা কাজ করছেন সে সম্পর্কে একটি সামগ্রিক

দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হওয়া কেননা যে সামাজিক বাতাবরণে তারা কাজ করছেন তার সীমাবদ্ধতাকে বুঝতে হবে—একটি নূতন সামাজিক বাতাবরণে গড়ে তোলার দায়-দায়িত্বের কথা আর এই সামাজিক বাতাবরণের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত হয়ে আছে দেশের ও পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমাজনীতি, রাজনীতি অর্থনীতি সব কিছুই। যেহেতু জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সুস্থ সমাজের সম্পর্কটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তাই নূতন সমাজবোধের গুরুত্বের প্রতি তাদের অবহিত না হলে চলে না। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ এগুলি আর কোন বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়; বিশ্বপরিমণ্ডলে যখন এই দূষণের প্রতিক্রিয়া কাজ করছে তখন জনস্বাস্থ্য ও সুস্থ সমাজভাবনার চৌহদ্দি আর কোন বিশেষ দেশ বা এলাকার মধ্যে সীমিত নেই, সব মিলিয়ে পরিবেশ ও পরিমণ্ডল দূষণের সমস্যাটি আজ বিশ্ব দূষণেই পরিণত হয়েছে। কাজেই সমস্যাটির চরিত্র বিশ্ববীক্ষার পরিমণ্ডলেই বুঝতে হবে এবং সমস্যাটির সমাধানে একটি সামগ্রিক যদি আকাশ, বাতাস, জল, আলো পৃথিবীর মাটি সব কিছু বিষিয়ে তোলা হয় তারপর সকলের জন্য স্বাস্থ্য চাই এই দাবী করার কি কোন অর্থ আছে? জীবনমানের দর্শন বাহুল্যময় বিলাসিতাপূর্ণ জীবন নয় শরীরকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের পরিমিত খাদ্যের প্রয়োজন। লজ্জা নিবারণ ও সভ্যভাবে চলা:ফেরা করার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন। একটি স্বাস্থ্যসম্মত আচ্ছাদনী ও বাসগৃহের প্রয়োজন। সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রয়োজন। এই সব প্রয়োজনগুলিকে যদি পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতো তাহলে প্রকৃতিরাজ্যে এই নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন হতো না। দৈহিক ভোগেই মানুষ আর পশু সমান অংশীদার, পার্থক্য: মানুষের চিন্তা ও অনুশীলনে, আত্মার উৎকর্ষ সাধনে। মানুষ যদি উন্নয়নের ভ্রান্ত ধারণায় পশুজীবনের সঙ্গে মানবজীবনের পার্থক্যটুকু ভুলে যায় তাহলে মানবসমাজের ভয়ংকর দুর্দিন না এসে পারে না।

আমরা আজ সেইরকম একটি দুর্দিনের সামনে এসে হাজির হয়েছি। কাজেই আমাদের হারানো জীবনধারণাকে ফিরে পেতে হবেই। সে জীবনের মূল কথা সরল জীবন উচ্চ চিন্তা গাড়ী নয় বাড়ী নয় বিলাসবৈভব নয় ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নয়। নিছক ব্যবহারিক অলংকার ছাড়া এগুলির যথার্থ্য কোন মূল্য নেই, আগামী একশো বছরের মধ্যে যখন পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখন কি আমরা এই প্রশ্ন করবো না সত্যই কি আমাদের এই ধরণের সর্বনাশা জীবনযাত্রার জন্য হিংসা প্রতিযোগিতার কি কোন প্রয়োজন আছে? কেন আমরা একটি নূতন বিকল্প জীবনের সন্ধান করবো না যা আমাদের সকলের জীবনের স্বাস্থ্য দেবে, স্থিতি দেবে, কল্যাণ আনবে। হিংস্র প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতা ও সহমর্মীতার ভিত্তিতে পৃথিবীব্যাপী একটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন গড়ে উঠবে।

এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই সকলের জন্য দৃষ্টিভঙ্গী (holistic approach) গ্রহণ করতে হবে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ সমগ্র মানব সমাজ একটি যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছে এবং এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ প্রতিটি মানুষকেই ভাবতে হবে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য কি হবে বল্গাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা না সংযম এই প্রশ্নের পরিকাঠামোর মধ্যেই আমাদের দেশের স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজসংগঠকদের কর্তব্য ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। সেইজন্যই বলা হচ্ছে বিশ্বস্বাস্থ্য একটি মহাজাগতিক সমস্যা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৌলবাদীদের জয় হোক, মোল্লাতন্ত্র জিন্দাবাদ

'জাতের নামে বজ্জাতি'

—প্রায় ৬০ বছর আগে লেখা কবি নজরুলের কবিতার একটি লাইন, তখন আমরা ইংরেজের অধীন। জাতীয় মুক্তির জন্য গণচেতনার উন্মেখ ও গণ আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। নজরুলের এই ধরণের কবিতা বাঙালি যুব মানসে বিরাট উন্মাদনা-আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ধরণের কবিতার ভাষাই ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের দীক্ষা মন্ত্র সারা দেশের নবীন বুদ্ধিজীবী মহলের মনে পড়েছিল এর সম্মোহন প্রভাব। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, জাতীয় অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন এ-সবের মধ্যেই ছিল একটা পারস্পরিক যোগসূত্র। আন্দোলনগুলির ধ্যান ধারণা ছিল প্রায় অভিন্ন। দেশের অগণিত সাধারণ হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর ও সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষ—আমাদের সেদিনের পরাধীনতা ও অধঃপতনের মূলে যে সব কারণ আছে তার মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের দেশের একদল হিন্দু সমাজপতি ও মুসলমান মৌলবী এই পিছিয়ে পড়া সমাজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইতো দেশ স্বাধীন হবার সংগে সংগে শোষণের অন্যান্য পুরানো যন্ত্রগুলির সংগে এই শোষণ যন্ত্রটিকেও ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তা নাহলে দেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তি ও প্রগতি আসবে না—এই ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে কারো কোন প্রতিবাদ ছিল না। দেশের সবচেয়ে দরিদ্র নিরক্ষর মানুষটিও ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার মিলিত যে শোষণ তা যে রাজনৈতিক শোষণের সমতুল্য তা তারা বুঝতো। আমাদের সংবিধানে যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে জাতিধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকারগুলি

সুরক্ষিত হবে বলে বলা হয়েছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো স্পষ্ট। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার দীর্ঘ আটত্রিশ বছর পরে এক মুসলিম মহিলা শাহবানু—তার বিবাহ বিচ্ছেদ ও খোরপোষের মামলায় এই মুসলিম মহিলাটির স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার পক্ষে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তা নিয়ে সারা দেশে আজ দেখছি এই ভয়ানক বিতর্ক উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটা লক্ষ্য করে আমাদের অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে তাহলে কি আমাদের সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে শোষণমুক্তির সকলের জন্য ন্যায় বিচারের কোন সম্পর্ক ছিল না? আমাদের সংবিধান দেশের সমস্ত মানুষের জন্য যে মৌলিক অধিকার দিয়েছে তা কি কেবল কথার কথা?

আরও অবাক লাগে এবং চিন্তার রাজ্যে একটা সাংঘাতিক রকমের তাল গোল পাকিয়ে যায়—যখন ভাবি আমাদের নতুন যৌবনদীপ্ত, অত্যুৎসাহী প্রগতিশীল প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী—যিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বোত্তম ফলটিকেও সুদূর গ্রামের দরিদ্রতম মানুষটির কাছে পৌঁছে দিয়ে আগামী একবিংশতি শতাব্দীর দ্বারদেশে এক নতুন সমৃদ্ধতর দেশকে উপস্থিত করতে চান বলে দেশের মানুষকে সেইভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, তিনিই এই বিতর্ক উত্তাপে ইন্ধন যোগাতে উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছেন? ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ভারতের মুসলমান নারী সমাজকে এক চরম হীনমন্যতার অভিশাপ থেকে কিছুটা মুক্ত করার জন্য যে রায় দিয়েছে সেই রায়কে সম্পূর্ণ অকেজো করার জন্য "মুসলিম মহিলা বিল" এই নামে একটি বিল আনার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন। দেশকে উন্নত প্রগতিশীল করে গড়ে তোলা আর ধর্মান্ধতাকে ধর্মের নামে সমাজপতি ও মোল্লাদের শাসন ও শোষণ, বৃহৎ জনসমষ্টির অংশ হিসাবে, দেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে মুসলমান মহিলাদেরও যে সমান অধিকার তার স্বীকৃতি না দেওয়া —দেশ গঠনের এই দুটি চিন্তাধারা যে পরস্পর বিরোধী, এর একটিকে স্বীকার করে নিলে অন্যটির কোন সার্থকতা থাকে না—এই কথাটি কি আমাদের প্রগতিবাদী প্রধান মন্ত্রী বোঝেন না? যদি

বোঝেন, তবে তার চিন্তার স্ববিরোধিতার উৎসটা কোথায় ? আমাদের আশঙ্কা আমাদের রাজনীতিকরা ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা হারানোর যে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও একই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন ; তাই নিজেকে প্রগতিবাদী বলে জাহির করার পরও প্রগতির মূলেই কুঠারঘাত করতে চলেছেন।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অতি সাধারণ ছাত্ররাও জানে যে পুঁজিবাদের পরবর্তী অবস্থা সাম্রাজ্যবাদ হলেও পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্র পরবর্তী যুগে প্রগতিশীল ভূমিকাই গ্রহণ করে। আজকে পশ্চিমে পুঁজিবাদী দেশগুলিকে যে সমৃদ্ধ আকারে আমাদের সামনে দেখছি তা সম্ভব হয়েছে এই জন্যই।

পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদরূপে আমাদের দেশে দেখা দিল তখন এখানে তার কোন প্রগতিশীল ভূমিকার আত্ম প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, অন্ধ সংস্কারে ভরা জাতপাতের বিচারে জরাজীর্ণ, পুরানো সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিন্তা ও ধারণাগুলিকে বজায় রেখে এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়েই তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণে অগ্রসর হয়েছিল। তাদের এই কাজে সাহায্য করেছিল একদিকে দেশের রাজারাজড়া সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর দল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল আমলা ও পুঁজিবাদী স্বার্থপুষ্ট বেনিয়া ; সেই সংগে আমাদের দেশের একদল গোঁড়া হিন্দু সমাজের সনাতনী ধর্মের সমর্থক ইসলামের মৌল ধ্বজাধারী মৌলবীর দল ; ধর্মের সার বস্তু থেকে আলাদা করে কতগুলি মনগড়া অনুশাসনকেই তারা আসল ধর্ম বলে নিজ-নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই এইসব প্রগতিবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে এসেছে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে আমরা তো দেশের সেই অচলায়তন সমাজ ব্যবস্থাটাকেই ভাঙতে চাই, নতুন এক প্রগতিশীল সমাজ গড়তে চাই। আমাদের ভারতীয় সংবিধানকে এই নতুন সমাজ গড়ার প্রধান শক্তি হিসাবেই ভাবা হয়েছে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ? এখানে প্রত্যেক ভারতবাসীর ধর্মের অনুসরণ করার সুযোগ আছে, কিন্তু

ধর্মান্ধতাকে কিংবা ধর্মের নামে কোন ভারতীয়ের—সে হিন্দু-মুসলমান বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের পুরুষ কিংবা মহিলা হোক না কেন—কারো উপর কোন অগণতান্ত্রিক বা অমানবিক আচরণ বা অবিচার করার অধিকার নেই। সংবিধান প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে কতগুলি মৌলিক অধিকার দিয়েছে। কোন বিশেষ অধিকারের অজুহাতে কিংবা এমন কি বিশেষ ধর্মের অনুশাসনের দোহাই দিয়ে সেগুলিকে খর্ব করা যাবে না। এটা শুধুমাত্র আমাদের সংবিধানের কথাই নয়—যেকোন সভ্যতার কথা, মনুষ্যত্বের কথা। প্রত্যেকটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমরা যদি প্রতিটি মুসলিম মহিলাকেও ভারতীয় নাগরিক মনে করি এবং প্রতিটি মুসলিম মহিলারও নিজস্ব সত্বা আছে এটা যদি অস্বীকার না করি তাহলে মুসলিম মহিলাদের পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তা যে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংবিধান সম্মত এবং চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সম্পর্কে সংশয়ের কোন কারণ নেই—এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলার কারো কোন অবকাশ নেই। ধর্মের নামে এই দেশে ভারতীয় নারী সমাজের উপর যে অবিচার চলছিল, বলা যায় এটা একটা সাংঘাতিক রকমের জাতীয় অপরাধ। এই জাতীয় অপরাধের প্রতি যদি সুপ্রিম কোর্ট আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে তাহলে এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুপ্রীমকোর্টের সেই সব বিচারপতির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও দেশের প্রগতির স্বার্থে যতটুকু সাহস দেখাতে পারেন আমাদের উপরতলার রাজনীতিবিদ্ নেতারা ততটা সাহসী হতে পারেন না।

মুখে আমরা গণতন্ত্র প্রভৃতি নানা গালভরা কথা বলব অথচ পুরানো অবিচায় ও শোষণ ভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে তার গায়ে আঁচড় দেব না এটাতো আর হয় না। শোষণ অবিচারের মানসিকতা পাল্টাতে পারলেই তবে দেশকে শোষণ, অবিচারমুক্ত করা যাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুরোপুরি সদ্‌ব্যবহার কিছুতেই হ'তে পারে না। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি শোষক ও

শোষিতের সম্পর্কটাকে প্রকৃতির নিয়ম বলেই চালাবার চেষ্টা করে। নারী সম্প্রদায়কে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু নয় বলে দাবী করে, এটা তো নিছক কট্টর মৌলবাদ বা মোল্লাতন্ত্র। যারা এই শাহবানু মামলার রায়ে সুপ্রীমকোর্টের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তির প্রচার চালাচ্ছেন তারা তো মোল্লাতন্ত্রকেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সমর্থন করছেন। একশেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করবে, পুরুষ মহিলাদের খুশীমত ব্যবহার করবে, মুসলমান পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে—ইচ্ছামত 'তালাক'ও দিতে পারবে, অসহায় মুসলমান মহিলার কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে না—এরকম কোন অনুশাসন শরিয়তে থাকতে পারে বলে মনে করা যায় না। যদি থাকে, তাহলে ভারতে সে শরিয়তের কোন স্থান থাকা সম্ভব নয়। এ জিনিস তো জঙ্গলের রাজত্বেই চলে। ইসলাম কি সেই ধরণের জঙ্গলের রাজত্ব সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে! ইসলাম ধর্মের অতিবড় শত্রুরাও ইসলাম সম্পর্কে এরকম কোন চিন্তা করতে পারে না। কিছু সংখ্যক মৌলবী যদি ইসলামের নামে এধরণের ধর্মীয় অনুশাসন খাড়া করে থাকে তাহলে সেটা ইসলামিতন্ত্র নয় নিছক মোল্লাতন্ত্র। এই মোল্লাতন্ত্র শুধু মুসলমান মহিলাদের ক্ষতি করছে তাই নয়, মুসলমান সমাজের ক্ষতি করছে; ইসলাম ধর্মকে হেয় করছে এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষকে দুর্বল, বিপন্ন করে তুলছে।

তাহলে বিষয়টি যখন এত সহজ ও স্পষ্ট তা জেনেও আমাদের রাষ্ট্র নেতারা এই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে এত দ্বিধা করছেন কেন? দুর্বলতার সত্যিকার সূত্রটা কোথায়? সূত্রটা হচ্ছে—সাদা মাটা কথায় ভোট। আমাদের দেশে সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের নেতারা ভাবেন যে সংখ্যা লঘু মুসলমান সম্প্রদায় হচ্ছে ভোটে জেতার তুরুপের তাস। সংখ্যা লঘু মুসলমানরাও অনেকটা তাই ভাবেন। ভোট পাওয়া ও ভোট দেওয়াই যখন গণতন্ত্রের একমাত্র কথা হয়ে দাঁড়ায় তখন ভোটের নেশাটাই গোটা জাতিকে পেয়ে বসে। আমাদের কোন কোন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ভাষ্যকার এক ধরণের যুক্তি

উপস্থিত করছেন—তা হচ্ছে, আমাদের শাসক রাজনৈতিক দল কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে ; প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয় এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন না। শ্রীরাজীব গান্ধী শাহবানু মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায় বেরুনোর পর যখন কট্টর মৌলবীদের পক্ষ থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে তখন শোনা যায় তিনি তার দলভুক্ত মুসলমান এম. পি-দের সংগে এবং মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে এমন কিছু সংগঠনের নেতাদের সংগে আলোচনা করেছেন তারা নাকি অনেকেই এই রায় শরিয়ত বিরোধী এবং মুসলমান সমাজের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর—এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ অংশের অভিমতকে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে কি করে অস্বীকার করতে পারেন ? অতএব এইসব মুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোষ করার জন্য যদি মুসলিম মহিলা বিলটি আনার জন্য রাজীব গান্ধী উদ্‌যোগী হয়েছেন—কাজটি অত্যন্ত গণতন্ত্র সম্মত। অতএব এই কাজে কোন বিরোধিতা আনা উচিত নয়—অকাট্য যুক্তি, গণতন্ত্রে এ ক অপূর্ব ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষের মুসলমান জন সমষ্টির যদি সংখ্যা তথ্য বিচার করা যায় তাহলে তো দেখা যাবে এই সম্প্রদায়ের মুসলমান নারীর সংখ্যা তো অর্দ্ধেকের চাইতেও বেশি। যে প্রসঙ্গ নিয়ে এত বিতর্ক ও উত্তাপ—তারতো কেন্দ্রই হচ্ছে মুসলমান নারী সমাজ। সংসদীয় নির্বাচনে যদি একজন মুসলমান পুরুষের সংগে একজন মহিলার সমানাধিকার থাকে বা শক্তিমূল্য একই হয়, তাহলে মুসলিম বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও খোরপোষ সম্পর্কে মহিলাদের কি অভিমত তা কি জানার কোন প্রয়োজন নেই ? আমরা যখন পঞ্চায়েতের সভ্য হতে চাইব বা এম. এল. এ বা এম. পি. হতে চাইব, মন্ত্রীগিরি করার প্রয়োজন হবে তখন এই সব মহিলাদের ভোটের উপর নির্ভর করব, আমাদের জয় পরাজয় তাদের ভোটেই নির্ধারণ করবে। আর তাদের নিজস্ব অধিকার গণতান্ত্রিক মানবিক যা সমস্ত সভ্য সমাজে স্বীকৃত তা আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করব ? ধর্মের নামে ভুল তথ্য

দিয়ে সমস্ত রকমের বিভ্রান্তিকর যুক্তি খাড়া করে সেটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব—এতো শুধু মুসলিম নারীজাতির প্রতি শোষণ ও অবিচার নয়, মনুষ্য সভ্যতার প্রতি এ এক জঘন্যতম মনোভাব। এই মনোভাব গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে, দেশের অগ্রগতির পথে চরম অন্তরায় সৃষ্টি করছে? প্রসঙ্গত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করতে চাই তাতেই এ ব্যাপারে মুসলমান মহিলাদের অভিমতটা কি তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

প্রায় পাঁচমাস আগের ঘটনা, তার কিছুদিন আগেই শাহবানু মামলার রায়টি বেরিয়েছে। সংবাদপত্রে নানাভাবে নানাদিক থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে। তখন আমি অসুস্থ, নিজের ঘরেই আছি। দুজন আবদ্ধ মহিলা আমাকে দেখতে এলেন বয়স ৩০-৪০ এর মধ্যে। পোষাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হল নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের। এসেই একজন প্রশ্ন করল—কাকু আপনি কি রকম আছেন? আমার এখানে তখন সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ট্রেনিং চলছিল। মনে করলুম এরা সেই প্রশিক্ষার্থী কর্মীদের মধ্য থেকেই হবে। তখন বেলা বারটা, খাবার সময়। এমন সময় আমার শারীরিক অসুস্থতার খবর জানতে এসেছে বিরক্ত হলাম; একটু ঝাঁকিয়ে উঠেই বললুম—খবর নেবার আর সময় পেলেন না? কিছু মতলব আছে বুঝি। যাও, এখন সরে পড়। বিকালে এসো। তখন মেয়েটি কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে উত্তরে বলল—কাকু বিকালে কখন আসব, চঁদপুর থেকে আসছি, এখনি ফিরে যাব।' 'চঁদপুর থেকে'—বলে বিছানায় উঠে বসলুম। 'কেন কে তোমরা?' 'কি জন্য এসেছো?' 'চঁদপুরের নৌশের' মিস্ত্রির মেয়ে। বললুম—'ও'। নৌশের মিস্ত্রি মারা গেছে অনেক আগেই। চঁদপুর এখান থেকে আড়াই মাইল দূরের একটি গ্রাম। দুটো টুল দেখিয়ে তাদের বসতে বললুম। এক সময়ে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে তো বটেই এই নৌশের মিস্ত্রির ঘরেই আমি দুচার বার গেছি। চা মুড়িও খেয়েছি। মেয়েগুলি সম্ভবতঃ সে সময় খুবই ছোট শিশু। তাদের কথায় বুঝলুম তারা আমার সম্পর্কে

অনেক কথাই শুনেছে। এখন তারা তুবোনই বিবাহিতা, ছেলে মেয়ে আছে। বাপের বাড়ী এসেছে, আনন্দ নিকেতন একটি দেখবার জায়গা —দেখতে এসেছে। আমি অসুস্থ শুনে আমার খবর নেবার জন্যই এসেছে' অনেক কথার পর কি মনে হল কিছুক্ষণ আগে খবরের কাগজ পড়েছি, শাহবানু মামলার সম্পর্কে সেদিনের কাগজে অনেক কথাই ছিল। কথার ফাঁকে হঠাৎ বড় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—এই তোমাদের মুসলমান মেয়েদের সম্পর্কে আজকাল অনেক কথাই লিখেছে, তোমরা কিছু খবর রাখো? 'ও কাকু, তুমি তো ঐ দিল্লীর হাইকোর্টের মামলার কথা বলছো। ঠিক হয়েছে, নাকে ঝামা ঘসে দিয়েছে, মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।' 'ও মেয়ে, তোমরা এসব কি বলছো, তোমাদের মৌলবী মৌলনারা 'তো ক্ষেপে আগুন হ'য়ে গেছে, বলছেন—এতে নাকি মুসলমান ধর্মে আঘাত দেওয়া হচ্ছে।' 'যত সব ধান্দাবাজ, এসব বুঝরুকি আর চলবে না।' কথাটার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বললুম—'যাক, দরকার নেই এখানে কয়েকজন মুসলমান শিক্ষক থাকেন—এসব কথা আবার তাদের কাণে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—'আজকের দিনে অতটা ভয় কিসের, ভিতরে ভিতরে আমাদের মত বয়সী সব মুসলমান মেয়েরাই এই রায়ে খুশী। সরকার তো এ্যাতো ব্যাপারে ভোট নেয়—এই ব্যাপারেও ভোট নিক্ না, দেখা যাবে পাল্লাটা কোন দিকে ভারী।' মেয়েটির কথা শুনে তো আমি অবাক। ভাবলুম সমাজের অভ্যন্তরে এই অচলায়তন সমাজ ব্যবস্থাটাকে ভাঙবার জন্য যে শক্তি সংগ্রহ করছে তাকে স্বাগত জানানোর মত শক্তি ও সাহস আমাদের কোথায়। মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্মবোধকে অস্বীকার করে প্রগতি বিরোধী ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি —পরোক্ষে মোল্লাতন্ত্রেরই জয়গান করে চলেছি। শাহবানু মামলায় সুপ্রীমকোর্টের রায়কে অকেজো করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম মহিলা বিল নামে যে আইনটি পাশ করানোর আয়োজন চলছে এই প্রয়াসের মধ্যে তার জ্বলন্ত নজীর স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানব সংহতির জন্য চাই জাতীয় সংহতি

৮ই মার্চ কম্পাসে প্রকাশিত শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'জাতীয় সংহতি না মানব সংহতি'? শীর্ষক একটি লেখার প্রতি সম্ভবতঃ কম্পাসের পাঠকবর্গের অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিষয়টির ওপর অনুরূপ লেখা পান্নাবাবুর হাত দিয়ে এর আগেও কম্পাস কাগজে ও আরও তু' একটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং ইদানীং কালে জাতীয় সংহতির ওপর বিভিন্ন আলোচনায় তিনি বিষয়টির ওপর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে চলেছেন। আমাদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা আচারে ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায়, চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন। পান্নাবাবু নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত গতানুগতিক চিন্তাকে আঁকড়ে থেকে চলতে তিনি অভ্যস্ত নন, নূতনত্বের পথে নিত্যই তাঁর পরিক্রমা। বয়স বাড়লেও তাঁর এই পরিক্রমার শেষ নেই। একজন প্রখ্যাত সমাজসেবী হিসেবে বর্তমানে পান্নাবাবু সমধিক পরিচিত। অবশ্যই তিনি একজন নামকরা সমাজসেবী, তবে তাঁর সমগ্র জীবনধারা একটু খতিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমাজসেবী ভূমিকার চেয়ে পান্নাবাবুর সমাজচিন্তাবিদ্ বা সমাজদার্শনিকের ভূমিকাটাই প্রধান। একজন বাস্তবধর্মী সমাজকর্মী ও একজন সমাজদার্শনিকের ভূমিকার পার্থক্যটা আমাদের বোঝা দরকার। চিন্তাবিদ্ বা দার্শনিকের আবেদন কোন গোষ্ঠী, স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যা সর্বাত্মক সফল হওয়া সম্ভব নয় বা যা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ অথচ সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখেই আমাদের বর্তমানে যাবতীয় কর্তব্যগুলিকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়—সমাজচিন্তা বা সমাজদর্শন আমাদের সামনে সেই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে

নিয়ে ও তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকে যদি আমরা আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলিকে বুঝি ও সমাধানের চেষ্টা করি তাহলে সমস্যার জটিলতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে আমাদের কাজগুলি করা অনেক সহজ হয়, আমাদের অগ্রগতির বাধাগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়। সমাজ-জীবনে এই চিন্তা বা দর্শনের একটা বিশেষ স্থান থাকবেই। কিন্তু সেজন্য বাস্তবধর্মী কর্মনীতির ও কর্মকৌশলের প্রয়োজন থাকবে না, বৃহত্তর চিন্তা ও দর্শনের অজুহাতে বর্তমান সমস্যা ও আমাদের সম্ভাব্য কর্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়া—এটাও কোন কাজের কথা নয়। জাতীয় সংহতি না মানব সংহতি?—এই লেখাটায় শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের সামনে যে চিন্তা-ভাবনাটা তুলে ধরতে চেয়েছেন তার বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদন অবশ্যই আছে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু নিছক ঐ তত্ত্বকে আঁকড়ে থেকে আমাদের দেশ ও সমাজজীবনে যে বাধাগুলি দেখা দিচ্ছে সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য যুগ ও পরিবেশ অনুযায়ী কোন বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না এটা কোন সমাজ দার্শনিকের তত্ত্ব হতে পারে, কিন্তু ঐ তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই এই তত্ত্বের বাইরেও আমাদের কিছু কর্তব্য থেকেই যায়।

'জাতীয় সংহতি না মানব সংহতি? পান্নাবাবু যদিও এই লেখায় তাঁর চিন্তাটিকে একটি প্রশ্নের আকারে উপস্থিত করেছেন তা হলেও এই লেখায় তিনি কি বলতে চান এবং তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তটা কি—তা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। তাঁর মতে—আজ আমাদের দেশে জাতীয় সংহতি রক্ষা ও এই সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য যে চেষ্টা ও আন্দোলন চলছে এটা আজকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অবান্তর। অবান্তর দুটি কারণে; প্রথমতঃ জাতীয়তাবোধ একটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা সর্বজনীন মানবিক চেতনার পরিপন্থী। এই জাতীয়তাবোধ থেকেই উপজাতীয় স্বার্থের চিন্তা-ভাবনা, আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছেদের প্রবণতা জন্মলাভ করে। মানুষ যে এক ও অখণ্ড এই এই শাশ্বত

মানবিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। পান্নাবাবু তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, মার্কস, লেনিন প্রভৃতি মহাপুরুষ ব্যক্তি ও চিন্তানায়কদের আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, প্রাচীন মুনিঋষিদের কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে ··' এই মহাবাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলছেন, এই আহ্বান বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে যে মানুষ স্থান-কাল বা অন্য কিছুর দ্বারা খণ্ডিত নয়। 'জাতীয় সংহতি নয়—চাই মানব সংহতি'—এই কথাটা যদি আমরা আজও বলতে সাহস না পাই তবে তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভালো।' জাতীয় সংহতি যে অবান্তর তার সমর্থনে পান্নাবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে পর্বতের প্রাচীর, সমুদ্রের ব্যবধান, আজ কোন কিছুই কোন দেশের জাতীয় সত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখছে না। শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বলে অধিকতর শক্তিমান ও সমৃদ্ধতর দেশগুলি তাদের আগ্রাসী মনোভাব ও চোখ ঝলসানো সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির দাপটে অনগ্রসর ও দুর্বলতর দেশগুলির ভৌগোলিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। জাতীয় ভাবধারা ও জাতীয় সংস্কৃতি বলে কোন কিছুতেই আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অবস্থা যদি তাই হয় অর্থাৎ যে জিনিস থাকছে না এবং ভবিষ্যতে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই, তাকে ধরে রাখা ও তার সংহতি রক্ষার সার্থকতা কোথায়? আর তার প্রয়োজনটাই বা কিসে? পান্নাবাবুর মতে আজকের দিনে যাবতীয় 'Practical target' মানব সংহতি; 'পৃথিবীর মানুষ এক হও'। কিন্তু 'যেখানে মানুষ ক্রমশ নিজেদের গণ্ডী সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে সে বিশ্ব-মানবকে আপন জন বলে গ্রহণ করবে কি করে'?' অপরের হয়ে প্রশ্ন তুলেই তিনি তার উত্তর এইভাবে দিয়েছেন 'মানব সংহতি ব্যাপারটা ভৌগোলিক নয়, রাজনৈতিক সীমানার ব্যাপারও নয়, অসীম বা infinite যেমন সীমার পরিবর্ধন দিয়ে বোঝা যায় না, সীমার মাপ দিয়ে যেমন অসীমের বেড় পাওয়া যায় না তেমনি ভূগোল দিয়ে মানব সংহতিকে পাওয়া যায় না। তার মানদণ্ড বা yard-stick অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই

আছে—তা হল মানবিকতা। এই মানবিকতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ হল প্রেম, ভালবাসা·· ইত্যাদি সহজাত গুণ।" এই যে মানবিকতা তার সঠিক ও কার্যকরী প্রয়োগ বিধিটা কি—এই প্রশ্নের একটা সরল উত্তর দেবারও চেষ্টা করেছেন পান্নাবাবু এই বলে—'আমাদের জীবনে একান্ত আপনজনের মধ্যে যে প্রেম ভালবাসা, সহানুভূতিবোধ, আত্মত্যাগ ও স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ ও সর্বোপরি একাত্মবোধের পরিচয় ও ব্যবহারিক প্রত্যয় দিয়ে বিশ্ব মানব সংহতিকে গ্রহণ করার উপায় হল সেগুলিরই বিস্তার বা extension।" পান্নাবাবুর মতে এই বিস্তার বা extension-টা হলে জাতি, উপজাতি আর কোন প্রশ্ন থাকে না, মানুষে মানুষে ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সমস্যা, নারী পুরুষের সমস্যা এমনকি পারিবারিক ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা মকদ্দমা—কোন কিছুরই ঝামেলা থাকে না। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং যেগুলি জটিলতর হয়ে উঠছে সেগুলির সুষ্ঠু সমাধান কি এত সহজে সম্ভব ?

এ নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে কত জ্ঞানীগুণীজন, কত মহাপুরুষ এই ধরণের কথা বলেছেন—বহু চেষ্টাও হয়েছে। মানুষ basically এক হয়েও তাদের মধ্যে কেন এত ভেদাভেদ। পৃথিবীর মানুষ এক হও--এই শ্লোগানতো আমরা আজই নূতন শুনছি না। কাজেই, মানুষের সংহতির প্রশ্নটিকে যেভাবে পান্নাবাবু বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার সমাধানের যে পথ বাতলাচ্ছেন মনে হচ্ছে সমস্যাটার সমাধান তত সহজ নয়। সমাধানটাকে বড় বেশী সরলীকরণ করা হয়েছে।

জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রশ্নেই মানব সংহতি রক্ষার প্রয়োজনটিকে উত্থাপন করা হয়েছে, জাতীয় সংহতি আজ নানা দিক থেকে বিপন্ন। স্বাধীনতার সূচনাতেই ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা আজ আমাদের দেশে সর্বত্র দেখা দিচ্ছে এবং এই অবস্থার সঠিক মোকাবিলা করা না হলে দেশ আরও অনেক খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে। তাহলে দেশ সবদিক থেকে দুর্বল

হবে, এমন কি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারাবার আশঙ্কাও অনেকে করেন। এই পরিস্থিতিতেই জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রয়োজন আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন স্বার্থ ও অনুভূতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করেও কোন বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে দেশের সমস্ত মানুষ কিভাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলতে পারে, দেশকে উন্নত ও বড় করতে পারে এই পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় সংহতি রক্ষার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে এবং সারা দেশ ব্যাপী একটা আন্দোলনও চলছে। কিন্তু বিষয়টি এমন জটিল যে, সব মানুষ এই ব্যাপারে একটা ঐক্য মতে (National Consensus) আসতে পারছে না; সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন পথ এখনও নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তবুও নীতিগতভাবে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনটাকে কেউই অস্বীকার করছে না আর করছে না বলেই জাতীয় ঐক্য একেবারে ভেঙ্গে পড়বে না শেষ পর্যন্ত একটা বাস্তব সমাধানে (Practical solution) পাওয়া যাবে বলেই সর্বস্তরে কমবেশী এই বিশ্বাস আছে। আশঙ্কা ও বিশ্বাস এই রকম একটা বিপরীতমুখী দোটানা পরিস্থিতির মধ্যে দেশ চলেছে এবং যখন প্রত্যেকটি দেশপ্রেমী মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বাসের পাল্লাটিকে ভারী করা, জাতীয় সংহতির কার্যক্রমকে দৃঢ় ও প্রসারিত করা, তখনই আমরা শুনছি 'একথা আজ দৃঢ় ভাবে, নির্ভীক চিত্তে, উদাত্ত স্বরে বলতে হবে কেবল আঞ্চলিকতাবাদই ইতিহাসের আবর্জনা নয়, এমন কি জাতীয়তা-বাদও আজ অবান্তর ও irrelevant, জাতীয় সংহতি নয়, চাই মানব সংহতি।" যদি কেউ মানব সংহতি চান তাতে কারও আপত্তি হবে না। যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই তা চাইবেন। আর এ চাওয়ার দাবীতো কোন নূতন ঘটনা নয়, হাজার হাজার বছর ধরে বহু মনীষী এই জিনিস চেয়ে এসেছেন। Human brotherhood, Universal fraternity, বিশ্ব মানবতাবোধ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই',—ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা এই মূলনীতির উপরইতো প্রতিষ্ঠিত। সব ধর্মের মূল কথাও তাই। কাজেই, মানব

সংহতি আর এই সংহতিকে গড়ে তোলার মূল উপাদান হিসেবে যে মানবিক গুণগুলির কথা হয়েছে—তার মধ্যে তো নূতনত্ব কিছু নেই। তবুও সমস্যাসঙ্কুল জটিল মুহূর্তে যদি এই অতি প্রাচীন চিন্তাধারাটাও আবার নূতন করে জোরের সঙ্গে তুলে ধরার দরকার হয় আর সেটা যদি কেউ করে থাকেন তাহলে তা প্রতিবাদের বিষয় নয়, বরঞ্চ অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু বিশ্ব-সংহতির প্রয়োজনীয়তাটা তুলে ধরতে গিয়ে যদি জাতীয় সংহতির বিষয়টিকে ইতিহাসের ডাস্টবিনের বস্তু, অবান্তর, irrelevant বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে এই আহ্বানে কতজন সাড়া দেবে জানিনা। পরিস্থিতির জটিলতা দেখে প্রগতি ও শান্তির পথে নিত্যনূতন বাধার সম্মুখীন হয়ে আমরা অনেকেই ধৈর্য রাখতে পারছি না, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। এবং তার ফলেই সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতার শিকার হচ্ছি। পুরানো সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চাই এই কাজে আমরা শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে স্বাগত জানিয়েছি। ভাবী-কালের নূতন সমাজটা গড়ে ওঠার পূর্বে নানা ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে একটা দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশের এই পর্যায়ে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। নীতি ও প্রয়োগের মধ্যে বহুক্ষেত্রে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিবর্তিত অবস্থায় পুরানো দৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শকে পদে পদে দ্বন্দ্বের (challange) সম্মুখীন হতে হবে। পর্যায়টা কতদিন চলবে তা এখনই সঠিক করে বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যে দূরত্ব অতিক্রম করতে গেলে অনেকগুলি দৌড়ের প্রয়োজন; এক দৌড়ে সেই দূরত্বটা পৌঁছে যাব এটা ভাবা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? একটি মানুষের ক্ষুদ্র জীবন ইতিহাসের মধ্যেই যদি এই পৃথিবী সম্পর্কে তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসটা খুঁজতে চাই তা' নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতীয় সংহতির সঙ্গে মানব সংহতির কোন বিরোধ নেই; পরস্পর পরিপূরক। বলা যায়, মানব সংহতি গড়ে তোলার পথে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা এক অনিবার্য কার্যক্রম। জাতীয় সংহতির শক্ত বনিয়াদটার

ওপরেই মানব সংহতি গড়ে তোলা যায়। নীতি, তত্ত্ব বা আদর্শের প্রতিবেদনে কিংবা নির্ভীক ভাবে উদাত্ত সুরে আহ্বান করার মধ্যে মানব সংহতি গড়ে তোলার প্রশ্নটি সীমাবদ্ধ নয়। তা যদি হ'ত তাহলে তো এর বহু আগেই আমাদের দেশে বহু জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মানবতাবাদ বা মানবিকতা নিয়ে বিশদ আলোচনা আমার এই লেখার বিষয়বস্তু নয় আর এ বিষয়ে আলোচনার যোগ্য অধিকারীও আমি নই। কিন্তু মানব সংহতির প্রসঙ্গে (context) জাতীয় সংহতি রক্ষার চিন্তাটি অবান্তর তা যে নয়ই বরঞ্চ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই সত্যটাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। জাতীয় সংহতির অর্থ জাতীয়তাবোধের সংহতি—একটি দেশের সমস্ত মানুষের বহু ধরণের বিভিন্নতা থাকা সত্বেও এক হয়ে থাকা ও চলার মানসিকতা এই ধরণের মনোভাবের সংহতি এই মানসিকতাই তো পৃথিবীর মানুষ এক হও—এই চিন্তাকে একটা প্রকৃত রূপ দিতে পারে। যদি কোন দিন মানব সংহতি প্রকৃতই গড়ে ওঠে তবে জাতীয় সংহতিই হবে তার ভিত্তি শুধু তাই নয়, তাকে আরও শক্তিশালী করার প্রকৃত রক্ষা কবচ হবে। গোলমালটা বেঁধেছে জাতীয়তা সম্পর্কে ধ্যান ধারণা নিয়ে। আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতাকে যদি আমরা জাতীয় বোধ বা জাতীয়তার সঙ্গে এক করে ফেলি তাহলে এই গোলমালটা বাঁধতে বাধ্য। আমাদের জাতীয় সংহতির জন্য আন্দোলনের মুল দুর্বলতা হচ্ছে আমরা আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধকে পূর্ণ বিকাশের জন্য কোন উপযুক্ত ক্ষেত্র বা আবহাওয়া বা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারিনি : এখানে সত্যিকারের কোন বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধই গড়ে ওঠেনি। গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তার উর্ধ্বে যে বিশ্ব মানবতাবোধের জয়গান গেয়েছেন তাঁদের চিন্তাধারা জাতীয়তার চিন্তার মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে বলা হচ্ছে সে জাতীয়তা হচ্ছে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা, জাত্যাভিমান ও জাত্যান্তরিতা—জাতীয়বোধ বলতে যা বোঝায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি এই দেশের মানুষের উন্নতি ও সংহতির জন্য গান্ধীজির কোন বিশেষ কিছু ভাবনা

বা কিছু করার না থাকত, তাহলে তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের সবচেয়ে বড় অংশটুকু এই দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ব্যয় করলেন কেন? নিজে শহীদ হলেন কেন? রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল সঙ্কীর্ণ Nationalism-এর বিরুদ্ধে! ইংরাজী Nationalism এবং আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয়তা, জাতীয় কল্যাণবোধ ঠিক সমার্থবোধক নয়। আমাদের জাতীয়তাবোধের আবেদন আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী সমস্ত মানুষের কল্যাণবোধের চিন্তার দ্বারাই বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল Nationalism-এর বিরুদ্ধে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে; জাত্যাভিমানিতার বিরুদ্ধে। এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বা জাত্যাভিমানিতার উপর ভিত্তি করেই জার্মানী ও ইটালিতে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা মানব সভ্যতার পথে বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মনকেও এই প্রবণতা আবিষ্ট করতে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী ছিল—এই উগ্রজাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে, মানবতাবোধের ঝোঁকের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে যদি জাতীয় চিন্তা ও ভাবনার কোন স্থান না থাকে তাহলে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্কটময় মুহূর্তে বারে বারে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে কেন? জাতীয় আন্দোলনের অসম্পূর্ণতার দিকগুলিকে ঘা মারার জন্য বার বার তাঁর লেখা শাণিত হয়ে উঠেছে কেন? রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বকবি বলে সমাদৃত হয়েছেন তা তো তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষা সভ্যতার একজন প্রতিভূ বলেই। মার্কসবাদ তত্ত্বগত ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক মতবাদ হ'লেও লেনিনতো বিশ্ব-বিপ্লবের চিন্তায় রুশদেশের জনসাধারণকে নিরস্ত রাখেননি। বিশ্ব বিপ্লবের প্রস্তুতি চালিয়ে যাও এবং যতদিন বিশ্ববিপ্লব সফল না হচ্ছে ততদিন কোন একটি দেশে জাতীয় বিপ্লব সফল করে তোলা অর্থহীন বলে চুপ করে বসে থাকেন নি। বিগত মহাযুদ্ধে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশদেশের মানুষ মরিয়া হ'য়ে লড়াই করেছিল—তা তো এই জাতীয়তা-বোধের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই। পরবর্তীকালে যে সব দেশে যতটুকু পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে দেখা যায় তা এই জাতীয় শক্তির ভিত্তিতেই।

কাজেই, জাতীয় চিন্তা-ভাবনাকে বাদ দিয়ে নয়, জাতীয় চিন্তা-ভাবনাকে আরও বিক'শত করে সব দেশের জাতীয় সংহতিকে সংহত করতে হয়। আমাদের দেশে ক‌েকগুলি কারণে এই জাতীয় কর্তব্যটুকু অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তাই আমরা সমস্ত বিভিন্নতাকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে এক হ'য়ে কিভাবে চলা যায় তার মানসিকতা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারিনি। তারই ফল এই আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা। কাজেই, যে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠা উচিত সেই জাতীয়তাবোধকে একেবারে অবান্তর ও অর্থহীন, একেবারে নস্যাৎ করা এতো গাছের মূল কেটে পাতায় জল ঢালার চিন্তা। বিগত কয়েক বছর ধরে পান্নাবাবুতো নিজেই অসংখ্য সভা-সমিতিতে, তাঁর বহু লেখার মধ্যে প্রাক্-স্বাধীনতাযুগের স্বদেশী ভাবনা, স্বদেশী আচার-আচরণ, স্বদেশী জীবন দর্শনের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন। এই স্বদেশী চিন্তাতো জাতীয়তা-বোধ থেকে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তাহলে জাতীয় সংহতির বিষয়টিকে তাঁর পক্ষে অবান্তর বলার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে ? আসলে পান্নাবাবুর মত মানুষেরা একটা সাংঘাতিক রকমের স্ববিরোধিতায় ভুগছেন। তাঁদের চিন্তা রাজ্যেই একটা ঘোরতর অস্থিরতা চলছে। সম্ভবতঃ তারই ফসল হচ্ছে এই লেখা—'জাতীয় সংহতি না মানব সংহতি'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঁশের চরকায় সমাজ বিপ্লব

মানুষের সভ্যতার মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে মানুষ নিজেই। মানুষের প্রয়োজনে এবং মানুষের চেষ্টার ফলেই এই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আবার এই সভ্যতার গতি ধারা নির্ধারিত হয় যে প্রেরণার দ্বারা, তার উৎস হচ্ছে মানুষের জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনকে সম্পূর্ণ হারিয়ে অথবা তাকে বিকৃত করে যদি সমাজ উন্নয়নের কোন চেষ্টা হয় তাতে মানুষের সভ্যতার বিকাশ ধারাটি বিঘ্নিত হয় এবং সেই সভ্যতা মানব-সমাজে অনেক অকল্যাণের কারণ হয়ে ওঠে ; শেষ পর্যন্ত সেই সভ্যতার বিনাশ ঘটে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা একটি অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে নিঃসন্দেহে একটি নতুন যুগের বার্তা বহন করে এনেছে ; এবং সেজন্যই পৃথিবীর মানুষ এই নূতন যুগকে স্বাগত জানিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা আজও চলছে। কিন্তু এই নূতন যুগ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে সত্যই কতখানি সমৃদ্ধ করে তুলছে, এই ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে সমগ্র মানব সমাজ কোন উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে কিনা অথবা এই সভ্যতার ধারায় একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে কিনা—এ প্রশ্ন ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের বহু মনীষী ও সমাজচিন্তাবিদ্ মানুষেরাই উত্থাপন করছেন ; তাঁদের কেউ কেউ এই সভ্যতার গতিমোড় ফেরানোর জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করছেন। এইসব মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। তিনি আধুনিক সভ্যতার সঙ্কটের স্বরূপটি যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক বিশ্বসভ্যতাতো আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতারই আরেকটি নাম বা রূপান্তর মাত্র। তা যদি হয় তাহলে এই সভ্যতার জন্ম, বিকাশ ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্র শিল্পের বিকাশ ও প্রসারকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ

তাহলে কি এই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ও প্রসারের বিরোধী ছিলেন ?

প্রশ্নটি শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য ইদানীং কালে প্রায় সমস্ত মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কেই। মহাত্মা গান্ধী বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের বিরোধী ছিলেন এরূপ একটি ধারণা আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে বহুল প্রচলিত আছে ; যদিও ধারণাটি আদৌ সত্য নয়। এঁদের সকলেরই আপত্তি ও প্রতিবাদের বিষয় ছিল— বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের বিপুল সম্ভাবনাকে হাতিয়ার করে যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা জন্মলাভ করেছে এবং যা কালক্রমে অতিক্রত বিশ্ব সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে তা সমগ্র মানবসমাজের কাছে কোন কল্যাণের বাণী বহন করে আনছে কিনা। এই সভ্যতা মানবসমাজের অগ্রগতির পথে কি ঘোরতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ? তাঁদের আপত্তি ও প্রতিবাদ হচ্ছে মূলত এই সভ্যতার স্বরূপ বা চারিত্রিক প্রতিফলন—এই বিষয়টি নিয়ে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ও প্রসারের বিরোধিতা করা তাঁদের কারও উদ্দেশ্য নয়, আর তা তাঁরা করেনওনি। তাঁদের এই বিরোধিতা আদৌ নেতিবাচক ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবলম্বন ক'রে, কিন্তু এই সভ্যতা শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতে যন্ত্রসভ্যতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। আজ আমরা যে বিশ্বসভ্যতার পরিমণ্ডলে বাস করছি আসলে এটিকে আর মানবসভ্যতা ব'লে আখ্যাত করা যায় না। সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে এই সভ্যতা মূলত যন্ত্রসভ্যতায় পরিণত হয়েছে। পার্থক্যটিকে আমরা সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলেছি—বর্তমান সভ্যতার সংকট এখানেই। যেহেতু একটি অনগ্রসর অচলায়তন সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর মানুষের বুকে বহু যুগ ধরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সেই বাধাটিকে সরিয়ে একটি উচ্চমানের জীবনধারার গতিপথের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে অমনি পৃথিবীর সব দেশের মানুষই, কালের ব্যবধানে কিছুটা আকারগত ব্যতিক্রম ঘটলেও বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত উন্মুক্ত ময়দানে আছাড় খেয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে বহু যুগের আকাঙ্ক্ষিত একটি উচ্চমানের জীবনযাত্রা লাভের কামনায়; এই কামনার প্রকাশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমগ্র জীবনধারায়। আজ যদি কোথাও বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে এই জীবনধারার আদর্শেরই। মানুষের সংগ্রাম জীবনের মানকে উন্নত করার জন্যই। অর্থ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা এগুলি মানুষের জীবনমানের কোন যথার্থ পরিচয় নয়। এগুলিকে আঁকড়ে ধরে মানুষের যে জীবনদর্শন গড়ে ওঠে আসলে সেটি কোন জীবনদর্শনই নয়। আজকের সমস্যা মানুষ তার জীবনদর্শনকে হারিয়ে উন্মাদের মত তার জীবনকে নিরংকুশভাবে ভোগ করার দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটেছে। এই দৌড়ের প্রতিযোগিতা আত্মকেন্দ্রিক ও অসম হ'তে বাধ্য। ফলে সুস্থির, সুস্বাস্থ্য এবং সকলের জন্য আনন্দময় যে সমাজব্যবস্থার কল্পনা আমরা করি তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই ধরনের সমাজব্যবস্থা বাস্তবে কোনদিন ষোল আনা রূপ নেবে কিনা তা এক্ষুনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলা না গেলেও আমরা কি সেইদিকে অগ্রসর হ'তে চাইব না? নিশ্চয়ই চাইব, আর তা চাইব বলেই আমাদের মধ্যে কোন কোন সমাজসেবক, সমাজবিদ্ এই কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রকাশ সর্বত্র অভিন্ন নাও হ'তে পারে। কিন্তু এই প্রয়াস ও উদ্‌যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হওয়ারও প্রয়োজন আছে; কেননা, এই ব্যাপারেও একটি বিপথগামীতার বিপদ আছে। সুষ্ঠু সমাজগঠনের ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নেবেন তাঁদেরও চিন্তা ও কাজে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার প্রয়োজন হবে। আধুনিক ভোগবাদভিত্তিক যে সমাজদর্শন এবং যে সমাজদর্শনের ভিত্তিতে সারা পৃথিবীতে গড়ে উঠছে যে অশুভ আগ্রাসী ও নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তার সংশোধন ও পরিবর্তন করার জন্য নিশ্চয়ই একটি দৃঢ় প্রয়াস ও উদ্‌যোগ গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আধুনিক সভ্যতার অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্প ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার প্রসার এগুলির কোন প্রয়োজন নেই মনে করা অথবা উন্নতমানের জীবন গড়ে তোলার

পথে এগুলি সম্পূর্ণ অবান্তর ও অর্থহীন ভাবা। কিন্তু উন্নতমানের জীবনের সঙ্গে উন্নতমানের জীবনযাত্রার বিষয়টিকে এক করে গুলিয়ে ফেলা চলে না। আজ সমাজজীবনের সর্বস্তরে উচ্চমানের সুযোগ ও অধিকার লাভের জন্য যে হিংস্র ও সীমাহীন প্রতিযোগিতা এই প্রতি-যোগিতারই স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটছে মানুষের সভ্যতার সংকটের মধ্য দিয়ে। এই সংকটকে অন্যভাবে বলা যায়—মানুষের জীবন-দর্শনেরই সংকট। এই সংকটের উৎস হচ্ছে উচ্চমানের জীবনধারণ সম্পর্কে একটি অমানবিক ধ্যান-ধারণা। সমগ্র মানবসমাজের কাছে আজ এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ।

এই বিশ্বপ্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে গ্রাম-স্বরাজ, স্বনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা, বাজার অর্থনীতির অবসান, ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতির বিলোপ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের মত অনুন্নত দেশেই নয়, উন্নতমানের জীবনের অধিকারী যে সব দেশ সেইসব দেশেও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে নূতন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। সর্বত্রই আজ এই প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় আকারে দেখা দিয়েছে যে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের যথেষ্ট ব্যবহার ও বল্গাহীন প্রসারের মধ্য দিয়ে আমরা যে সমৃদ্ধশালী সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য সেই রকম সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা কি সম্ভব? যদি সম্ভবও হয়, তাহলেও সেই সমাজব্যবস্থা কি মানুষের পক্ষে সত্যিই কল্যাণকর? সমৃদ্ধি আর কল্যাণ এই দুটি জিনিস এক নয়। সমৃদ্ধি মানুষের জীবনে পূর্ণতা আনে না, সমৃদ্ধিতে মানুষের মনুষ্যত্বের যে বিকাশ ঘটে এটি এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের বহির্জীবনের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্য তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্পদকেই বিনষ্ট করে। সেই জন্যই মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সংযমের বিষয়টিকে কোনক্রমেই লঘু করে দেখা হয়নি। এই সংযমের প্রয়োজন মানুষের আচারে ব্যবহারে, চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে। মানুষ উচ্চমানের জীবনের আকর্ষণে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে চাইছে। ফলে সমাজে

নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে গিয়ে আর একটি বিপরীতধর্মী চিন্তার গোঁড়ামির শিকার হয়ে আমরা কি পিছন দিকে হাঁটতে থাকবো? এই পশ্চাৎগামিতা তো আমাদের শুধু আরও অধিকতর অনগ্রসর সমাজব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেবে তাই নয়, হাজার হাজার বছর আগে যে সমাজব্যবস্থা আমরা ফেলে এসেছি সেই আদিম সমাজব্যবস্থাতেই তো আমরা ফিরে যাবো। মানুষের ইতিহাস, মানুষের প্রকৃতি এই পশ্চাৎগামিতার পথে ফিরে যাওয়ার ধারণায় সায় দিতে পারে না। প্রসঙ্গটি এভাবে উত্থাপন করা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'তে পারে। কিন্তু বিষয়টির উপর বিশদ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই বিষয়টি এখানে এই ভাবেই তুলে ধরা হচ্ছে।

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে কোন কোন সমাজ-চিন্তাবিদ্ ও সমাজসংগঠক আছেন যাঁরা মনে করেন, আমাদের দেশে যত রকমের শোষণ, অবিচার ও দুর্নীতি চলছে তা থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত হ'তে হলে আমাদের গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে হবে, বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করতে হবে, এমনকি পণ্য আমদানী ও রপ্তানী বাজারকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। প্রকৃতির সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার চলবে না, প্রকৃতির নিয়মেই যতটুকু সম্পদ সৃষ্টি হয় ও উৎপন্ন হয় তার মধ্যেই মানুষের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'বে ; বাহুল্যময় জীবনের মোহ ত্যাগ করে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মধ্যেই প্রয়োজন মেটানো—এই সরল জীবন ধারায় আমাদের ফিরে যেতে হবে। তাঁদের ধারণা সমাজ বিবর্তনে তাঁদের এই চিন্তা নূতন সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে একটি মৌলিক চিন্তা এবং আগামী দিনের মানুষের সমাজকে এই ধারণার পরিকাঠামোর মধ্যে বিবর্তিত হতে হবে।

যদি ধরে নেওয়া যায় এটি একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা। কারণ এই ভাবনাটি বিশেষ মানুষের চিন্তায় স্বতঃসিদ্ধ, তাহলে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু সমস্যাটি এতই সরল নয় যার

মীমাংসা, সরলীকরণ এ ভাবে সম্ভব! যে বাস্তব অবস্থায় আমরা আজ অবস্থান করছি তা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আজ পর্যন্ত যেভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে তা কোন একদিনের আকস্মিক ঘটনা নয়; বহু যুগের বহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে মানুষ এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। চলার পথে কোন বিভ্রান্তি বা বিচ্যুতি যে ঘটেনি তা নয়। একদল মানুষের স্বেচ্ছাচারী ও হঠকারী কৃতকার্যে মানুষের সমাজজীবনের গতি-ধারা বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে—ইতিহাসেই তার পরিচয় মেলে। একদল মানুষ স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়, অন্যদল প্রগতির সমর্থক; সংখ্যায় তারতম্য ঘটলেও এই দুই দলের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম মানুষের সমাজে আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদিম অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ সভ্য সমাজে পদার্পণ করেছে, এ সংগ্রামের কোন ছেদ নেই; সেজন্য মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের গতি ধারারও কোন থামা নেই। আজ সভ্যতার যে সঙ্কট তার মূলে আছে যে বিভ্রান্তি তা হচ্ছে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশ ও প্রসার ঘটছে যে অনুপাতে মানুষের মননশীলতা ও হৃদয়ের বিকাশ ও প্রসার ততটা ঘটছে না। দ্বন্দ্ব এখানেই। এই দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু নিরাকরণ হচ্ছে না বলেই মানুষের জীবনে আজ এত বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের কারণ এই নয় যে সম্পদের অভাব বা মানুষের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতার অভাব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিল্পভিত্তিক যে বহুমুখী ও বিশাল সম্পদের সৃষ্টি তা তো মানুষেরই সৃষ্টি; আগামী দিনে এই সৃষ্টির সম্ভাবনা আরও অনেক বিপুল ও বিশাল হবে এবং তার নিয়ামক শক্তি তো মানুষই। এই সৃষ্টি ও সম্ভাবনাকে লঙ্ঘন করেই তো আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও আধুনিক সভ্যতা। কাজেই মানুষের স্বার্থে ও প্রয়োজনে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ, যন্ত্র শিল্পের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নয়ন, মানুষের অতীত দিনের অনগ্রসর জীবন ধারার পরিবর্তন এই পরিস্থিতির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যার মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে একদল মানুষ আর

একদল মানুষের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে। বিপদের কথা, এই ধরনের একটি অশুভ মানসিকতা আমাদের মধ্যে কোন কোন চিন্তাবিদ্ সমাজসংগঠকের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সেইজন্য প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

আমাদের দেশে বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার হচ্ছে না; জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ আজও বেকার। কর্মশক্তির অভাবে নয়, সুযোগের অভাবই হচ্ছে এই বেকারত্বের মূল কারণ। আবার গ্রাম এলাকাতেই এই বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক। কাজেই কিভাবে সারা দেশে, বিশেষ ভাবে গ্রামীণ মানুষের বেকারী দূর করা যায় এটি নিঃসন্দেহে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় সমস্যা। এটি সমস্যা সমাধানের সঙ্গে শুধু দারিদ্র্য নয়—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন প্রভৃতি অগ্রগণ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সমস্যাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত একথা সকলেরই জানা। এই সমস্যা সমাধানে বহু রকমের গ্রামউন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে--সরকারী ও বেসরকারী স্তরে। চিন্তাশীল সমাজ সংগঠকদের কারো কারো ধারণা শুধু ধারণাই নয় দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রামের ভয়াবহ বেকারত্ব দূরীকরণে গান্ধীজী যে চরকার প্রবর্তন করেছিলেন সেই চরকাকে গ্রামের সমস্ত বেকার ও অভাবী মানুষের ঘরে ঘরে যদি পৌঁছে দেওয়া হয় এবং চরকায় সুতা কাটার কাজে যদি এই সমস্ত মানুষেরা তাদের অব্যবহৃত শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করে, তাহলে এই কর্মসূচীর জন্য রাষ্ট্র বা সরকারের বা বেসরকারী সংস্থার আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশের একটি বিরাট অংশের মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে এবং এইভাবে গ্রামে একটি স্বনির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি রচিত হতে পারে। চরকা প্রবর্তন করে গ্রাম এলাকায় সমস্ত অব্যবহৃত শ্রম-শক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকলেও চরকা প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি গ্রামীণ পরিবারে দারিদ্র্য দূরীকরণ হবে এবং এইভাবে একটি গ্রামকে স্বনির্ভর করা যাবে এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই আসা যায় না। যাঁরা এই অভিমত ও কর্মসূচীর

প্রবর্তক তারা এই সংগে চরকা প্রবর্তনের সমর্থনে আরও দু একটি যুক্তি তাদের সিদ্ধান্তের অনুষঙ্গ হিসাবে উপস্থিত করতে চাইছেন। চরকার নির্মাণশৈলী হবে—আদি অকৃত্রিম বাঁশের তৈরী। এখানে কলকব্জার কোন বালাই নেই। এই চরকা গ্রামবাসীরা নিজেদের চেষ্টাতেই তৈরী করে নিতে পারে এবং এর জন্য ব্যয় হবে মাত্র আট দশ টাকা। একটি পরিবারে সমস্ত পুরুষ ও মহিলা এমনকি কিশোর কিশোরীরা তাদের অব্যবহৃত সময় যদি এই চরকায় সুতা কাটার কাজে ব্যবহার করে তাহলে তাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় প্রস্তুত সুতার বিনিময়ে তাদের সকলের গ্রাসাচ্ছাদন অর্থাৎ মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়, আর তা যদি হয় তাহলে বেঁচে থাকার যে মূল সমস্যা দুটি – খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যা, এই সমস্যা দুটির নিরাকরণ হচ্ছে তাদের নিজেদের চেষ্টাতেই এবং অতি নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে। এছাড়া চরকায় সুতো কাটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা আসে, আত্ম-সংযমের একটি মানসিক বাতাবরণ তৈরী হয় অর্থাৎ চরকা শুধু কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য অপনোদনের অস্ত্র নয়, মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক যে স্বনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা তা গড়ে তোলার একটি বলিষ্ঠভিত্তি। সেজন্য এই ধ্যান ধারণার সমর্থক চিন্তাবিদ সমাজ সংগঠকেরা চরকাকে মাত্র একটি স্বল্পবিনিয়োগ কর্মসংস্থানের উপাদান হিসাবে দেখেন না, দেখেন সমাজ বিপ্লবের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে। তাঁরা মূলত সমাজবিপ্লবী। সেজন্য চরকায় সুতো কাটা বিষয়টিকেও তাদের বিপ্লবী ধ্যান ধারণায় অনুরণিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে চান। সংক্ষেপে তাদের অভিমত হচ্ছে, চরকার এই সমগ্র ব্যাপারটি হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের কর্মকাণ্ড। এই প্রসঙ্গে তাঁরা গান্ধীজীকে তাদের এই ধ্যান ধারণা ও কর্মের পথিকৃৎ বলে দাবি করেন। গান্ধীজী কোন সময় কোন্ পরিস্থিতিতে কি অর্থে গ্রামে গ্রামে চরকার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই একই ধ্যান ধারণা ও কর্ম-সূচীকে যোলআনা আঁকড়ে থাকার মধ্যে গান্ধীবাদী বলে দাবী করা

যায় কিন্তু তাতে গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। তাছাড়া সেদিনের গান্ধীজীর চরকাভিত্তিক কর্মসূচী গ্রামউন্নয়নে ও বেকারী দূরীকরণে যে ছিল সঠিক পথ সেই পথের কোন বিকল্প ছিল না, দেশের সব মানুষ তা মেনে নেয়নি। আর চরকার যে মানবিক দর্শন তা নিয়ে সেদিন আমাদের দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই ছিল গুরুতর মতভেদ ও গভীর দ্বন্দ্ব। সমস্ত রকমের সংস্কার ও সমাজ সচেতন চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের যথেচ্ছ ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা ও নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের অবদানকে তিনি কোনক্রমে অস্বীকার করেননি। সে সময় গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চরকা প্রবর্তনের সার্থকতা নিয়ে যে বিতর্ক ছিল দুই বিরাট মনীষীর সমাজচিন্তার বিপরীতধর্মী দৃষ্টির দুটি দিক—সমাজ বিবর্তনের ধ্যান ধারণায় পার্থক্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আবেগ ও বিশ্বাসের অংশটুকু বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বিতর্কের অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ ও মননশীল। কিন্তু সে বিতর্কের ঘটনাতো প্রায় সত্তর বছর আগের প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের কথা। আজকের পৃথিবী এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশ কি আজও সেই যুগের পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে? যদি না থাকে তাহলে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকেই আমাদের বিদ্যে-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়েই গ্রামের বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য মোচনে চরকা তত্ত্বের বিষয়টিকে বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথমেই আমাদের ধারণাটিকে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে, গ্রামে গ্রামে চরকা প্রবর্তন করার পেছনে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কী—নিছক গ্রামের অব্যবহৃত শ্রমের ব্যবহার না বেকারত্ব মোচন, না দূরীকরণ? যদি প্রথমটি উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রতিবাদ করার কিছু নেই। কিন্তু কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা যখন এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে তখন তার মূল উদ্দেশ্যই হবে গ্রামীন দারিদ্র্য দূর

করা, গ্রামের অনগ্রসর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালী করা। চরকা প্রবর্তনের কর্মসূচী যদি হয় একটি নিছক বাঁশের চরকা প্রবর্তনের কর্মসূচী, এই কর্মসূচীকে আজকের দিনে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, স্বনির্ভর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তাতো অনেক দূরের কথা। এই কর্মসূচীর ধ্যান ধারণা যে অবৈজ্ঞানিক শুধু তা নয়, সমস্ত রকমের বাস্তবতা বর্জিত ও অর্থহীন। গ্রামের মানুষ দারিদ্র্য এবং নানা ভাবেই অনগ্রসর ও শোষিত ঠিকই; কিন্তু তাদের এটুকু অভিজ্ঞতা ও বাস্তববুদ্ধি আছে যে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যখন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার ধ্যান ধারণায় একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে তখন গ্রামে বাস করে এবং দরিদ্র বলেই আমাদের দেশের মানুষ বহু পশ্চাতে কোন অতীত যুগে বাস করবে—এভাবে ভাবা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি তারা সত্যিই চিন্তা ভাবনায় সেই পর্যায়ে পড়ে থাকে তাহলে প্রতিটি সমাজকর্মী ও সমাজসেবীর প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে তাদের সেই পর্যায় থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুষ্ঠু ও স্বাচ্ছন্দ্য-ময় জীবনের বলয়ের মধ্যে এনে দাঁড় করানো। ভোগবাদের বিকল্প নয় অনগ্রসরতা। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যে অনগ্রসর ও দরিদ্র এটি কোন জাতীয় গৌরবের ঘটনা নয়, এটি আমাদের জাতীয় অপরাধ ও লজ্জার কথা। স্বনির্ভরতার অজুহাতে এই সব মানুষের অনগ্রসরতাকে কোন অবস্থাতেই স্থায়ী করে রাখার কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে পারি না। অনগ্রসরতা স্বনির্ভরতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমাজের এক বিরাটসংখ্যক মানুষ বেকারী ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, কাজেই বিত্তবানরা, জমি ও শিল্প কারখানার মালিকরা তাদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এদের শ্রম শক্তিকে লুণ্ঠন করে আরও অপরিমিত মুনাফা করবে—এই সূত্র ধরেই তো পৃথিবীতে যে অসামাজিক অমানবিক জীবন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে—তাকেই তো আমরা বলছি ভোগবাদী জীবনদর্শন। কাজেই গ্রাম উন্নয়ন চিন্তার কর্মকাণ্ডে অনগ্রসর

জীবন যাপনের চিন্তা ও কর্মসূচীর কোন স্থান নেই। দারিদ্র্যকে বণ্টন করা নয়, দারিদ্র্য অপনোদনই হচ্ছে গ্রাম উন্নয়নের মূল লক্ষ্য; কাজেই দেশে একটি বিপুল সংখ্যক মানুষের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগান যাচ্ছে না, অতএব যে কোন কর্মকাণ্ডে সেই শ্রমশক্তিকে ব্যবহারের ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব ও ক্ষতিকর ধারণা। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চরকা প্রবর্তনেব কর্মসূচীটির উপযোগিতা ও তার সার্থকতাকে বিচার করে দেখতে হবে।

শুধু তত্ত্বগত দিক থেকেই নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেই চরকা প্রবর্তনের দাবী ও যুক্তি কত দুর্বল ও অবাস্তব তা সহজেই বুঝা যায়। গ্রামের একটি বিরাট অংশ মানুষ বেকার ও দরিদ্র, অন্য কোন ভাবে তাদের সকলের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, কেন না সরকারী ব্যবস্থা অপ্রতুল, পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো দুর্বল, অনুমোদিত কর্মসূচীগুলি ব্যয় বহুল। বাজার ও লেনদেনের সমস্যা এবং আরও অনেক রকমের অসুবিধা রয়েছে। এই কর্মসূচীর প্রবর্তনকারীরা গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাইরের প্রযুক্তি প্রয়োগেরও ঘোরতর বিরোধী। এই বিরোধিতার কারণ হচ্ছে এক, প্রযুক্তি প্রয়োগ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, গ্রামের বেকার ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। সরকারী বা বেসরকারী চেষ্টায় এই দায়িত্ব বহনের চেষ্টা হলেও সকলের জন্য এই দায়িত্ব বহন করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। দুই—আধুনিক প্রযুক্তিকে বোঝা ও গ্রহণ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। চরকা এমন একটি যন্ত্র যে যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য কোন আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করার আবশ্যক করে না। তিন—বাঁশের চরকার সংগে আধুনিক যন্ত্রের ও সেই সংগে আধুনিক শিল্প উৎপাদনের ধ্যান ধারণা একবার গ্রামের মানুষের মনে প্রবেশ করলে তখন আর চরকার বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করা যাবে না; কালক্রমে গ্রামের মানুষও যন্ত্রশিল্পের অঙ্গীভূত হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য জীবনও আধুনিক শহরে জীবনের চিন্তার প্রভাবে কলুষিত হয়ে উঠবে। তখন আমরা গ্রামে যে, সুস্থ

করা, গ্রামের অনগ্রসর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালী করা। চরকা প্রবর্তনের কর্মসূচী যদি হয় একটি নিছক বাঁশের চরকা প্রবর্তনের কর্মসূচী, এই কর্মসূচীকে আজকের দিনে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, স্বনির্ভর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তাতো অনেক দূরের কথা। এই কর্মসূচীর ধ্যান ধারণা যে অবৈজ্ঞানিক শুধু তা নয়, সমস্ত রকমের বাস্তবতা বর্জিত ও অর্থহীন। গ্রামের মানুষ দারিদ্র্য এবং নানা ভাবেই অনগ্রসর ও শোষিত ঠিকই; কিন্তু তাদের এটুকু অভিজ্ঞতা ও বাস্তববুদ্ধি আছে যে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যখন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার ধ্যান ধারণায় একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে তখন গ্রামে বাস করে এবং দরিদ্র বলেই আমাদের দেশের মানুষ বহু পশ্চাতে কোন অতীত যুগে বাস করবে—এভাবে ভাবা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি তারা সত্যিই চিন্তা ভাবনায় সেই পর্যায়ে পড়ে থাকে তাহলে প্রতিটি সমাজকর্মী ও সমাজসেবীর প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে তাদের সেই পর্যায় থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুষ্ঠু ও স্বাচ্ছন্দ্য-ময় জীবনের বলয়ের মধ্যে এনে দাঁড় করানো। ভোগবাদের বিকল্প নয় অনগ্রসরতা। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যে অনগ্রসর ও দরিদ্র এটি কোন জাতীয় গৌরবের ঘটনা নয়, এটি আমাদের জাতীয় অপরাধ ও লজ্জার কথা। স্বনির্ভরতার অজুহাতে এই সব মানুষের অনগ্রসরতাকে কোন অবস্থাতেই স্থায়ী করে রাখার কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে পারি না। অনগ্রসরতা স্বনির্ভরতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমাজের এক বিরাটসংখ্যক মানুষ বেকারী ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, কাজেই বিত্তবানরা, জমি ও শিল্প কারখানার মালিকরা তাদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এদের শ্রম শক্তিকে লুণ্ঠন করে আরও অপরিমিত মুনাফা করবে—এই সূত্র ধরেই তো পৃথিবীতে যে অসামাজিক অমানবিক জীবন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে—তাকেই তো আমরা বলছি ভোগবাদী জীববদর্শন। কাজেই গ্রাম উন্নয়ন চিন্তার কর্মকাণ্ডে অনগ্রসর

জীবন যাপনের চিন্তা ও কর্মসূচীর কোন স্থান নেই। দারিদ্র্যকে বণ্টন করা নয়, দারিদ্র্য অপনোদনই হচ্ছে গ্রাম উন্নয়নের মূল লক্ষ্য; কাজেই দেশে একটি বিপুল সংখ্যক মানুষের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগান যাচ্ছে না, অতএব যে কোন কর্মকাণ্ডে সেই শ্রমশক্তিকে ব্যবহারের ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব ও ক্ষতিকর ধারণা। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চরকা প্রবর্তনের কর্মসূচীটির উপযোগিতা ও তার সার্থকতাকে বিচার করে দেখতে হবে।

শুধু তত্ত্বগত দিক থেকেই নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেই চরকা প্রবর্তনের দাবী ও যুক্তি কত দুর্বল ও অবাস্তব তা সহজেই বুঝা যায়। গ্রামের একটি বিরাট অংশ মানুষ বেকার ও দরিদ্র, অন্য কোন ভাবে তাদের সকলের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, কেন না সরকারী ব্যবস্থা অপ্রতুল, পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো দুর্বল, অনুমোদিত কর্মসূচীগুলি ব্যয় বহুল। বাজার ও লেনদেনের সমস্যা এবং আরও অনেক রকমের অসুবিধা রয়েছে। এই কর্মসূচীর প্রবর্তনকারীরা গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাইরের প্রযুক্তি প্রয়োগেরও ঘোরতর বিরোধী। এই বিরোধিতার কারণ হচ্ছে এক, প্রযুক্তি প্রয়োগ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, গ্রামের বেকার ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। সরকারী বা বেসরকারী চেষ্টায় এই দায়িত্ব বহনের চেষ্টা হলেও সকলের জন্য এই দায়িত্ব বহন করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। দুই—আধুনিক প্রযুক্তিকে বোঝা ও গ্রহণ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। চরকা এমন একটি যন্ত্র যে যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য কোন আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করার আবশ্যক করে না। তিন—বাঁশের চরকার সংগে আধুনিক যন্ত্রের ও সেই সংগে আধুনিক শিল্প উৎপাদনের ধ্যান ধারণা একবার গ্রামের মানুষের মনে প্রবেশ করলে তখন আর চরকার বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করা যাবে না; কালক্রমে গ্রামের মানুষও যন্ত্রশিল্পের অঙ্গীভূত হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য জীবনও আধুনিক শহরে জীবনের চিন্তার প্রভাবে কলুষিত হয়ে উঠবে। তখন আমরা গ্রামে যে, সুস্থ

স্বনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবছি তা আর সম্ভব হবে না। এর সঙ্গে তাঁদের আরও একটি যুক্তি হচ্ছে, চরকার আদি ও অকৃত্রিম রূপটি বজায় রাখতে পারলে তবেই গ্রামের সব বেকার ও গরীব মানুষের তাদের শ্রমশক্তি ব্যবহারের ও কর্মসংস্থানে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে। এই যুক্তি আদৌ সত্য নয়। প্রথমত একটি বাঁশের চরকা আট দশ টাকায় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যাদের জন্য বিশেষ করে এই চরকার কর্মসূচীর প্রবর্তন তাদের অধিকাংশেরই ক্ষুদ্র বাস্তুভিটা ছাড়া চাষযোগ্য উদ্বৃত্ত জমি নেই। বাঁশ বাগানেরও কোন মালিক নয় তারা। চরকা বানানোর জন্য যে দক্ষতা দরকার অনেকের তা নেই। চরকা হলেই তো আর সুতো হয় না। সুতার জন্য তুলা দরকার, তুলার জন্য জমি দরকার ; আবার সব জমিতে তুলার চাষ হওয়া সম্ভব নয়, তুলা চাষের জন্য এক ধরণের বিশেষ জমি ও আবহাওয়া দরকার। ক্ষুদ্র বাস্তুভিটার আশপাশে দশ বারোটি তুলাগাছ চাষ করে এবং সেই গাছের উৎপন্ন তুলার উপর নির্ভর করে কোন কর্মসূচীকে স্থায়ীভিত্তিক, বেকারী দূরীকরণের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করার কথা ভাবা যায় না। তাছাড়া চরকায় উৎপন্ন সুতা থেকে তো বস্ত্র তৈরী করতে হবে ; সেটি তো আর চরকার কাজ নয়! তার জন্য তাঁত শিল্পের প্রয়োজন, বস্ত্র বোনার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং আরো আনুষঙ্গিক অনেকগুলি ব্যবস্থা যেমন রং ডিজাইনের প্রয়োজন। তাহলে দেখা যায়, তুলা থেকে বস্ত্র তৈরী কতকগুলি প্রক্রিয়ার মিলিত ফল। সুতা বস্ত্র তৈরীর একটি মধ্যবর্তী উপাদান মাত্র, আর চরকা সুতা তৈরীর একটি যন্ত্র বিশেষ। কাজেই ঘরে ঘরে চরকার প্রবর্তন হলে গ্রামের অভাবী ও বেকার মানুষগুলির বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ব্যাপারটি কিন্তু অত সহজ নয়। এরপর আছে বস্ত্রের আকার ও প্রকার বিভাগ, বয়সের তারতম্যে রুচির প্রশ্ন। গ্রামে এখনও ধুতি বস্ত্রের প্রচলন আছে কিন্তু আগামী দশ পনের বছর পর এই ধুতি চলন আর থাকবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। প্রয়োজন হচ্ছে প্যান্ট, সার্ট প্রভৃতি নানা ধরণের পোষাক। প্রাকস্বাধীনতা যুগে মানুষের

চাহিদা ও রুচির সংগে বর্তমানে ও আগামীদিনে চাহিদা ও রুচিকে মেলাতে চাইলে তা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রামের মহিলারা শাড়ী ব্যবহার করবে এটা ধরে নিলেও তাদের শাড়ী ও পোষাকের ধরণ ও ধারাটা অনেকখানি পাল্টে গেছে, আগামীদিনে আরও পাল্টে যাবে। এই সবগুলিকে এই পরিবর্তনের প্রেক্ষপটে রেখেই গ্রামে সুতা কাটা ও চরকা শিল্পকে গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে অতীতের বাঁশের চরকা কতখানি সহায়ক হবে তা গভীর সংশয়ের বিষয়। সমগ্র বিষয়টি কোন ব্যক্তি বা পারিবারিকভিত্তিক ব্যবস্থা এমনটিও ভাবা যায় না। এলাকা ভিত্তিক অনেকগুলি পরিবারের কর্মসংস্থানের পরিকল্পিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমবায়ী কর্মসূচী হিসাবে চরকার প্রবর্তন এবং গ্রামের বেকার মানুষের শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের সমস্যাটি ভাবতে হবে। সমস্যা তো এ নয় যে দেশের একটি বড় অংশ মানুষ কর্মহীন। কর্মের অভাবে অলস জীবন যাপন করছে তাই তাদের হাতে একটি করে চরকা তুলে দিয়েই তারা সুতা কেটে স্বনির্ভর হয়ে পড়বে। চরকায় সুতা কাটা একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী বলে গৃহীত হয় তাহলে অবশ্যই দেখা দরকার যে পুরান বাঁশের চরকায় একটি পরিবার তাদের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করলেও যে সুতা তৈরী হবে তার বিনিময় মূল্য কতটা হবে? এই প্রসঙ্গে এমন যুক্তিও আসতে পারে যে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসূচী নয়, পরিপূরক কর্মসূচী। তাহলেই স্বীকার করে নিতে হয়, চরকায় সুতা কাটা কর্মসূচীটি গ্রামের বেকারী ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পক্ষে কোন মুখ্য নির্ভরযোগ্য কর্মসূচী নয়। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলি স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে একথা ভাবা যায় না।

স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কথা দুটি সমার্থক নয়। কথা দুটির অর্থের পার্থক্য বোঝা দরকার। স্বনির্ভর আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই এই দাবী যখন আমরা করি, তখন কি আমরা এরকম ভাবি যে আমাদের গ্রামের একটি পরিবারের যা কিছু প্রয়োজন সবই সেই পরিবারের মধ্যেই উৎপন্ন হবে! এইভাবে একটি পরিবার

বা গ্রাম হয়ে উঠবে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট যেখানে কোন ব্যাপারেই অন্য পরিবার বা পার্শ্ববর্ত্তী পরিবারের কোন সাহায্যই প্রয়োজন হবে না। আজকের দিনে এরকম একটি সমাজ ভাবনার মধ্যে চিন্তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যেখানে প্রতিটি দেশের আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রের কাঠামো অন্য দেশ নিরপেক্ষ নয়, নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভবও নয়, সেখানে আমরা কতগুলি পরিবারকে বা গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলব এটি একটি অসম্ভব ও অবাস্তব ধারণা। এখন সহযোগিতার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষকে আগামী দিনে একটি মহামানব গোষ্ঠিতে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, তখন দেশের কোন একটি প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় কিছুসংখ্যক মানুষ অথবা পরিবার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র অথবা ইউনিট হিসাবে গড়ে উঠবে এরকমটি ভাবা শুধু অবাস্তব নয় বিভ্রান্তিকর বিপজ্জনক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথা বলছেন—গ্রামের মানুষ যে জিনিস উৎপন্ন করবে তারা সেই জিনিষই ভোগ করবে, বাজারে আমদানী পণ্যের উপর আদৌ-নির্ভরশীল হবে না। তাদের ধারণায় এই ধরণের ব্যবস্থাই হচ্ছে, স্বনির্ভর গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা। বাজারগুলি গড়ে উঠছে বহু জাতিক সংস্থা, বৃহৎ শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রির কেন্দ্র হিসাবে। অতএব তাদের দাবী এই বাজার বয়কট বা বর্জন করা। যাঁরা এই ধরণের অভিমতের প্রবক্তা তাঁদের সামগ্রিক বিপ্লবের ধ্যান ধারণার প্রতি কোন কটাক্ষ না করেই বলা দরকার যে, একুশ শতর্কের দ্বারপ্রান্তে এসে এই ধ্যান ধারণা একটি প্রতি বিপ্লবের দিকেই মোড় নিচ্ছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা শুধু ইউরোপ আমেরিকায় নয় সমাজতান্ত্রিক দেশ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ-গুলির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিন্তা ও কর্মসূচীকে প্রভাবিত করছে। এটা ঠিকই এই সমাজদর্শন বিশ্ব মানবের পক্ষে কল্যাণকর নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পকে অবলম্বন করে মানুষের সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক কল্যাণের আবেদন নিয়ে যে সভ্যতা শুরু হয়েছিল কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই সে সভ্যতার যাত্রাপথ বিঘ্নিত হয়েছে এবং এর মধ্য থেকেই আমাদের সামনে একটি নুতন ধরনের সংকট আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য মানুষের একাংশইতো দায়ী। এই সংকটের ভিত্তিভূমি হচ্ছে একটি ভুয়ো সমাজ দর্শন যাকে আমরা ভোগবাদী সমাজদর্শন নামে অভিহিত করি। পৃথিবীব্যাপী বাজার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে এই ভোগবাদী দর্শনের ব্যাপ্তি দেশ দেশান্তরে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংক্রামিত হচ্ছে। মানুষের ধারণায় প্রয়োজন অপ্রয়োজনের সীমারেখাটি আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক আজ আমরা সকলেই এই দর্শনের শিকার, বাজার অর্থনীতির দাস। এখানে জাতি, ধর্ম, দেশ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র যে মত; পথের সমর্থন করি না কেন আমরা সকলেই প্রায় অভিন্ন ও সগোত্র। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—যদি আমরা এগুলিকে একটি মানুষের মৌলিক ন্যূনতম চাহিদা বলে মনে করি তাহলে এগুলি কোন একটি পরিবারে বা একটি গ্রামের সবগুলি পরিবারে মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষের প্রয়োজনের সংখ্যা ও গুণগত মান যে একই স্তরে থাকবে তাও ঠিক নয়। স্বাভাবিক কারণেই তার বৃদ্ধি, ব্যাপ্তি ও মানোন্নয়ন ঘটবে; তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমরা একটি অন্ধ ও অচলায়তন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই বাস করছি। সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ ব্যবস্থার সেই অধ্যায়কে অন্ধকার যুগ বলেই মনে করি। এ ধরণের ধারণা প্রগতি বিরোধী ও বিবর্তন বিমুখী। এই ভাবনার মূলে আঘাত করেই তো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে। আজকের সমস্যা হচ্ছে আমরা আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে যথেচ্ছাচার ও মাত্রাহীন হ'য়ে পড়বো, না একটি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের গতিপথ নির্দিষ্ট হবে। বল্গাহীন ভোগের কামনা থেকেই ভোগবাদী জীবন দর্শনের জন্ম-পাশ্চাত্য সভ্যতা এই দর্শনের গতিরোধ করার সঠিক কোন চিন্তা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যদি করতো, তাহ'লে মানুষের সত্যকার প্রয়োজন গুলি কি এবং কতখানি হবে, তার হিসাব করেই সমগ্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হতো। প্রগতিশীল চিন্তাবিদ সমাজ সংগঠকদের দায়িত্ব হচ্ছে এই অস্বীকৃত দিকটিকেই তুলে ধরা;

নতুন সমাজের মডেলটি কি হবে তা নিয়ে শুধু ভাবনা-চিন্তা নয়, একটি প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও এই মডেলের একটি বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে, যদিও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পেছিয়ে আছে, তবু আমাদের দেশেই এই ধারণার একটি সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, আর তা প্রয়োগ করার উপযুক্ত সময় আজ উপস্থিত হয়েছে। কি তথাকথিত উন্নত দেশ, কি অনগ্রসর উন্নতকামী দেশ সর্বত্রই এ সম্পর্কে একটি গভীর আলোড়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই আলোড়নের মূলে আছে : একটি ভুয়ো জীবনদর্শন যে দর্শন সমগ্র মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ধ্যান-ধারণায় পরিসীমিত নয়। এটা ঠিকই হয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পকে হাতিয়ার করে মানুষের একাংশ এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে ; কিন্তু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি যন্ত্রশিল্পও সমাজনিয়ামক শক্তি নয়, শক্তি হলেও সে শক্তি সমাজ নিরপেক্ষ শক্তি, এ শক্তির নিজস্ব কোন দর্শন থাকা সম্ভব নয়। সমাজ দর্শনে যদি কোন মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি ঘটে থাকে সেজন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পকে তো দায়ী করা যায় না ; সমাজদর্শনটিকেই পাল্টানো দরকার, আর সে পাল্টানোর দায়িত্ব মানুষের নিজেরই। অবশ্যই বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ ও যন্ত্রশিল্পের মালিকদের ও সে দায়িত্ব পালনের দায়িত্বে অংশীভূত করার আয়োজন হবে। কিন্তু এখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্রশিল্পকে বর্জন করার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে ?

আমাদের মত অনগ্রসর দেশে কুটির শিল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে ; সেজন্য কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার হওয়ার দরকার। এ দরকার শুধু গ্রামের বেকারী ও দারিদ্র্য দূর করায় জন্যই নয়, মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও কুটির শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের একান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্প কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির সঙ্গে ভোগবাদী সমাজ দর্শনের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। পরিবেশ ও পরিমণ্ডল দূষণের সমস্যাটি আজ আর একটি বড় মহা-জাগতিক সমস্যা ; এটি শুধু মানুষের সভ্যতার সমস্যা নয়, মানুষের

অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যাও বটে। বহুজাতিক বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কারখানা থেকেই এই সমস্যা জন্মলাভ করেছে এবং এই সমস্যা ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। কাজেই বিশ্বসভ্যতা ও মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বৃহৎ শিল্প কারখানার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার চালু ধ্যান ধারণাকে বর্জন করতেই হবে এর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মাঝারি শিল্প ও গ্রামে গ্রামে প্রতিটি পরিবারের মধ্যে কুটীর শিল্পের প্রচলন ও প্রসারের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এই বিচারে অন্যতম কুটীর শিল্প হিসাবে চরকার একটি ভূমিকা থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় একটি অংশ মাত্র হতে পারে এই চরকা; কোন পরিবারে মোটা ভাত, মোটা কাপড় জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে বাঁশের চরকার কর্মসূচীকে কি গ্রহণ করা যায়? যদি বেকারী ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচী হিসাবে চরকাকে গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে এই চরকার উৎপাদন শক্তি ও গুণগত-মান বর্তমান প্রয়োজনের উপযোগী করে বাড়াতেই হবে, এবং তা করতে হলে মান্ধাতা আমলের বাঁশের চরকার সুতা কেটে একটি দুঃস্থ পরিবারকে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় স্বাবলম্বী করে তোলা যাবে—এই অদ্ভু• ও উদ্ভট চিন্তা পরিত্যাগ করে নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েই এই চরকাকে একটি নতুন শক্তিশালী উৎপাদনী যন্ত্রে উন্নীত করার প্রয়োজন হবে। এ শুধু চরকার ক্ষেত্রে নয়, এই ভাবে সমগ্র কুটীর শিল্পেরই রূপান্তর ঘটাতে হবে। গ্রামীন বেকারী দূরীকরণ ও দারিদ্র্য মোচনের সঙ্গে তাই কুটীর শিল্পের নব রূপায়ন ও আধুনিকীকরণের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অস্বীকার করে দূরে সরিয়ে রেখে কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চিন্তা অর্থহীন ও অবাস্তব। যদি গ্রাম উন্নয়ন ও নতুন স্বনির্ভর সমাজ গঠনের চিন্তা এভাবে সুরু করা যায় যে যখন অন্য কোন কাজে অথবা কর্মসূচীতে সহজে ও সুলভে গ্রামের বিপুল অংশ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, শ্রমশক্তির ব্যবহার হচ্ছে না, অতএব মন্দের ভাল হিসাবে যদি কোন কুটীর শিল্পকে চালানোর চেষ্টা হয়, তাহলে প্রকারান্তরে গ্রামের দারিদ্র্যকে বণ্টন ও

স্থায়ী করারই চেষ্টা হয়। এ প্রচেষ্টা শুধু যে সার্থক হতে পারে তাই নয়, এই প্রচেষ্টা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। শুধু দেশের চিন্তাশীল সমাজ-বিদ ও সমাজ সংগঠকগণ নয়, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদেরও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে, কিভাবে তাঁদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে এই কুটীর শিল্পের মধ্যে নতুন শক্তির সঞ্চার করা যায়, কুটীর শিল্পের নব রূপায়ন ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা'র আবির্ভাব ও প্রসারের আগে আমাদের দেশে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কুটীর শিল্পের একটি বিশেষ স্থান ছিল এবং সেই কুটীর শিল্প গড়ে উঠেছিল তখনকার দিনের মানুষের প্রয়োজনও অনুভূতির তাগিদেই, মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও তৎকালীন উৎপাদনী মালমশলা প্রাপ্তির সম্ভাবনার ভিত্তিতেই। আর এই উৎপাদনী ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের জীবন ধারণের মানও নির্ণীত হতো। এই ব্যবস্থায় যে বহু অসুবিধা ও ঘাটতি ছিল তা ঠিকই; অসুবিধা ও ঘাটতি ছিল বলেই তো নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ মানুষ অনুভব করেছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের সমস্ত গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচীকে নবীকৃত ও পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশে আজও আমাদের দেশে কৃষি ও কুটীর শিল্পের স্থান সেদিনের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সেদিন আমাদের দেশে কৃষি ও কুটীর শিল্প যে আকারে গড়ে উঠেছিল তাঁকে ষোল আনা অনুসরণ করতে হবে, কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়, প্রকৃত অর্থও তা নয়। আজ গ্রামের বেকারা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে কুটীর শিল্পকে যদি তার সময়োপ-যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, তাহ'লে এই কুটীর শিল্পকে বহুমুখী (diversified) ও বহুমাত্রিক (multi-dimensional) হতে হবে; আর তা করতে হ'লে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এই কুটীর শিল্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযোজিত ও সম্পর্কিত করার প্রয়োজন হবে। স্বনির্ভরতার অর্থ কোনক্রমেই অনগ্রসরতা নয়; অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই স্বনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব। গ্রাম-

উন্নয়নের এই মৌল ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে যদি কোথাও কোন গ্রাম-উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তাহ'লে সে কর্মসূচীতে শ্রমশক্তির নিয়োগ বা আংশিকভাবে কর্মসংস্থান হতে পারে, কিন্তু স্বনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে তা হবে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও পরিপন্থী। এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে গ্রামের বেকারী ও দারিদ্র্য দূরীকরণ হবেই না, শেষ পর্যন্ত নানা অসুবিধায় দরিদ্র পরিবারগুলির মানুষরা একটি বড় রকমের হীনমন্যতার শিকার হবে। বাঁশের চরকা প্রবর্তনের মাধ্যমে যাঁরা গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশ ও একটি সুস্থ আত্ম-বিশ্বাসী স্বাবলম্বী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবছেন এই বিচারে তাঁদের ধারণা যে শুধু ভ্রান্ত তাই নয়, বিভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনকও বটে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্র শিল্পকে যদি আমরা গ্রাম উন্নয়নের কাজে সরাসরি সদ্ব্যবহার করতে না পারি তাহ'লে অনগ্রসর গ্রামগুলিতো চিরকাল শহুরে সভ্যতার শিকার হয়েই থাকবে। সেজন্যই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যন্ত্র শিল্পকে গ্রামমুখী করা আজ একান্ত জরুরী প্রয়োজন। একথা ভুললে চলবে না যে দেশের অর্থনীতি বা উন্নয়নের বিষয়টি যদি বৃহৎ ও ভারী শিল্পের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে তার মধ্যেই বাজার অর্থনীতি ও ভোগবাদী দর্শনের ধারণা ও ভিত্তি শক্তিশালী হয় এবং এই পরিস্থিতিতে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেই ব্যবস্থায় অর্থ নৈতিক শোষণ থেকে দেশে ও পৃথিবীতে যত রকমের অন্যায় ও ব্যাভিচার ঘটে সেগুলি জন্মলাভ করে এবং ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি হয়। কাজেই বৃহৎ ও ভারী শিল্পের ও বহুজাতিক শিল্প সংস্থার যে আগ্রাসী ও উদগ্র রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি যার অনিবার্য ফল হচ্ছে হিংস্র প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি আর অর্থনীতির শিকার আমরা সকলেই। অসংখ্য মাঝারি শিল্প এবং গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসার হওয়া জরুরী প্রয়োজন। তখনই বৃহৎ শিল্পপতি ও বহুজাতিক সংস্থার নিজেদের ইচ্ছামত উৎপন্ন পণ্য সামগ্রীর বিক্রীয় জন্য যে বাজার সৃষ্টি করছে সেই বাজারের অবসান ঘটবে। কিন্তু জাতীয় অর্থ-নীতিতে আন্তর্জাতিক বাজারের কোন স্থান থাকবে না, বহির্বাণিজ্যেকে

বর্জন করতে হবে—স্বনির্ভর গ্রামীন আর্থ-সামাজিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে কোন দেশ অগ্রসর হচ্ছে শুধু এই মানদণ্ডই বিচার করা —এটি একটি অনৈতিহাসিক, অবৈজ্ঞানিক বিভ্রান্তিকর ধারণা। অন্ন, বস্ত্র, আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—এই পাঁচটি প্রয়োজনকে যদি প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন বলে মনে করা হয় তাহলে এই প্রয়োজন-গুলি গ্রামের কোন পরিবারের মধ্যেই পরিবারভুক্ত সভ্যদের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়, গ্রামভিত্তিক চেষ্টাতেও সম্ভব নয়, বহুসংখ্যক গ্রামের মানুষের সম্মিলিত ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলেই এইরকম একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে সেজন্য এ ধরনের ব্যবস্থা একটি বাস্তবোপযোগী নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক না হয়ে পারে না। তা যদি হয় উৎপাদনী ব্যবস্থাকে, কৃষিতেই হোক বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গেই হোক এলাকা ভিত্তিক না হয়ে পারে না এবং এক্ষেত্রে গ্রামে গঞ্জে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছোট বড় বহু বাজারের প্রয়োজন হবেই। বাজার অর্থনীতি ও বাজারের মাধ্যমে উৎপন্ন সামগ্রীর লেনদেন ও কেনা-বেচার ব্যবস্থা এক জিনিস নয়! এখানেও আমাদের ধারণাটি সংস্কারমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বাজার অর্থনীতির মূল পরিচালক শক্তি বৃহৎ ও ভারী শিল্পের মালিকেরা ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি, মুনাফা ও শোষণই হচ্ছে এই বাজার অর্থনীতির লক্ষ্য এবং এই বাজার অর্থনীতি ভোগবাদী সমাজদর্শনের উৎস। পক্ষান্তরে ব্যাপক কুটীর শিল্প ও মাঝারি শিল্পকে ভিত্তি করে যে বাজার গড়ে ওঠে তা বাজার অর্থনীতির আগ্রাসী প্রভাবকে প্রতিহত করে স্বনির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই কাজ করে। কাজেই গ্রামে উৎপন্ন কৃষি ও শিল্পজাত ফসল ও পণ্যসামগ্রী বিক্রয় ও লেনদেনের জন্য গ্রামের মধ্যে অধিক সংখ্যক বাজার গড়ে উঠবে। স্বনির্ভর গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে আন্তর্জাতিক লেনদেন বা ব্যবসা বাণিজ্য যে বন্ধ হয়ে যাবে এমন কোন বিভ্রান্তিকর বিষয়কেও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। দেশে দেশে আমদানী রপ্তানী চলবে, পণ্যের লেনদেন চলবে সেগুলি অবশ্যই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। কোন কারণে যদি এই লেনদেন সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়

তাহলে যে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রয়োজনগুলি পূরণে আভ্যন্তরীণ বাজারে কোন বিপর্যয় ঘটে না যায় এবং গ্রাম্যজীবন স্তব্ধ হয়ে না যায় সেই প্রয়োজনগুলি এলাকা ভিত্তিতে গ্রামের মানুষই পূরণ করে নিতে পারে এমন যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা হচ্ছে স্বনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা। আর এই স্বনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা তখনই সম্ভব, যখন কৃষি ও কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও গ্রামীন প্রযুক্তিকে সর্বতোভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই বাঁশের চরকা প্রবর্তন করে গ্রামের বেকারী ও দারিদ্র্য দূর করা, স্বাবলম্বী স্বয়ম্ভর সুস্থ ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা—এটি একটি সম্পূর্ণ আবস্তব ধারণা।

নবম পরিচ্ছেদ

উন্নত গ্রাম মানে ছোট সহর নয়

একটি দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির প্রথম দুটি মাপকাঠি হচ্ছে : এক—এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি (basic needs) পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ; আর দুই—এই দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়েছে কিনা। এই সঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে এই স্বাস্থ্য একটি চিরকালীন লক্ষ্যমাত্রা বা স্থায়ী target পূরণের বিষয় নয়। এটি একটি বিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিক পরিবর্তনমুখী ও গতিশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই যুগের এমন এক শক্তি যা আমাদের হাজার বছরের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির ধ্যান-ধারণাকে আমূল পালটে দিচ্ছে ; একটি বিশেষ জায়গায় আমাদের বেশিদিন গতানুগতিকভাবে থাকার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। এই রকম একটি বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছে পৃথিবীর সব দেশ। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। যুগটি যদিও অভূতপূর্ব গতির যুগ ও বিবর্তনের ধারা প্রচণ্ড শক্তিশালী, কিন্তু পৃথিবীর সব দেশ যে এই গতি ও বিবর্তনের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে অগ্রসর হতে পারছে তা নয় ; আর এই অক্ষমতা যার কারণ সর্বত্র অভিন্ন না হলেও, তার ফলশ্রুতি হচ্ছে অত্যন্ত করুণ ও বেদনাদায়ক। আরও করুণ ও বেদনাদায়ক হচ্ছে যে সব দেশ এই বিপুল পরিবর্তনের সাথে চলতে পারছে না, যাত্রা পথের একেবারে পিছনের সারিতে পড়ে আছে যে সব দেশ আমাদের দেশ তাদের অন্যতম। অপর একটি দেশকে ক্রমবিকাশশীল হতে গেলে যে সব মূল্যবান উপাদান একান্ত প্রয়োজন তার কোন অভাব আমাদের দেশে কোনদিন ছিল না ; আজও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশের পেছনে আছে এমন একটি কালজয়ী ঐতিহ্য যা শুধু প্রাচীনতম নয়, বহু উত্থানপতনের মধ্যেও প্রাণধর্মী ও পরিবর্তনশীল। কাজেই আমাদের মত এমন একটি দেশের অগ্রগতির

ধারা একাধিক অনুকূল উপাদান সত্বেও একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে—গতি যদি কিছুটা হয়েও থাকে তুলনামূলকভাবে তা একেবারেই নগণ্য, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাই সে গতির পরিমাপ করা সম্ভব। এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে এই দেশের অধিবাসী হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের কি একটু নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মানুসন্ধানী হওয়া উচিত নয়? এই পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার মূল কারণ বা কারণগুলি কি তা অনুসন্ধানে একটু যত্নবান হওয়া ও সেগুলির দূরীকরণে সাধ্যমত সচেষ্ট হওয়া আমাদের প্রত্যেকের জাতীয় কর্তব্য বা সামাজিক ধর্ম বলে গণ্য হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? একটি দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বলতে আমরা কি বুঝি—এ সম্পর্কে আমাদের সকলের ধ্যান-ধারণা যে একই রকম হবে তা নাও হতে পারে এবং এই ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন পরিস্থিতি সাপেক্ষ পরিবর্তনশীল। কিন্তু বিচারের যে ন্যূনতম মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তো বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। উন্নতমানের দেশগুলির মত আমাদের দেশে সে রকম কোন সমৃদ্ধির প্রশ্ন আসেই না, যেখানে একটি দেশের ব্যাপকতম অংশের মানুষ আজও দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে, মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম প্রয়োজন অর্থাৎ basic needs গুলি পূরণ হওয়ার জরুরী প্রয়োজন ছিল—তা পূরণ হয়নি। সে প্রয়োজনগুলি যে কি তা তো আমাদের কারো অজানা নয়। এই basic needs গুলি হচ্ছে—খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন বা বাসগৃহ। দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন এবং জাতীয় সমৃদ্ধি নিয়ে আমরা যে তথ্যই পরিবেশন করি না কেন সে সব তথ্যের সত্যতা বা অসত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন না তুলেই, এমন কি ষোল আনা স্বীকার করে নেওয়ার পরও যে সত্যটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি প্রকাণ্ড বিষাক্ত ক্ষতের মত প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিচ্ছে—তা হচ্ছে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের এখনও দুবেলা অন্নের সংস্থান হয়নি, যারা বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন এবং উন্মুক্ত আকাশ, বৃক্ষ-তল, ঝুপড়ি ছাউনি অথবা শহরের ফুট-পাথই যাদের শীত-বর্ষায় ও রাত্রিতে মাথা গোঁজার একমাত্র আশ্রয় এমন দেশ-

বাসীর সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ কোটি। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন হয়তো এই রকম অসহায় ও অস্বাভাবিক অবস্থার একটি কৈফিয়ৎ ছিল কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর চার দশক পরেও এই রকম দুরবস্থার জন্য কি সত্যিকারের কোন কৈফিয়ৎ চলে? এই অবস্থা বজায় থাকার পর আমাদের দেশে সমৃদ্ধির কথা ভাবার কোন প্রশ্নই আসে না। এখানে বিস্তৃত পরিসংখ্যান দেওয়ার কোন প্রয়োজন হবে না, কেননা বিষয়টি আদৌ পরিসংখ্যান নির্ভরশীল নয়। পরিসংখ্যান নিয়ে যারা বিলাসিতা করে এটি সেই সব বুদ্ধিজীবি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপার। এখানে সত্য প্রত্যক্ষ গোচরীভূত ও অভিজ্ঞতালব্ধ। তাহলেও প্রসঙ্গত তিন চারটি পরিসংখ্যানের উল্লেখ করতে চাই—কেননা এই পরিসংখ্যান নিয়ে কোথাও কোন দ্বিমত নেই। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী সে পরিসংখ্যান হচ্ছে: বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় বিরাশি কোটি। দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে এমন পরিবারের সংখ্যা মোট পরিবারের অর্ধেকেরও বেশি, প্রায় পঞ্চান্ন শতাংশ। নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ষাট শতাংশ। পুষ্টি হীনতায় ভুগছে কিংবা খাদ্যাভাবে ও বিনা চিকিৎসায় কত মানুষ মারা যায়—সে সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার যে হিসাব তা কিন্তু গড় হিসাব, গড় হিসাবে দেশের নীচু তলার মানুষের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা কত ভয়ঙ্কর এবং তাদের সংখ্যা যে কি বিরাট তা সহজে বোঝা যায় না। পৃথিবীর দেশগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—উন্নত দেশ এবং উন্নয়নকামী বা উন্নয়নশীল দেশ; আসলে এই উন্নয়নশীল দেশগুলি হচ্ছে অনুন্নত বা অনগ্রসর দেশগুলির শ্রেণীভুক্ত। হিসাবের এই মাপ কাঠিতে আমাদের দেশ এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত একটি দেশ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এই সব দেশের মধ্যেও আমাদের দেশের স্থান একেবারে নীচের দিকে এবং যদি দেশের উন্নয়নের গতিধারা বর্তমান হারেই চলতে থাকে—তাহলে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় আগামী বিশ বছরের মধ্যে আমরা যে আরও অনেক নীচে পড়ে যাব—এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রটি কি রকমের—এর পর তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে কি কোন অসুবিধা হয়? এর পরও এই দেশের অধিবাসী হিসাবে আমাদের দেশের সমৃদ্ধি নিয়ে আত্মশ্লাঘা করার কি কোন নৈতিক অধিকার আছে? এখন দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির বিচারের দ্বিতীয় মানদণ্ডটি যদি গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ আমাদের দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কতখানি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়েছে—এ প্রশ্নের বিশ্লেষণে গেলে দেখা যাবে—এখানে অবস্থাটি আরও ভয়াবহ। তবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কেননা এটাই স্বাভাবিক। যেখানে দেশের জনসংখ্যার অর্ধাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে, যার ষাট শতাংশ নিরক্ষর, কোটি কোটি কর্মক্ষম যুবক যুবতী হয় সম্পূর্ণ বেকার, অথবা বছরের অর্ধেক দিনও যাদের কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই, সমগ্র মহিলা সমাজের স্বাধীন সত্বাই যেখানে প্রায় অস্বীকৃত—সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বা সংবিধানে সকলের সর্ব বিষয়ে সম অধিকার আছে বলে স্বীকৃতি থাকলেও যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে আজও দেশের অধিকাংশ মানুষ বাস করছে সেখানে এই সংবিধানে স্বীকৃত এই সব মৌলিক অধিকারগুলির কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকা কি সম্ভব? এটা ঠিকই যে আমাদের দেশে সকলের ভোটের অধিকার আছে, ভোটেই সরকার গঠিত হয়, দেশের শাসন ব্যবস্থা চলে। কিন্তু এ সবই তো নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। ভোটের নামে যা হয় তাকে সত্যিকারের ভোট বলা চলে না, ভোটের নামে ভোটের প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য ও পর্বত প্রমাণ নিরক্ষরতা আর গণতন্ত্র এক সঙ্গে পাশাপাশি চলে না। যেখানে মানুষ একেবারে অসহায় ও পরিবর্তনশীল ও নানা কুসংস্কারে দীনহীন—ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এসব বিচারের সুযোগ ও শক্তি তাদের কোথায়? আর তা যদি হয়, তাহলে এই সব মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে, দেশের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে—এ জিনিষ কিভাবে আশা করা যায়? রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে কোন গভীর আলোচনা করা এই লেখার

উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দেশের সমাজ ভাবনা নিয়ে কোন আলোচনায় আসতে হলে দেশের রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলিকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সমাজসেবী সংস্থার কর্মীরা কোন দলীয় রাজনীতি করবে না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে দেশের মূল রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবে। আমাদের দেশের সমাজসেবী সংস্থার সমাজসেবা ও সমাজ-উন্নয়নের ভাবনা চিন্তার মধ্যে বরাবরই একটি স্ববিরোধীতা কাজ করে চলেছে; এটি তাদের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি চরম বিভ্রান্তি ও সাংঘাতিক বিচ্যুতি। দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা গড়ে তোলার পথে এই বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির প্রতিফলন ঘটছে। এর ফলে নীচু তলার মানুষের ভিতরে যে শক্তি ও সম্ভাবনা তা আরও দুর্বল হচ্ছে শুধু তাই নয়, নিজেদের ভালমন্দ ও সমাজের ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তাদের সহজাত বোধটুকুও এর ফলে ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিপ্সু মানুষের প্রলোভন, প্ররোচনায় অমানুষিক শিকার হচ্ছে—তা তারা বুঝে উঠতেই পারছে না। বিভক্ত হয়েই দেশ স্বাধীন হয়েছে, আবার দেশ নানাভাবে বিভাগের মুখে; জাতীয় সংহতি আজ সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত। ঠিক এই অবস্থায় জাতীয় জীবনে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত দুটি সর্বনাশা বিষাক্ত ক্ষতকে পরিকল্পনা মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সৃষ্টি করা হচ্ছেঃ একটি হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখিয়ে দেশে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও সংঘর্ষকে স্থায়ী করা, আর অন্যটি দেশের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার রঙিন আশা জাগিয়ে দেশে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতের যে অমানবিক ব্যবধান আজও চালু আছে সেই ব্যবধানটিকে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী করা দৃঢ় করা। যারা হিন্দু রাজত্বের দাবী তুলেছে প্রকৃত পক্ষে তারা কেউই অখণ্ড কালজয়ী সনাতন হিন্দু ধর্মের স্বীকৃত প্রবক্তা নয়—যে হিন্দুধর্মের ভিত্তি হচ্ছে ভারতের বেদ-উপনিষদ ও গীতা—যে ধর্মের আবেদন হচ্ছে সার্বজনীন, সেখানে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের কোন স্থান নেই।

অনুরূপভাবে যেখানে দেশের কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বেকারকেই চাকরী দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে সংরক্ষণের ধূঁয়া তুলে দেশের কয়েক কোটি অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীকে সরকারী কাজ বা চাকুরী দেওয়ার মরীচিকা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার কি কোন বাস্তব ভিত্তি আছে? চুয়াল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হবার পরও কেন এই বিরাট সংখ্যক মানুষ আজও অনুন্নত, অমানুষের জীবন যাপন করছে, শোষণ বঞ্চনা ও অপমানে ভরা তাদের জীবন, তার প্রতিকারের পথ কি এই চাকরী সংরক্ষণ? আমাদের সাংবিধানিক অনুশাসনে তো প্রথম থেকেই সংরক্ষণ ছিল, আছে—তাতে এই সব অনগ্রসরতা কতখানি দূর হয়েছে? শোষণ, বঞ্চনার মাত্রা কি হ্রাস পেয়েছে? যদি কোথাও নামমাত্র হ্রাস পেয়ে থাকে তাহলে তার ফলের অধিকারী হয়েছে কারা? এ সবের কি কোন সঠিক হিসাব নিকাশ হয়েছে? মানুষের অসহায় অব্যস্থা ও অশিক্ষা ও কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে কিছু মতান্ধ, ক্ষমতালিপ্সু মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে এবং তাদের এই হীন চক্রান্তের বলি হচ্ছে এই দেশের কোটি কোটি মানুষ। ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে এতবড় বজ্জাতি ও বেইমানী আর কি হতে পারে। আর এসবই ঘটছে যার প্রেরণা ও প্ররোচনার মূলে আছে আমাদের দেশের এক ধরণের ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতি—সে রাজনীতি দক্ষিণই হোক কিংবা বামই হোক। সেই কারণেই আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশ—জাতীয় জীবনের এই সব মৌলিক বিষয়ের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অন্তরায়টি কি এবং কোথায় সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসতে গেলে দেশের চালু রাজনীতির প্রসঙ্গটি না এসে পারে না। এটি একটি অনস্বীকার্য প্রেক্ষাপট, যে প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকেই আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির কথা ভাবতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে আমাদের আজ জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। আমরা এ ব্যাপারে এক রকম বিভ্রান্তির মধ্য দিয়েই চলেছি; আর সেজন্যই জাতীয় জীবনের বিবর্তন আদৌ বিকাশশীল হয়ে উঠছে না। আর বিবর্তনের ধর্মই হচ্ছে হয় তা

গতিশীল হয়ে সমগ্র জাতিকে ক্রম-উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নতুবা তা জাতীয় ক্ষেত্রে একটি অচলায়তন পরিবেশ সৃষ্টি করবে। আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিই কাজ করছে। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, আমাদের মত সব পেছিয়ে পড়া দেশেই যে এই বিবর্তন বিমুখী প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল—তা বুঝতে হবে।

এই লেখার প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ আমাদের দেশের ব্যাপক অনগ্রসরতা। এই অনগ্রসরতার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না কেন, এই ব্যর্থতার মূল ত্রুটিটি কোথায়? সমস্যাটি নতুন নয়, বিতর্ক চলছে প্রায় এক যুগ ধরে। কিন্তু সমস্যাটির চরিত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অনগ্রসরতাকে এখানে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে জাতীয় জীবনের কোন বিশেষ শ্রেণীর কোন একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে নয়। আলোচনার সূচনাতেই মানুষের যে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন বা basic needs-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এই প্রয়োজনগুলির কোন একটি থেকে কোন দেশের একটি বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি বঞ্চিত থেকে যায়—তাহলে সেই দেশটি যে কোন না কোন প্রকারে অনুন্নত বা অনগ্রসর তা ধরে নিতে হয়। এই মানদণ্ডে আমাদের দেশের অনগ্রসরতার স্থান অনগ্রসর দেশগুলির তালিকায় প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। আর যে দেশের অনগ্রসরতা পর্বত প্রমাণ—সে দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয় কেননা, একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সেই দেশের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বলা যায় পরস্পরের পরিপূরক ও নির্ভরশীল। প্রথমোক্ত সমস্যাটি হচ্ছে এখানে আলোচ্য বিষয়—অর্থাৎ দেশকে স্বাধীন করার মূল প্রেরণাই ছিল যখন দেশের ব্যাপক অনগ্রসরতার দূরীকরণ ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, নির্দিষ্ট ন্যূনতম লক্ষ্য মাত্রা থেকে বহু দূরে পড়ে আছি কেন, বিগত চার দশক পরেও সেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে না কেন তার কি কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত কিছু যুক্তি আছে? দেশের অগ্রগতির সব

দিকগুলি যে ঘোর অন্ধকারময় ও গভীর নৈরাশ্যজনক তা তো নয়। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য যে বৃহৎ শিল্প কারখানার প্রসার ঘটানো দরকার ষোল আনা না হলেও তার অনেকখানি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না, দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করার কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হচ্ছে এবং নানাভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও একটি সর্ববাদী স্বীকৃত ঘটনা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন-যাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন বা basic needsগুলি পূরণ হচ্ছে না কিম্বা পূরণ করা যাচ্ছে না—এই পরিস্থিতির মধ্যে কি একটি বড় রকমের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না? এই স্ববিরোধিতা আছে বলেই দেশে যাবতায় অনর্থের সৃষ্টি হচ্ছে, বিভেদ ও অনৈক্য নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করছে এবং ক্রমশই সেগুলি প্রবল আকার ধারণ করছে। কাজেই দেশের কিছুসংখ্যক মানুষের অনগ্রসরতা দূরীকরণ কোন একটি বিচ্ছিন্ন জাতায় কার্যক্রম নয়; বর্তমানে এটিই হচ্ছে মূল জাতীয় কর্তব্য, আর তা আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকারও করা হচ্ছে। স্বীকার করা হচ্ছে বলেই বিগত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ও আর্থিক যোজনায় গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে গুরুত্ব স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট আশান্বিত হতে পারা যাচ্ছে না। কয়েকটি পরিসংখ্যান মারফৎ পরিস্থিতির যে সর্বশেষ চিত্রটি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে—তা আদৌ উজ্জ্বল নয় এবং এই চিত্র থেকে অদূর ভবিষ্যতে কোন আলোক সংকেত পাওয়া যায় না। সেজন্যই সমস্যাটি গভীর উদ্বেগের কারণ। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অনগ্রসরতা আছে। কিন্তু গ্রাম জীবনের এই অনগ্রসরতার প্রকোপ ব্যাপক ও ভয়াবহ। গ্রামীণ জীবন ও অনগ্রসরতাকে অনেক সময় প্রায় সমার্থক বলেই মনে করা হয়। সেজন্যই গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকেই গ্রাম জীবনের অনগ্রসরতা দূরীকরণের কর্মকাণ্ড বলে ভাবা হচ্ছে। যোজনা পরিকল্পনাতেও গ্রাম উন্নয়ন কথাটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামের অনগ্রসরতা

দূরীকরণ ও গ্রাম-উন্নয়ন কথা দুটির অর্থ ষোল আনা অভিন্ন নয়। কিন্তু আমরা অনেক সময় গ্রান উন্নয়নের সঙ্গে গ্রামীণ অধিবাসীদের অনগ্রসরতার দূরীকরণ সমস্যাটিকে এক করে ফেলি। এখানেও আমাদের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে একটি বড় রকমের বিভ্রান্তি থেকে যায়। এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিশেষ ওয়াকিবহাল নই। সেজন্য বিষয়টির উপর সংক্ষেপে হলেও কিছু আলোচনার প্রয়োজন এবং এই লেখায় এই আলোচনারই সূত্রপাত করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।

গ্রাম উন্নয়ন কল্পে আমরা সাধারণত এমন কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকি, যে গুলি সার্থকভাবে রূপায়িত হলে আমরা একটি গ্রাম যে উন্নত হচ্ছে তা মনে করতে পারি। আকারে ও জনসংখ্যায় বৃহৎ হলেও যদি আমরা দেখি সরকারী ও বেসরকারী স্তরের নানা প্রচেষ্টায় একটি গ্রামে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেমন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি গ্রন্থাগার, একটি যুব ক্লাব, একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি, সহর ও গঞ্জের সঙ্গে একটি স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, গ্রামের বয়স্ক ছেলে মেয়েদের একাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমনকি কলেজে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে, সরকারী অফিসে, স্কুলে, সহরের শিল্প কারখানায় স্থায়ী বেতন কর্মসংস্থানে সক্ষম হয়েছে, মাটিতে উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহার করে এবং উন্নততর সেই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু কিছু কৃষক পরিবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মারফৎ তাদের আর্থিক অবস্থায় বেশ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে—সরকারী অনুদান ও ব্যাংকের সুলভ ঋণের সাহায্য নিয়ে গ্রামবাসীদের কেউ কেউ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-পসার ঘটিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং এসবই ঘটছে একটি গ্রামে যদি তা আমরা লক্ষ্য করি তাহলে উল্লিখিত গ্রামটি যে উন্নত গ্রাম তা সাধারণভাবেই আমরা দাবী করে থাকি। এ দাবী যে একেবারে অসঙ্গত বা ভিত্তিহীন তাও বলা চলে না। এই ঘটনাগুলি একটি গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যে অংশ বিশেষ তাও

সরাসরি অস্বীকার করা ঠিক হবে না। কিন্তু এই ধরণের নানাবিধ উন্নয়নের পর আমরা যে গ্রামটির অনগ্রসরতা দূরীভূত হয়ে গেল বা দূরীভূত হওয়ার সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে গ্রামটি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে—এমনটি ভাবতে পারি না। আমাদের বর্তমান গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মূলত এই ঘটনাই ঘটছে এবং গ্রাম উন্নয়নের নামে এই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। এই সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামের পুরানো চিত্রের মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটছে এবং এই পরিবর্তনেরও যে প্রয়োজন আছে—এ সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফল যদি একটি গ্রামের মোট জনসংখ্যার অথবা পরিবারের অর্ধাংশকে কোনভাবেই স্পর্শ না করে এবং এই অবস্থা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতেই থাকে অর্থাৎ একটি গ্রামের অর্ধেক সংখ্যক নর নারী তাদের গ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনভাবেই অংশীভূত ও উপকৃত হবার সুযোগ না পায়—তাহলে সেই গ্রামের অনগ্রসরতা একটি স্থায়ী আকার গ্রহণ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। আর এই জিনিষই চলছে আমাদের দেশের গ্রাম জীবনে, হরেক রকমের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী করা সত্বেও তাহলে কি গ্রামের অনুন্নত সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণে আদৌ কি চেষ্টা হচ্ছে না বা সেই ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে না? না ব্যাপারটি ঠিক তাও নয়। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্তব্যটিকে যদি অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রধানতম জাতীয় কর্তব্য বলে চিহ্নিত করা হয় তাহলে এই কর্তব্য সাধনের জন্য বহুমুখী ও একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই কাজে ক্রমশই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচীর সংখ্যার অল্পতা নয়, বরঞ্চ কর্মসূচীর সংখ্যার আধিক্যই বহুক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিষয়টি স্বতন্ত্র, সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে। কিন্তু গ্রামীন জীবনের অনগ্রসরতা দূরীকরণে কোন কর্মসূচী নেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না এ অভিযোগের কোন কারণে নেই। শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে কতকগুলি কর্মসূচ

নেওয়া হয়েছে তা নয়, এই সব কর্মসূচী রূপায়ণে ক্রমশই অধিকতর পরিমাণ অর্থও বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ে অভিযোগ থাকতে পারে, বিতর্ক হওয়াও সম্ভাব্য—কিন্তু এই পরিমাণও একেবারে নগণ্য নয় এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যে ক্রমবর্ধমান তাও অস্বীকার করা যায় না। আই. আর. ডি. পি হচ্ছে মূলতঃ গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচী আর গ্রামীণ পঞ্চায়েতের প্রধানতম কাজই হচ্ছে—এই আই. আর. ডি. পি কর্মসূচীকে সর্বতোভাবে সার্থক করে তোলা। গ্রামের অনুন্নত সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ এর একমাত্র কর্মসূচী আই. আর. ডি পি নয় এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের সংস্থা বা এজেন্সী একমাত্র পঞ্চায়েতই নয়। কৃষি, কুটিরশিল্পের বিকাশ ও প্রসারের সঙ্গে গ্রামের দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—এই সব কাজে আই. আর. ডি.পি-র অনুরূপ আরও অনেক কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে এবং পঞ্চায়েত ছাড়াও বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এই কাজে ব্যাপৃত আছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও ন্যূনতম শিক্ষার বিস্তারেও বহু রকমের বহু পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে, বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা যে এই কাজে আত্মনিক্ষেপণ করেছে বা করছে তাও অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে জনস্বাস্থ্য, জনপুষ্টি, শিশু বিকাশ, সুলভ আবাসন প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলির সঙ্গে গ্রামের অনুন্নত সমাজের মানুষের অনগ্রসরতার সমস্যাটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—এই সব বিষয়ের সুষ্ঠু মোকাবিলার জন্য অন্ততঃ দীর্ঘ তিন দশক ধরে জাতীয়ভিত্তিক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলেছে এবং নানা ধরণের কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ অনগ্রসরতা দূরীকরণের এই সব যাবতীয় কাজে যে সব বেসরকারী সংস্থা নিযুক্ত হয়েছে—তাদের কর্মী সংখ্যা আনুমানিক পনের থেকে বিশ লাখ; আর আমাদের রাষ্ট্র যেহেতু কল্যাণধর্মী, এই জাতীয় কল্যাণের কাজে নিযুক্ত যে সরকারী কর্মচারী তাদের সংখ্যাও প্রায় আড়াই কোটি; এদের মধ্যে অন্তত এক কোটি সরকারী কর্মচারী দেশের উন্নয়নের এমন সব কাজে নিয়োজিত যার সঙ্গে গ্রামের অনগ্রসরতা দূরীকরণ প্রশ্নটি গভীর ভাবে সম্পর্কিত।

এই সব সরকারী কর্মচারীরা তো বিনা বেতনে কাজ করে না। এদের জন্য বছরে কয়েক হাজার কোটি আমাদের সরকারকে অর্থাৎ দেশকে বহন করতে হয়। বেসরকারী সংস্থার কর্মীরা সরকারী কর্মচারীদের হারে বেতন অথবা অনুরূপ সুযোগ সুবিধা পায় না সত্য, কিন্তু এদের জন্যও সর্বসাকুল্যে বেসরকারী সংস্থাগুলিকে ব্যয় ভার বহন করতে হয় যার পরিমাণও বছরে কয়েক শো কোটি টাকা আর এই অর্থও আসছে হয় আমাদের সরকারী তহবিল থেকে না হয় বিদেশী দাতব্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে দান হিসাবে—যে দান আমরা লাভ করে থাকি জাতীয় সম্মানকে প্রায় বিসর্জন দিয়ে। এছাড়াও দেশের অনগ্রসরতা দূরীকরণে অর্থ জোগান দেওয়ার ব্যাপারে দেশের ব্যাংকগুলিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই কাজে ব্যাংকগুলি যে কি পরিমাণ ঋণ বাবদ বিনিয়োগ করে তা সঠিক জানা না থাকলেও তার পরিমাণও যে কয়েক শো কোটি টাকা তা সহজেই অনুমান করা যায়। আজকাল অনেক বৃহৎ শিল্প সংস্থাও গ্রাম উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মধারায় নিজেদের সামিল করছে এবং এভাবেও গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কিছু অর্থ বিনিযুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এদেরও কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে—ঐ একই অর্থাৎ গ্রামীণ অনগ্রসরতা দূরীকরণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে—দেশের অনগ্রসরতা দূরীকরণে কর্মসূচীর কোন ঘাটতি নেই, অর্থের অভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সাংঘাতিক ব্যাহত হচ্ছে ব্যাপারটি ঠিক তাও নয়। অথচ যে ঘটনাটি অনস্বীকার্য বা প্রত্যক্ষ; তা হচ্ছে আমাদের দেশ পৃথিবীর যে সব দেশ অত্যন্ত দরিদ্র ও অনগ্রসর তাদের অন্যতম।

উন্নয়নের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজের সুযোগ ও সম্পদ সৃষ্টি ও স্বাবলম্বিতা বা স্বনির্ভরতার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বাস্তব বা জৈব (physical) দিক ; অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে—অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ বা সমাজের মানসিকতার পরিবর্তনের দিক। সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের চালু মানসিকতার যদি কোন রূপান্তর না ঘটে তাহলে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্র কোন একটি বিষয়ে এমনকি একাধিক বিষয়ে উন্নয়ন সাধিত হলেও

সেই সমাজের অনগ্রসরতা দূরীভূত হলো—এ দাবী করা যায় না। ধাপে ধাপে বাধা ও অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য যদি অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে থেকেই একটি সহজাত তাগিদ ও প্রেরণা জাগ্রত না হয়, তাদের ভিতর থেকেই একটি অধিকতর সুস্থ ও উন্নত মানের জীবন ধারণের সংগ্রামের সূচনা না ঘটে, তাহলে উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহের যে প্রতিশ্রুতিই থাকুক না কেন—তার সীমাবদ্ধতা প্রতিমুহূর্তেই প্রকট হতে বাধ্য। উন্নয়ন কোন উপর থেকে চাপানো কর্মযজ্ঞ নয়; এখানে অনুন্নত অনগ্রসর সমাজকে উপকৃত করার ধ্যানধারণার কোন ভূমিকা নেই। লক্ষ্য কোটি মানুষের অনগ্রসরতা—এই অনগ্রসরতার দূরীকরণ বা অবসান এ ব্যাপারে কতকগুলি উন্নয়ন কর্মসূচী প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে; কিন্তু এই সব কর্মসূচীর সার্থকতা এ পর্যন্তই। অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে মূল সংগ্রাম অনগ্রসর সমাজের মানুষকেই করতে হবে। উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের চিন্তার অন্যতম বিভ্রান্তি হচ্ছে উন্নয়নের কতকগুলি উপাদান বা উপকরণ কিম্বা কিছু আর্থিক সহায়তা অভাবী মানুষগুলির কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই আমাদের দেশের যে বিশাল অনগ্রসর সমাজ—এই সমাজ সেই অনগ্রসরতা মুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের যে গ্রাম উন্নয়ন কর্মধারা, তা কি সরকারী স্তরেই হোক কি বেসরকারী স্তরেই হোক—যাবতীয় কর্মধারা এই চিন্তাধারার আবেষ্টনীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে। তার ফলে সর্বত্র সাহায্যকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে গ্রামের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের একটি দুর্লংঘ দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কই গড়ে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা, শোষণ ও অপমানের জীবন-যাপন করার ফলে সরকার ও উপর তলার মানুষের সঙ্গে এইসব মানুষের সম্পর্কের এক বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, অবিশ্বাস ও দীনতা হীনমন্যতার বাধা যে একটি সর্বকালীন সামাজিক বিভাজন ঘটিয়েছে তার কোন পরিবর্তন ঘটছে না। ফলে উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির সাফল্যও অর্জিত হচ্ছে না, অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে দেশ মুক্ত হচ্ছে না। অনগ্রসরতা দূরীকরণ বা গ্রাম উন্নয়নের নামে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও

বেসরকারী সংস্থার মারফৎ আমাদের দেশে নানা পর্যায়ের গ্রাম উন্নয়ন কর্মী নিযুক্ত আছে, সারা দেশে এদের সংখ্যা পনের বিশ লাখ হবে। এরা অনেকেই সাধারণ ভাবে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এরা অনেকেরই সরকারী দপ্তরে কর্মপ্রার্থী; কিন্তু চাকরীর অভাবে বেকার, এই দেশেরই হতাশপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী ছেলেমেয়েরা। গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অল্প বেতনে কিম্বা মাসিক ভাতার বদলে এই সব বেকার ছেলেমেয়েদেরই নিযুক্ত করা হয়েছে, বলা যায়, নিযুক্ত হতে এরা বাধ্য হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই চায় নিজেদের জন্য নির্ভরযোগ্য উপজীবিকা। কিন্তু যে গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীতে তারা নিযুক্ত এখানে সে নিশ্চয়তা কোথায়? অবিশ্বাস, সন্দেহ ও হীনমন্যতার শিকার শুধু অনগ্রসর সমাজের মানুষেরই নয়, যারা বিভিন্ন উন্নয়নে কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে এই সব অনগ্রসর মানুষের জীবনে উন্নয়নের আলো বহন করে আনবে, তারা নিজেরাই তো তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কেই ঘোর সন্দেহ, অবিশ্বাস ও হতাশার শিকার। কাজেই পরিস্থিতির মধ্যেই এমন স্ববিরোধিতা ক্রিয়াশীল যার মধ্যে কোন ক্রমেই দেশের কোন মৌলিক পরিবর্তন আসবে তা ভাবা যায় না।

গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধ্যান ধারণার মধ্যে যে সব বিভ্রান্তি থেকে গেছে সংক্ষেপে তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। কিন্তু আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও এমন কতকগুলি গুরুতর বিভ্রান্তি কাজ করছে যেগুলি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অবহিত হওয়ার দরকার। গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের দেশে যে সব কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা অল্প নয় এবং এই সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রকারভেদ সত্বেও গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানসিক উভয় দিকেই আমাদের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছি না। বিপরীত পক্ষে আমরা যা লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রকার ভেদের ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জটিলতাই বাড়ছে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোন ধারাবাহিকতা থাকছে না, বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য সমন্বয় সাধন

করা যাচ্ছে না। দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে কতকগুলি কর্মসূচী নির্দ্ধারিত করা হয়েছে; একই কর্মসূচী রূপায়নে সরকারের একাধিক বিভাগ স্ব স্ব পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে। এর ফলে কর্মসূচী রূপায়নই যে ব্যাহত হচ্ছে তা নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা ও উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি দেওয়ার খাতেই বরাদ্দ অর্থের বেশীর ভাগই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। যে অনগ্রসর সমাজের উন্নয়ন বা অনগ্রসরতা দূরীকরণে সরকারী অর্থের বরাদ্দ তাদের প্রকৃত প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত ব্যয় করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা আমাদের অজানা নয়। বিগত লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্ কালে দেশের তদানন্তীন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের শিলান্যাস করা উপলক্ষ্যে একটি জনসভায় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন এবং উক্ত স্বীকারোক্তির সঙ্গে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও একমত হয়েছিলেন যে গ্রাম উন্নয়নের কাজে সরকারের তহবিল থেকে যে অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে—প্রতি টাকায় মাত্র পনের পয়সা গ্রামের প্রকৃত দরিদ্র মানুষের কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। ঐ স্বীকারোক্তির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়েও বলা যায়, গ্রাম উন্নয়ন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ হয় তার বিপুল অংশই অপব্যয় হয়ে থাকে। দেশে যখন বিপুল ঘাটতি এবং দেশের আর্থিক সংকট পর্বত প্রমাণ, জাতীয় স্বার্থের প্রতিটি কাজেই বরাদ্দ অর্থের প্রতিটি পয়সারই সদ্ব্যবহার হওয়া অত্যন্ত জরুরী; সেক্ষেত্রে দেশের অনগ্রসরতা দূরীকরণের মহৎ উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে জাতীয় অর্থের এভাবে অপব্যয় করা কি জাতীয় অপরাধের সমতুল্য নয়? গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে যদি এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী অথবা বেসরকারী সংস্থার কর্মীদের উপজীবিকা ও এক শ্রেণীর পদস্থ অফিসার বা ব্যক্তির বিলাস বহুল জীবন যাত্রার সুলভ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে দেশের অনগ্রসরতা দূরীকরণের সমস্যাটির মীমাংসার জন্য আমাদের আরও দীর্ঘকাল যে অপেক্ষা করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। এ শুধু দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের

ক্ষেত্রেও গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একই ধরণের চূড়ান্ত বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং তা হচ্ছে অনেকখানি পরিকল্পিত ভাবেই আমাদের অগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থ ও প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখার সহজাত প্রবৃত্তি ও আকাংখার তাগিদে।

গ্রামের আর্থিক সমস্যার সমাধান বা দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রথম যে দুটি ব্যবস্থা অবশ্য করণীয় তা হচ্ছে এক—কৃষি সংস্কার এবং দুই—গ্রামে ব্যাপক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবর্তন। কৃষি সংস্কার সম্পর্কিত ব্যাপারে জমির সঙ্গে প্রকৃত কৃষি উৎপাদক অর্থাৎ প্রকৃত চাষীর সম্পর্ক এবং কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। প্রথমটিকে অস্বীকার করে দ্বিতীয়টির উৎকর্ষ সাধন তাতে গ্রামের এক শ্রেণীব অকৃষকের সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু গ্রামের বিপুল অংশ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এবং যারা প্রকৃত চাষ করে থাকে—তাদের আর্থিক দুরবস্থার কোন প্রতিকার হয় না এ শুধু কৃষিকে কেবলমাত্র আধুনিকীকরণের প্রশ্ন নয়, গ্রামের দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচীকে স্বতন্ত্রভাবে ভাবা যায় না। এখানে কোন উন্নত পাশ্চাত্য দেশের নজীর উদ্ধৃত করাও চলে না। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান; কৃষি অর্থনীতিই হচ্ছে আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান অর্থনীতি—শুধু বর্তমানে নয়, আগামী দিনগুলিতেও আমাদের দেশকে এই অর্থনীতির উপর নির্ভর করেই চলতে হবে। এই অর্থনীতির সার্থক রূপায়নের উপর গ্রামে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প তো বটেই, বৃহৎ শিল্পোন্নয়নেরও সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। আশ্চর্যের কথা, গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গ্রাম উন্নয়ন বা গ্রামের অনগ্রসরতা দূরীকরণে গ্রাম-জীবনের সমস্যার এই মৌলিক দিকটির প্রতি আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে কোন রাজ্যেই কৃষি সংস্কার হয় নি। দাবী করা হয়ে থাকে পশ্চিমবাংলার নাকি কৃষি সংস্কার বহুলাংশে সাধিত হয়েছে। এই ধারণাটিও সর্বৈব সত্য নয়। যা কিছুটা হয়েছে তা হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে, কিছু জমিতে বর্গা রেকর্ড ও পতিত জমি বণ্টন। কিন্তু এই কাজের নীট ফল হচ্ছে; সংক্ষেপে

দারিদ্র্য বণ্টন। কৃষি সংস্কারের সঙ্গে এই কাজের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি সংস্কারই হচ্ছে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মূল ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে গ্রামের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ তাদের যাবতীয় অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে, গ্রামোন্নয়নের কাজে অগ্রসর হতে পারে। যদি দেখা যায় গ্রাম-উন্নযন কর্মকাণ্ডের এই মূল কর্মসূচীটিকে বাতিল করা হচ্ছে অথবা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হচ্ছে না তাহলে গ্রাম উন্নয়নে বা গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে আমরা যত কিছু কর্মসূচীই গ্রহণ করি না কেন—এ সবের বিশেষ কোন সুফল পাওয়া যাবে না। শিক্ষা প্রসারের নামে গ্রাম-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনুরূপ বিভ্রান্তি চলছে। বলা হচ্ছে নিরক্ষরতা জাতির অভিশাপ। স্বাক্ষরতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হলেই মানুষের যে শিক্ষিত জীবনের সুরু হলো তার আগে পর্যন্ত সেই মানুষটি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং তার জীবন অভিশপ্ত—সমস্যাটিকে এই ভাবে ভাবা বা দেখা শুধু ক্ষতিকর নয়, বিপজ্জনক। প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র, তাই এখানে তার কোন আলোচনা হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সংবিধান রচিত হবার পরই এ নির্দেশই তো স্পষ্ট ছিল যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সার্বজনীন হবে তা বাধ্যতামূলক হবে; এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এখানে সময়সীমাও ধার্য ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হওয়ার পর নতুন করে নিরক্ষরতার প্রশ্ন আসে কোথায়? কিন্তু ঘটনা হচ্ছে: দেশ স্বাধীন হবার চার দশক পরেও আজও দেশের জনসংখ্যার শতকরা ষাটজন নিরক্ষর আর এই নিরক্ষরতার হার যেন হ্রাস হতে চায় না। ব্যর্থতা কি শুধু জনসংখ্যার তুলনায় দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব, না শিক্ষকের অভাব, না উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের অভাব? অথচ আমরা লক্ষ্য করি—এই সময়ে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক-শিক্ষা, বিধিমুক্ত শিক্ষা, প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা প্রভৃতি হরেক রকমের শিক্ষা কার্যক্রম বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় প্রতি গ্রামেই এই ধরণের একাধিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে; নতুন নতুন এলাকায়

এইসব কেন্দ্রের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় স্তরেই দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে যেন এক মহা কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো তাহলে এই সব নতুন নতুন বিচিত্র ধরণের শিক্ষা কর্মসূচী নেওয়ার কি কোন প্রয়োজন হতো? প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা আরও কিছু বর্ধিত করা যেতো। কিন্তু আমরা সকলেই জানি এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ও বিদ্যালয়গুলির অবস্থার হাল কি রকম। এই অবস্থার প্রতিকার ও পরিবর্তন কেন হচ্ছে না তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ নেই প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ তো নয় অধিকাংশই যেন কতকগুলি ভুতুড়ে বাড়ী আচ্ছাদনহীন কয়েকটি দেওয়াল। এই হচ্ছে আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রাম এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়। যে বুনিয়াদী শিক্ষার ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে একদিন আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা হয়েছিল তা যদি সততার সঙ্গে সর্বত্র পরিচালিত করা হতো তাহলে দেশে একদিকে যেমন ভয়াবহ নিরক্ষরতা অন্যদিকে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা নিয়ে আজ যে জাতীয় স্তরে হা-হুতাশ তার কি বহুলাংশে নিরসন করা সম্ভব হতো না? দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাভাবিক ভাবেই একটি নূতন প্রজন্ম গড়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল। আর তার ভিত্তি রচনার জন্যই এই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা দেওয়া হয়নি এবং আজও তা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ শিক্ষার অনগ্রসরতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারা যায়। গত কয়েক বছর হলো সরকারী তত্ত্বাবধানে সুষম শিশু বিকাশ প্রকল্প নামে একটি বিশেষ ধরণের শিশু মঙ্গল কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে যদি এই কর্মসূচীকে রূপায়নের সুপরিকল্পিত চেষ্টা হয় তাহলে গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যার বহুলাংশে মীমাংসা হওয়া খুবই সম্ভব। প্রতি দুই হাজার জনসংখ্যায়

যদি একটি নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতি হাজার জনসংখ্যায় অধিবাসীর জন্য একটি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র পরিচালিত হয় এবং এই দুটি সংস্থা যদি অনগ্রসর গ্রাম এলাকায় একযোগে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে তাহলে ঐ এলাকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে অন্য কোন কর্মসূচীর প্রয়োজন করে না। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ও অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন হবে। এ দুটি কমসূচীই পরিচালিত হবে মূলতঃ মহিলা কর্মীদের দ্বারাই অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজেও নিযুক্ত হবে মহিলারা, আর এরা সবাই হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মহিলা শিক্ষয়িত্রীরা সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজ করবে এবং বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কিম্বা সুবিধামত সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এলাকায় যে সব ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন অসুবিধার জন্য সকাল বেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসছে না সেইসব বালক বালিকা নিয়েই শিক্ষকতা করবে। এভাবে শুধু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না এমন সব ছেলেমেয়েদেরই স্বাক্ষর করে তোলা হচ্ছে—সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে শুধু তাই নয়, ঐ সব ছেলেমেয়েদের সমগ্র পরিবারের সঙ্গে একটি গভীর আত্মীয়তার সম্পর্কও গড়ে উঠছে অর্থাৎ স্থানীয় ভিত্তিতে হলেও একটি নতুন ধরণের সমাজ সচেতনতার পরিবেশ বা পরিমণ্ডল সৃষ্টি হচ্ছে—যার ফলে প্রাক বিদ্যালয় পর্ব শিক্ষা, বিধিমুক্ত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা—এই ধরণের শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। এই কাজের সঙ্গে যদি অঙ্গনওয়াদি কেন্দ্রগুলির সুষম শিশু বিকাশের কার্যক্রম যুক্ত হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, পুষ্টি, শিশুকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলার একটি অখণ্ড কর্মোদ্যম গড়ে ওঠে। এই কর্মোদ্যম তখন একটি সর্বপ্রকার অনগ্রসরতার অবসানে গণআন্দোলনের রূপ নেয়, অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের সংগ্রামের এটিই হচ্ছে সঠিক পথ, একমাত্র পথ। কর্মসূচীর সংখ্যা মাত্রা ও আয়তন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ অনগ্রসরতা দূরীকরণের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাদের গ্রাম-উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে

আমরা সকলেই আজ এক ঘোরতর বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে চলেছি। কাজেই উন্নয়ন ও অনগ্রসরতা একই সাথে যেন প্রতিযোগিতা করে চলেছে, ক্রমে পরিস্থিতিতে বিশেষ কোন তারতম্য ঘটছে না, জটিলতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সর্বশেষে এই ব্যাপারে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তার সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন-তা হচ্ছে: আমাদের দেশে যে একটি উন্নত ধরণের গ্রামের কথা ভাবছি এই উন্নয়নের মডেলটি কিরূপ? আমাদের সামনে সহর জীবনের একটি চিত্র অবশ্যই আছে এবং এই সহর জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই প্রভাবিত। সহর জীবন মানেই সভ্য জীবন, গ্রামীণ জীবনের অর্থই হচ্ছে গ্রাম্য জীবন, অনগ্রসর জীবন। কাজেই সাধারণ ধারণায় গ্রামাজীবন হচ্ছে সভ্যতা বিবর্জিত অসভ্য জীবন। এমন একটি উদ্ভট ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই কাজ করছে। সেজন্য দেখা যায় অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সহরবাসের জন্য মানুষের এত ভীড়। সহর জীবনের সঙ্গে সভ্যতা ও আধুনিকতার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—আমাদের বুদ্ধিজীবিদেরই একাংশের অভিমত সেরকমই। সহরে বাস করার বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা অবশ্যই আছে যা আপাতত গ্রাম জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামকে উন্নত করার অর্থ যদি এ হয় যেসব সুযোগ সুবিধা লাভ সহর জীবনে সম্ভব সেই সব সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রামবাসীদের আয়ত্বাধান করে গ্রামগুলিকেও এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে উন্নীত করা, গ্রাম জীবনের যাবতীয় অনগ্রসরতা দূরীকরণের অর্থ যদি গ্রামেই সহর জীবনের পরিবেশ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা তাহলে নিঃসন্দেহে সহর জীবনের মডেলটিই প্রথম জীবনে প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে দেখা যায় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রক্রিয়ার এবং পর্যায়ক্রমে গ্রাম জীবন শেষ পর্যন্ত সহর জীবনেই রূপান্তরিত হয়। সহর জীবনের মডেলটিই যদি গ্রাম জীবনের মডেল হয় তাহলে কালক্রমে গ্রামজীবনের ধারণাটিরও অবলুপ্তি ঘটা সম্ভব। ভারতবর্ষের পাঁচ লক্ষ গ্রাম কোনদিন ক্ষুদ্র পাঁচ লক্ষ সহর

অথবা সব গ্রাম ও সহর মিলিয়ে সারা দেশব্যাপী একটি বিশাল সহর গড়ে উঠবে এরকম কোন জিনিষ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তবু একটি উন্নত গ্রামের সম্ভাব্য মডেলের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অন্ততঃ যারা গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্রতী তাদের সকলেরই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। আজ গ্রামের দারিদ্র্য আছে, বেকারী অন্নবস্ত্রের অভাব আছে.—শিক্ষার অভাব. উপযুক্ত আবাসনের অভাব, নানা কুসংস্কার, জাতপাতের বিচার, নানা ধরণের অবিচার ও শোষণ এ সবই আছে এবং রাতারাতি যে এগুলির পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তাও নয়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই অনগ্রসর জনসমাজের মধ্যে জাগরণ আসবে, নতুন শক্তিরই আবির্ভাব ঘটবে। বর্তমানে গ্রাম-জীবনে আমরা অনগ্রসরতার যে চিত্রটি দেখছি—কালক্রমে বহুলাংশে তার পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় গ্রামের মানুষও সহর-জীবনে লভ্য সুযোগ সুবিধাগুলি অর্জন করবে। প্রশ্ন সেক্ষেত্রে গ্রাম-জীবন কি সেই অবস্থায় তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বিসর্জন দেবে? যদি কিছু পার্থক্য ঘটে তা কি শুধু পরিমাণগত? গুণগতভাবে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সহর-জীবনের কোন মৌলিক পার্থক্য থাকবে না? অনগ্রসরতা ও কুসংস্কারের আর একটি নামই কি গ্রাম্য জীবন? গ্রাম-উন্নয়নের স্বতন্ত্র মডেলের যৌক্তিকতাকে বিচারের এই মানদণ্ডে সেদিন নির্ধারণ করার প্রয়োজন হবে। সহর-জীবনের আকর্ষণ যতই প্রবল হোক না কেন, সভ্যতার একটি মেকি ও ঠুনকো ধ্যান-ধারণার উপরই এই জীবনের দর্শন গড়ে উঠেছে। ঘোর আত্মকেন্দ্রিকতার জালে আবদ্ধ সহর-জীবন, এখানে সুখ আছে, সম্পদ আছে, বিলাসবহুল জীবনের সুযোগ আছে কিন্তু যা নেই এবং থাকা সম্ভব নয় তা হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশ যা কেবল সমষ্টির কল্যাণ-সাধনার মাধ্যমেই সম্ভব; আর এই জীবনলাভের সর্ত হচ্ছেঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। আমাদের দেশে সে সমাজ গড়ে ও টিকে থাকার সম্ভাবনা একমাত্র গ্রামেই, আগামী দিনেও এবং অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে গ্রামগুলি মুক্ত হবার

পরেও। এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা শুধু মানুষে মানুষে তাই নয় সমান ভাবে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কেও। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে গড়ে ওঠে সহর-জীবন। গ্রামই হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন ক্ষেত্র: মানুষের হৃদয়ের ব্যাপ্তি, চিত্তের উর্ধ্বতম অনুভূতির বিকাশ—এই সব মানবীয় গুণগুলি প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ ছাড়া প্রাণশক্তি লাভ করে না। কাজেই গ্রাম উন্নয়নের ধ্যান-ধারণাটি কেবলমাত্র গ্রামীণ অনগ্রসরতা দূরীকরণের বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের ক্রমোন্নয়ন বা বিবর্তনের ধারাটি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রাম সমাজের ক্রমবিকাশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। গ্রাম উন্নয়ন শুধু গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নয়, সেই সঙ্গে একটি বিশেষ মানসিকতার আবাহন, যে মানসিকতার ফলে মানুষ মানুষকে ভালবাসে, সুখ-দুঃখে পরস্পরের অংশীদার হয়। কতকগুলি সুখ-সম্ভোগের দুর্নিবার আকর্ষণে সহরে মানুষ আশ্রয় নেয় সহরবাসী হয়; কিন্তু মানুষের সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি তা গড়ে ওঠাও সম্ভব একমাত্র প্রথমেই সেজন্য গ্রাম সমাজই হচ্ছে মানুষের সভ্যতার মূল প্রাণকেন্দ্র। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমানে গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গ্রাম উন্নয়নের মডেলটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এই প্রয়োজনকে আর কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

দশম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীকরণ একটি অমানবিক প্রবণতা

অর্থ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা এমন কি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আভিজাত্য—এ সবেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে কেন্দ্রীভূত হওয়া। জলের গতি সব সময় নিম্নগামী এবং মহাসমুদ্রে মিলনের মধ্যেই তার শেষ পরিণতি ও চরম সার্থকতা; কিন্তু অর্থ, ক্ষমতা, পদ মর্যাদা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আভিজাত্য যা নিয়ে মানুষের গৌরব ও যার ভিত্তিতে তারা বিশিষ্টতা দাবী করে—এগুলি কিন্তু সব সময় বিপরীতমুখী ও ঊর্ধ্বগামী এবং বহুর সান্নিধ্যকে বর্জন করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকারের মধ্যে সীমায়িত হয়। এর ফলে সমষ্টির বিকাশ ব্যাহত হয়, সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়ে, মানুষের সভ্যতার ধারা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু এই প্রবণতার নিয়ামক শক্তি কিন্তু এই মানুষ নিজেই সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর তা জেনেও মানুষ এই অশুভ প্রবণতার শিকার হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা ধারাবাহিক ভাবেই ঘটে আসছে। কাজেই কেন্দ্রীকরণের সমস্যাটি নিয়ে আজ যে পৃথিবীর সর্বত্র দারুণ উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা কোন অধুনা ঘটনা নয়, আকস্মিক ঘটনাও নয়; আর সেজন্য এটি কোন শাশ্বত ঘটনাও নয়। কেননা অর্থ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, শিক্ষা-সংস্কৃতি—বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হলে তা বহুর বা সমষ্টির স্বার্থকে বিপন্ন করেই সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে সমাজের ব্যাপক অংশ মানুষ বেশিদিন মুষ্টিমেয়ের এই আগ্রাসী মনোভাব ও আচরণকে মেনে নেয় না। একটি দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ইতিহাস। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার কখনও মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে, আবার কখনও একটি সমন্বয়ের পথে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মীমাংসা হয়েছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এভাবেই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সুদূর অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে আমরা আজ যে সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার বাতাবরণে বাস করছি—বলছি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সভ্যতা ও আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার জন্মস্থল কিন্তু ইউরোপ ও পাশ্চাত্য দেশ এবং এদের জন্মকাল চারশো বছরের বেশি নয়। এই চারশো বছর আগের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে এই পৃথিবীর ছবিটি কি রকম ছিল তাতো আমাদের একেবারে বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। কোথাও ছিল রাজতন্ত্র, কোথাও ছিল সমাজতন্ত্র, আবার কোথাও চার্চতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বা অনুরূপ কোন মৌলতন্ত্র। এই সব তন্ত্রের স্বরূপটি কিন্তু প্রায় অভিন্ন ছিল অর্থাৎ সমাজ পরিচালনা করার যা কিছু ক্ষমতা, অর্থ, পদমর্যাদা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি হয় মুষ্টিমেয় রাজ পরিবার কিম্বা ভূস্বামীবর্গ, কিম্বা ধর্ম যাজক, পুরোহিত শ্রেণী কিম্বা ঐ ধরণের কোন ধর্মীয় অনুশাসকদের হাতেই কেন্দ্রভূত হয়েছিল। আর এই সব মুষ্টিমেয় শাসক ও অনুশাসকদের প্রভাব ও দাপট এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের কোন মর্যাদা ছিল না। শুধু তাই নয়, তারা অধিকাংশই এক অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যেই বাস করতো; সমাজের যাবতীয় ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদক হয়েও তাদের নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যেই কাটাতে হতো। কোন রকমের শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগতো ছিলই না, বলা যায় মানুষ হয়ে জন্মলাভ করেও প্রায় পশুর জীবন যাপন করতো। কিন্তু সে যুগে কি দেশে অর্থ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, তথাকথিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কি কোন অভাব ছিল? না অভাব ছিল না। ছিল সবই প্রচুর পরিমাণে; কিন্তু তা সবই ছিল মুষ্টিমেয়ের করায়ত্বে, তাদের সীমাহীন ভোগবাসনার চরিতার্থে, বিপুল সংখ্যক মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশে, প্রয়োজনে মানুষের সভ্যতার স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই দুদিন চলেছিল প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরে। এই দীর্ঘ অন্ধকার যুগকে একজন সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় যদি সঠিক ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলতে হয় সমগ্র সমাজের যাবতীয়

প্রয়োজনীয় উপাদানের কেন্দ্রীকরণ—Concentration of all resources of social development in the grip of a few or country. আর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীচক্রের প্রতিনিধি হচ্ছে—সেদিনের বিভিন্ন দেশের রাজা, মহারাজা ও ভূস্বামীকুল কিম্বা ধর্মযাজক পুরোহিতবৃন্দ। এই অন্ধকার যুগের অবমানের দাবী নিয়েই একদিন শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, আর এই বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অনুষংগ হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছিল—স্বাধীনতা, সাম্য উদাত্ত আয়োজন নিয়ে। এতো মাত্র তুশো বছর আগেকার কাহিনী, সকলেরই জানা। এই যে সমাজ বিপ্লব বা সামাজিক পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটানোর জন্য সারা ইউরোপ ব্যাপী যে আন্দোলন ও বিপুল আলোড়ন, সেই আলোড়ন ও আন্দোলনের মূল বক্তব্য তো ছিল একটিই, তা হচ্ছে—দেশের যা কিছু সম্পদ ও গোটা সমাজকে উন্নত করার যা কিছু উপাদান তাকে মুষ্টিমেয়ের হাতে কুক্ষিগত ও কেন্দ্রীভূত করতে দেওয়া হবে না বরং এভাবে সমষ্টির স্বার্থ ও বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রাখা চলবে না—সকলের জন্য চাই সমান সুযোগ ও অধিকার —সে সুযোগ ক্ষমতা, অর্থ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুর, গণতন্ত্রের, প্রতিটি ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের; সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটবে, যুগযুগ ব্যাপী যে সব অন্ধ কুসংস্কার মানুষের অগ্রগতির পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার অবসান হবে। দেশের শাসন ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠবে এবং কোন নীতিতে পরিচালিত হবে—বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবে বহুদিনের পুরোনো জরাজীর্ণ মানব সমাজের সম্মুখে একটি উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা ও জীবন যাপনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, একটি নতুন সভ্যতার জন্ম হবে—এই ছিল এই নতুন বিপ্লব ও সমাজ রূপান্তরের মর্মবাণী, যা পাশ্চাত্য সভ্যতা নামে পৃথিবীর সব দেশের মান, ধ্যান-ধারণাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদানকে আমাদেরও লঘু করে দেখা উচিত নয়। আমাদের দেশে যে নব-জাগরণের সূত্রপাত তার মূলেও এই পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান যে বহুলাংশে ক্রিয়াশীল ছিল

এবং আজও আছে. কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের চাপে এই সত্যকে যেন অস্বীকার না করি। এই সভ্যতার অবদানকে সম্যক বুঝতে বা প্রয়োগ পদ্ধতিতে যদি কোন ভুল করে থাকি সে বিচ্যুতি তো আমাদের —তাই তার সংশোধনের দায় দায়িত্বও আমাদেরই।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবে যুগে সারা পৃথিবীব্যাপী যে নূতন যুগের সূচনা হয়েছে যাকে আমরা আধুনিক যন্ত্র যুগ বা বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগ বলে বলছি, এই যুগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে এক—বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কারখানার জন্ম ও প্রসার ঘটেছে, দুই—বড় বড় সহর ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তিন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, চার—ভোগ্য বস্তুর সংখ্যা ও ব্যবহারিক মনের বৃদ্ধি ঘটেছে, পাঁচ—যান-বাহন ও সড়ক ও সমুদ্র ও আকাশপথে যাতায়াতের ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, ছয়—শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং সাত—রেডিও, টিভি, কম্পিউটারের আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে একদিকে যেমন দেশ-বিদেশের মানুষের সংগে যোগাযোগ সহজ হয়েছে তেমনি বহু সময়সাপেক্ষ জটিল ব্যাপারের সহজ সমাধান সম্ভব হচ্ছে; এমনকি মানুষ এই গ্রহান্তরেও যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারছে। পৃথিবী আরও নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে এই যন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক যুগের নানা আশ্চর্যজনক অবদানে। শুধু ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে নয়, এই যুগে সারা পৃথিবীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। পুরানো গ্রাম কিম্বা উপজাতি can and tribes ভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রিয় শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন চালু ছিল, যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা বা লক্ষ্যই ছিল বিশেষ এলাকার আইন ও অনুশাসন, তার পরিবর্তে আজ পৃথিবীর সর্বত্র, সর্ব দেশেই ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার গঠন, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে, আইনসভার মাধ্যমে সৃষ্ট আইনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে প্রতিটি দেশের শাসন ব্যবস্থা ও শাসন কার্য। এটি যে উন্নত ধরণের ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর

মানুষের জীবনে শিল্পোত্তর যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান তা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র যে একই সময়ে এই রূপান্তর ঘটেছে তা নয়; তিনশো বছর ধরে নানা সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই বিবর্তন চলেছে—আজও সেই ধারা সমানভাবে প্রবাহমান। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র—এই দুটি মৌল দাবীর উপর ভিত্তি করেই চলেছে এই বিবর্তন—প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে, দেশ ও সমাজের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমাজ জীবন এবং সম্পদ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব আজ আর পুরানো যুগের কোন রাজন্য-বর্গের উপর নয়, ভূস্বামীগোষ্ঠীর উপর নয়, যাজক সম্প্রদায়ের উপরও নয়। এদের স্থান অধিকার করেছে আর এক নতুন ধরণের শক্তি ও সংগঠন—রাজনৈতিক দল বা সংস্থা। বর্তমান যন্ত্র ও বিজ্ঞানভিত্তিক যে আধুনিক রাষ্ট্রীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার মূল পরিচালিত শক্তি হচ্ছে এই রাজনৈতিক দলগুলি। এই রাজনৈতিক দলের নীতিই সব দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে। শিল্পকারখানার মালিক ও ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ধনসম্পদ সৃষ্টি করার মূল চাবিকাঠি তাদেরই করায়ত্ব; সেজন্য রাজনীতির নীতি নির্ধারণে ও রাজনৈতিক দলগুলিকে আচরণ নিয়ন্ত্রণে এই সব শিল্প-মালিক, ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব অনস্বীকার্য কিন্তু সে প্রভাব ও আজ আর কোন ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ নয়। শিল্প বিপ্লবের জন্ম ও সূচনা পর্ব থেকে নানা সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে এবং আজও ঘটছে সে বিবর্তনের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করা বা বিশ্লেষণ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শিল্প-কারখানার আবির্ভাব ও প্রসারের সংগে পুঁজিপতিদের যেন আবির্ভাব ঘটেছে: তেমনই শ্রমিক শ্রেণীর, উদ্ভব হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য মুনাফা থেকে নূতন পুঁজির সৃষ্টি ও উৎপাদনী ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন। কাঁচা মাল সংগ্রহ ও উন্নপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য অন্য দেশের স্বাধীনতা

হরণ ও উপনিবেশ স্থাপন, পণ্য বিক্রীর জন্য বাজার দখলকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধ, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দেশের জন্ম ও দুটি ভিন্নমুখী নীতির মধ্যে সংঘাত ও প্রতিযোগিতা, পৃথিবী ব্যাপী অনগ্রসর ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতালাভ, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ বা সংঘর্ষের প্রসার এবং এই কাজে পৃথিবীর বিপুল সম্পদের অপব্যবহার, পৃথিবীর কোন কোন দেশে বিস্ময়কর প্রাচুর্য ও বিশাল সম্পদের অমানবিক অপচয়, অন্যত্র কোটি কোটি মানুষের পর্বতপ্রমাণ দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা, বাজার অর্থনীতির প্রভাব, উন্নত মানের জীবন যাত্রার জন্য মানুষের উগ্র কামনা ও হিংস্র প্রতিযোগিতা এবং দেশে দেশে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দূষিত আবহাওয়া, মানবিক মূল্যবোধের অভাব, পরিবেশ দূষণের আতঙ্ক এক দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্য নূতন আবিষ্কার ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা অন্যদিকে প্রাচুর্যের মধ্যেই পৃথিবীর আর এক বিপুল অংশে নিদারুণ দারিদ্র্য, বেকারী, শিক্ষার অভাব, অবিচার ও শোষণ—এই ধরণের একটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই আমরা লক্ষ্য করি। এই বৈপরীত্যের মধ্যেই পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের বিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। এই বিবর্তনের ধারা সব সময় যে মূল ধারাকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছে তাও নয়। একই ধারা থেকে বিভিন্ন উপধারাও সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, বিচ্ছেদ ও মিলনের ঘটনায় ভরা এই বিবর্তনের ইতিহাস। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনের যেমন এই সময়ে অভিনব ও বিস্ময়কর সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহু জ্ঞানী-গুণী মনীষী ও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি এই সময়ে যে ধ্বংস লীলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, কত পশু শক্তির হিংস্র কর্মকাণ্ডে পৃথিবী কম্পিত হয়েছে তার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। কাজেই আধুনিক যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার এই দিক যেমন মহাগৌরবের, অন্যদিকে তেমনি মহাদুঃখের ও দুরপনেয় কলংকের। এই সভ্যতাকে নিয়ে আমরা অবিমিশ্র আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি না। তাই বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের

ক্ষেত্রে কোন একপেশে ধারণা বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া ঠিক হবে না ; বাস্তবতাকে সঠিক অনুধাবন করেই সমস্যার চরিত্রটির স্বরূপ বুঝতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডও ব্যবহার করা যায় এবং তা হচ্ছেও। কিন্তু সমস্ত রকমের পর্যালোচনার পরও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যেখানে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই তা হচ্ছে চারশো বছরের আগে এবং প্রাক শিল্প বিপ্লবের যুগে পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে চরিত্রটি ছিল তার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি ; যদি কিছু হয়ে থাকে, তা নিতান্ত বাহ্যিক ও একেবারে প্রান্তিক (marginal)। অভাব, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, শোষণ ও বঞ্চনা এবং দেশের সমস্ত সম্পদ ও শক্তির মালিকানা মুষ্টিমেয়র হাতে কুক্ষিগত হওয়া ও সেই সম্পদ ও শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার—এই যদি সে দিনের বিশ্বপরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র বলে নিন্দিত হয়ে থাকে এবং সেই কারণেই তার পরিবর্তন জরুরী হয়ে ওঠে থাকে—তাহলে বিগত কয়েক শতাব্দীর বহু পরিবর্তন, বহু অগ্রগতি, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও কি আজ আমরা দাবী করতে পারি যে সেই প্রাক্‌শিল্প বিপ্লবের অন্ধকারময় যুগের সমস্যাগুলি থেকে আজকের মানব সমাজ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছে। শিল্প-কারখনার বিরাট প্রসার ঘটেছে, ভোগ্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের একাংশের জীবনযাত্রার মানও বহুলাংশে উন্নত হয়েছে আর এসবই ঘটেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ও প্রয়োগের ফলে। কিন্তু এতো বিশ্বপরিস্থিতির এক দিকের চিত্র ; কিন্তু বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও দেখা যায় এখনও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং নূন্যতম শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতার শিকার। এটি তো বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির আর একটি চিত্র। একদিকে যেমন লক্ষ্য করলে সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা, সাহিত্য, শিল্প দর্শন

ও বৌদ্ধিক চিন্তার প্রসার, তেমনি লক্ষ্য করা যাচ্ছে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা মানব জীবনে একটি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা বা সভ্যতার আবির্ভাব ঘটিয়েছে এই দাবীকে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির আর একটি বড় দুর্লক্ষণ হচ্ছে যে বহু বিভিন্নতা ও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও নানা দেশ, নানা জাতি, নানা ধর্ম ও ভাষার মানুষকে আত্মীয় সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পারে যে সব সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ সেগুলির চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটছে। ভোগের উপাদানগুলি ক্রমশই মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত হচ্ছে; ক্ষমতা, অর্থ, উৎপাদনী ব্যবস্থার উৎস ও শক্তি এবং গোটা মানুষের সমাজকে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রাস করে নিয়েছে এমন এক শক্তি যাকে প্রতিহত করার কোন অধিকার বা সুযোগই থাকছে না বৃহত্তর জনসমষ্টির। আর এই মুষ্টিমেয়ের নিয়ন্ত্রণ গোটা মানব সমাজের বুকে চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মত গণতন্ত্রের নামে, সংসদীয় রাষ্ট্র কাঠামোর মাধ্যমে আবার কোথাও নিরঙ্কুশ জংগী শাসনে। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে কার্যতঃ অস্বীকার করা বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির আর একটি দুর্দৈব ঘটনা। কাজেই কি মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, কি মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্পোত্তর যুগের যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত বিশ্বমানব সমাজে কোন মূলগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিম্বা সেই সাধন পর্বের দিকে পদক্ষেপ করছে তা আদৌ বলা যায় না। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এটাই যদি কোন বিচারের মানদণ্ডের হয় তাহলে এই সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয় যে সেই অন্ধকার যুগেও যারা ছিল নীচুতলার শোষিত অনগ্রসর মানুষ, মানুষ হিসাবে তারা বর্তমানের উন্নতমানের মানুষের তুলনায় এতটা অনগ্রসর ও অনুন্নত মানের মানুষ ছিল না। এটা ঠিকই, আজকের তুলনায় জীবনযাত্রার মানদণ্ডে তাদের অবস্থান ছিল অনেক পিছনে; কিন্তু যেহেতু প্রয়োজনের অনুভূতি ছিল তুলনামূলক ভাবে অনেক স্বল্প ও সীমিত, সেজন্য তাদের

অভাবজনিত বেদনা বোধও এখনকার মত এত তীব্র ও উগ্র হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। আজকের মানুষ উন্নতমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সুযোগ লাভের জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত—এই মানবিক দাসত্ব ও হীনতাকে স্বেচ্ছায় সেদিনের মানুষ স্বীকার করে নেয়নি। তাছাড়া অভাব ও অনগ্রসরতার মধ্যেও তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব তারা নিজেরাই বহন করতো, আজকের মানুষের মতো তারা সর্ব ব্যাপারে রাষ্ট্র অথবা সরকার কিম্বা বিদেশী কোন শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল না। বর্তমান অবস্থা তো আর এক ধরণের দাসত্ব; আর এ দাসত্ব তো আরো নিকৃষ্ট ধরণের। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সংগে যদি জীবনের মানের উন্নয়নের সংগতি না থাকে তাহলে সে জীবন আদর্শভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হতে বাধ্য। আজ সমাজ জীবনের মানের সর্বস্তরের যে অবক্ষয় তার মৌল কারণটি বর্তমান শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক সভ্যতা বা সমাজ ব্যবস্থা যে দূর করতে পারেনি শুধু তাই নয়, এই সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকেই সেই কারণটি জন্ম লাভ করেছে এবং ক্রমশই শক্তি লাভ হচ্ছে তাও আমাদের বুঝতে হবে। সেজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনে বৃহত্তর জনসমষ্টির ভূমিকার প্রসঙ্গটি না এসে পারে না

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি আজ এমনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত ও অবিচ্ছেদ্য যে কোন একটি নীতির সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা চলে না। আবার কোন বিশেষ বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এই তিনটি নীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করাও যায় না এবং তার ভিত্তিতে এই নীতি তিনটির ফলাফলও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে না। বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও শিল্প বিপ্লবোত্তর যে আধুনিক মানব সমাজ তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু অবশ্যই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। কোন কোন সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে যেহেতু অর্থনীতিই বর্তমানে মানুষের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে, কাজেই সমাজে সম্পদ সৃষ্টি করা ও নিয়ন্ত্রণ

করার শক্তি ও সুযোগের অধিকারী যারা তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ামক শক্তি। এই অর্থে তাদের অভিমত অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পপতি ও কলকারখানার মালিক ও এদের সহকারী ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই পৃথিবীর সব দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছে, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও পরোক্ষে। এই অভিমতের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তবুও ঘটনাটি আংশিক সত্য, যোল আনা সত্য নয়। মানুষের সমাজ জীবন ও দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আজ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে রাজনীতি, আর রাজনীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করছে অর্থনীতি সেজন্য রাজনীতি ও অর্থনীতি নিরপেক্ষ নয়। আবার রাজনীতি বা অর্থনীতি—এই উভয়ের মূলে আছে মানুষের স্বার্থ, মানুষের প্রয়োজন। আর সে মানুষ কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায় কিম্বা কোন একটি দেশ বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই মানুষের ভাবনা আছে, প্রয়োজনের অনুভূতি আছে, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা আছে। এই মানুষেরাই যা কিছু সৃষ্টির মূল শক্তি; বিবর্তনের ধারাকে এই মানুষই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত বিপ্লবী পরিবর্তনের আসল শক্তিও এই মানুষ। পৃথিবীর যে শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি, পর্যালোচনা করছি, বিচার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করছি এই আধুনিক যুগের প্রবর্তকও এই মানুষ। এই মানুষ কিন্তু কোন খণ্ডিত মানুষ নয়, বিশেষ স্বার্থ বা সম্প্রদায়ের বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ মানুষ নয়, সব সময় ও সর্বত্র এই মানুষের একটি দ্বৈত চরিত্র আছে, কাজেই দ্বৈত ভূমিকাও আছে। শিল্প-কারখানা ও পণ্যদ্রব্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করছে যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অথবা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিচালিত করছে যে রাজনীতিক দল ও ব্যক্তিরা এরা সমগ্র মানব সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, সমগ্র মানব সমাজ নয়। এদের কারো স্বার্থ মুনাফা ও পুঁজির পরিমাণকে স্ফীত করা, ব্যক্তি ও শ্রেণী স্বার্থে এই পুঁজিকে ব্যবহার করা, সমগ্র মানব সমাজের উপর তাদের অনুসৃত কার্যের

ফলাফল যাই হোক না কেন। আবার কারো স্বার্থ—রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত স্তর বা বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা এবং এইভাবে শাসন ব্যবস্থার উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে আইনসভা ও সেনাবাহিনীর অনুশাসনে ও শাসনে দেশের উৎপাদনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা এবং সমস্ত সামাজিক শক্তিকে দেশ ও জাতির স্বার্থের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যক্তি পুঁজির অবাধ প্রসারকে সংকুচিত করা। কিন্তু সামাজিক শক্তি হিসাবে মানুষ সর্বত্রই ক্রিয়াশীল ও বিবর্তনমুখী; এই যে মানুষ এই মানুষ অখণ্ড ও সার্বজনীন বিশেষ পটভূমিকায়, ক্ষেত্র ও স্থান বিশেষে এই মানুষের জাগরণ ঘটে ভাষা, সম্প্রদায়, ধর্ম ও জাতিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে, কিন্তু এই জাগরণ ও আন্দোলনের চরম সমাপ্তি ঘটে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ কৃতিতে। অবশ্য এই পরিবর্তন কোন সহজ ও সরল পথে চলে না; বিবর্তনের ধারায় নানা জটিলতা ও অঘটনের উদ্ভব হয়ে থাকে, দেশের রাজনীতি অনেক সময়েই এই পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সামাজিক শক্তি হিসাবে মানুষের বিবর্তনের পথটিকে বিঘ্নিত করাই হচ্ছে শিল্পপতি ও ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু সামাজিক শক্তি হিসাবে অখণ্ড মানব সমাজেরও একটি ধর্ম আছে; সে ধর্ম হচ্ছে: প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, সমস্ত রকমের হীনমন্যতা ও দাসত্ব মুক্ত সমাজ গঠন, একটি সার্বজনীন সুস্থ মানব সমাজ গড়ে তোলা। কিন্তু এই ধরণের একটি পরিস্থিতি কোনদিন পৃথিবীতে গড়ে ওঠা সম্ভব তা যদি অনেকের পক্ষে ষোল আনা বিশ্বাস করা সম্ভব নাও হয় তাহলে তা নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন; আর সে বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। চারশো বছর আগে পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে কাটিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ যদি আজকের অবস্থায় এসে উপনীত হতে পারে তাহলে আজকের পরিস্থিতির মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা, যা বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে তাকে সংশোধন করে অথবা তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ একটি সুস্থ ও কল্যাণকর মানব সমাজ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবে না—এই ধরণের

সমাজ বিবর্তন-বিরোধী ধ্যান ধারণার অসহায় শিকার হওয়ার কোন যুক্তি নেই। এ শুধু ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই মানুষকে এই নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হতেই হবে। সামাজিক শক্তি হিসাবে মানুষ সর্বত্র ও সব সময় ক্রিয়াশীল ও বিবর্তনমুখী—এর অর্থ এ নয় যে একটি নতুন ধরণের সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য এই মানুষের পক্ষে যতটা ক্রিয়াশীল ও সচেতনভাবে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন সব সময় ও সর্বত্র এই মানুষ ততটাই ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনে উদ্যোগী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ক্রিয়াশীলতা ও উদ্যোগ অত্যন্ত মন্থর ও দুর্বল—এই সত্যটিকেও আমাদের বুঝতে হবে। এরজন্য একটি বিশেষ বাতাবরণ বা প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠা দরকার। শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগে প্রথমে ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে কম বেশি সব দেশে যে শিল্প-কারখানার প্রসার ঘটেছে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যেভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে সমগ্র উৎপাদনী ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনার চেষ্টা হচ্ছে, গ্রামীণ শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে বড় বড় পণ্যের বাজার ও সহর গড়ে উঠছে—যেখানে উৎপাদকের সংগে উৎপাদনী বস্তুর কোন সম্পর্কই থাকছে না, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বত্র চলেছে অসম ও হিংস্র প্রতিযোগিতা, এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় দেশ গঠন ও সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনা ও রূপায়নে ব্যাপক জনসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা সম্ভব নয়; সব ব্যাপারেই জনসাধারণের ভূমিকা মূলতঃ অসহায় গ্রহীতার, পরনির্ভরশীল ও আত্মপ্রত্যয়হীন। এই বাতাবরণে যদি তাদের অবস্থান হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি তাদের মধ্যে থেকে সেই ক্রিয়াশীল ও উদ্যোগী মনুষ্য শক্তির আশা করিতে পারি? সেজন্য প্রয়োজন এই বাতাবরণের পরিবর্তন আনা, যে বাতাবরণে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জানতে পারবে, সামাজিক শক্তি হিসাবে সে নিজেকে বুঝতে পারবে, আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে। এই উপযোগী বাতাবরণের স্বরূপটি কি এবং তা কিভাবে আসা সম্ভব—

এটিই হচ্ছে বর্তমানে সমাজ সংগঠক, সমাজসেবী কর্মীদের কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও অনুশীলনের বিষয়। শিল্প কারখানার বিপুল প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কার ও জয়যাত্রা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষের জীবনের যে সব প্রাথমিক সমস্যাগুলি ছিল যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন প্রভৃতির অভাব, আজও এগুলির সুষ্ঠু সমাধান হয়নি তার কারণ এ নয় যে এই সব অভাবগুলি দূর করার মত পৃথিবীতে যথেষ্ট সম্পদ সৃষ্টি করা যায় নি। সৃষ্ট সম্পদের যথেষ্ট ও বেপরোয়া ব্যবহারই যে এই অভাবগুলিকে পিছিয়ে রেখেছে এবং একটি বিশেষ স্বার্থেই এই অবস্থাকে অব্যাহত রাখা হচ্ছে তা সহজেই বোঝা যায়। এই ব্যাপারে অর্থনীতি ও রাজনীতির একটি অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে পৃথিবীর সব চেয়ে উন্নত ও সম্পদশালী দেশ আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা যুদ্ধের অস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম তৈরী করা এবং এই যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্যয় বরাদ্দ বাবদ যে অর্থ একটি বছরে ব্যয় করে সেই পরিমিত অর্থে আমাদের মত একটি বৃহৎ দেশের একটি গোটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। আবার শুধু অর্থের পরিমাণ দিয়ে কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হচ্ছে তার সঠিক পরিমাণও করা যায় না। যে শিল্প-কারখানা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এই যুদ্ধের অস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে তার মূল্য কি কোন অর্থের অংকে হিসাব করা চলে? সব নিয়ে এই যে বিপুল সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এটি কি সত্যই সম্পদের কোন সদ্ব্যবহার ও সাধারণ মানুষের সুখ শান্তি নিরাপত্তার সংগে কি এই যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন সম্পর্ক আছে, না এই যুদ্ধ প্রস্তুতির পেছনে পৃথিবীর কোন দেশের এমন কি আমেরিকার সাধারণ অধিবাসীদের কোন সমর্থন থাকা সম্ভব? এই যে বিপুল সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার না করে যদি এই সম্পদকে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, আবাসনের অভাব দূর করার কাজে ব্যবহার করা হতো তাহলে পৃথিবী ব্যাপী এই যে অভাবের চিত্রটি আজ আমরা লক্ষ্য করছি তার কি আমূল রূপান্তর ঘটানো যেত না? শুধু আমেরিকা

নয়, পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশেই রাষ্ট্র নায়কগণ স্বদেশের সৃষ্ট সংগৃহীত সম্পদের একটি সিংহভাগ দেশের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য বরাদ্দ করে চলেছে। এইভাবে জাতীয় সম্পদের যে ব্যবহার হচ্ছে যুক্তি তার যাই থাক না কেন—তাতো অস্বীকার করা যায় না। তাহলে মানুষের জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলি দূর করা যাচ্ছে না, কারণ সম্পদের অভাব ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও উৎপন্ন দ্রব্য ও ভোগ্যবস্তুতে প্রকৃত উৎপাদকের যে সত্যতার কোন অধিকার থাকে না—এ যুগের এও আর একটি অদ্ভুত হলেও বাস্তব ঘটনা। মানুষের প্রয়োজন পূরণের ভিত্তিতে আজ আর কোন দেশেই শিক্ষা ও কৃষিতে উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত হচ্ছে না, হচ্ছে বাজারের পণ্য হিসাবে, অর্থ উপার্জনের পরোক্ষ মুনাফার দৃষ্টিকোণ থেকে। তা যদি হয়, তাহলে আমাদের মত অনগ্রসর ও তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের মৌল প্রয়োজন-গুলি কোনদিনই সর্বৈব পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করে উৎপন্ন দ্রব্য বেশি বেশি করে বিদেশে রপ্তানি বাড়াতে হবে, শিল্পোন্নত দেশগুলির স্বার্থে বিদেশী মুদ্রার যে ঘাটতি পড়েছে—তা পূরণ করতে হবে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেনের ব্যাপারে একটি ভারসাম্য আনা প্রয়োজন, বিদেশে আমাদের ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে এই রকম একটি কথা আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনে থাকি এই যে আমদানী রপ্তানির অর্থনীতি যা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে—এই অর্থনীতির সংগে আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের যে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যে সমস্যা —এই সব সমস্যার কি কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল? আমরা কি বিদেশের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়েও আমাদের দেশে যে সম্পদ ছিল বা আজও আছে তার পুরো সদ্ব্যবহার করে এই সমস্যাগুলির কি সন্তোষজনক সমাধান করতে পারতাম না—বা আজও পারা যায় না? অবশ্যই পারা যায়। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, তার কারণ: দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ

রাষ্ট্রনায়কেরা পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত হলো—দেশের ভিতরে যে সম্পদ আছে—তার সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার করে একটি স্বাবলম্বী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হলো না—কেননা তাদের বিকাশের ধ্যান-ধারণাটির উৎসটি হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতির ধ্যান ধারণা। এই ধ্যান-ধারণার ভিত্তি হচ্ছে—গ্রামীণ কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে বৃহৎ ও ভারী শিল্প-কারখানার প্রসার ঘটানো, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে ভোগ্যবস্তুকে বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত করা, গ্রামকে ধ্বংস করে শিল্পনগরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের বড় বড় কেন্দ্র তৈরী করা, আমদানী রপ্তানী এই আর্থিক লেনদেনের মারফৎ বিদেশী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংগে প্রতিযোগিতায় নামা এবং এ সবের মাধ্যমে উন্নত ধরণের জীবন যাত্রার নামে একটি নতুন ভোগবাদী জীবন দর্শনের পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে কোথাও গণতন্ত্রের নামে, কোথাও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার নামে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো তাতে সাধারণ মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজনের অনুভূতির নিরিখে, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সমাজ ব্যবস্থা নানা ভাঙাগড়ার মধ্যেও এতদিন চালু ছিল তার সমূলে বিনাশ ঘটলো যা ছিল মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক সমাজ, সেই সমাজের স্থান গ্রহণ করলো এক একটি বৃহৎ রাষ্ট্র ; আর এই রাষ্ট্রের মাধ্যমেই আজ সারা পৃথিবীর রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এখানে ব্যক্তি মানুষের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের যে কথা বলা হয় এবং এই সরকারের নীতি ও কর্মসূচী সেই দেশেরই জনসাধারণের ইচ্ছার ও অভিমতের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয় বলে যে দাবী করা হয় তা যে নিছক একটি প্রহসন ও প্রবঞ্চনা তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রকৃত অর্থে কোন দেশেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি এবং যে খাতে আজ সব দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রবাহিত হচ্ছে তার গতি ফেরাতে না

পারলে জনসাধারণের ভূমিকা সর্বত্রই অস্বীকৃত থেকে যাবেই। আধুনিক সভ্যতার ধ্যান-ধারণায় রাজনীতি ও অর্থনীতির একটি অশুভ মেলবন্ধন ঘটে গেছে; আর এই অর্থনীতি ও রাজনীতির লক্ষ্যই হচ্ছে—দেশের যা কিছু ক্ষমতা ও সম্পদ তা মুষ্টিমেয়ের মধ্যে মুষ্টিগত করা, চূড়ান্ত ভাবে কেন্দ্রীভূত করা—কেন্দ্রীকরণ করা। অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকৃত সমাজব্যবস্থা। বিকেন্দ্রীকরণ কোন অনগ্রসর সমাজতত্ত্বের ধারণা নয়; সামাজিক শক্তি হিসাবে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সহজতম সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সর্বাধুনিক ও শ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা এটি। এই ধারণা একাধারে বৈজ্ঞানিক ও মানবিক। এখানে সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, শোষণ ও বঞ্চনার কোন স্থান নেই; এখানে ক্ষমতা ও সম্পদকে নিয়ে নেই কোন হিংস্র অসম প্রতিযোগিতা; এখানে প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের প্রতিবন্ধী নয়, একে অপরের পরিপূরক।

শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত আমাদের সামনে তিনটি প্রধান সমাজ ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এই তিনটি সমাজ ব্যবস্থারই উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা, সাফল্য ও অসাফল্য নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেছে এবং এই তিনটি সমাজ ব্যবস্থারই সীমাবদ্ধতা কতখানি তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। এই তিনটি সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এই তিনটি সমাজব্যবস্থাতেই মানুষের জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলি পূরণের সমস্যাটি অমীমাংসিত থেকেই গেছে, গণতন্ত্রের সার্থক বিকাশ কোথাও সম্ভব হয়নি। দেখা গেছে প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থাতেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা মুষ্টিমেয়ের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং মুষ্টিমেয়ের প্রয়োজন ও স্বার্থেই সমগ্র মানবসমাজ পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষমতা ও সুযোগের কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে শোষণ, অবিচার, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, বিভেদ ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিকল্প

হিসাবে যদি বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বটি আমাদের সামনে অনিবার্যভাবে এসে থাকে তাহলে এই বিকেন্দ্রীকরণের সমাজ কাঠামো বা সামাজিক রূপটি কি হবে তার একটি সাধারণ রূপরেখা বা মডেল কি হতে পারে—তার একটি ধারণা গড়ে তোলা অবশ্যই প্রয়োজন হবে। বিকেন্দ্রীকৃত সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রবর্তক হিসাবে আমরা গান্ধীজীকে গ্রহণ করতে পারি। গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের যে ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনা তার মধ্যেই তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থার একটি রূপরেখা পাই। এই রূপরেখাটিকে যদি বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থার একটি মডেল হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে বিষয়টি আমাদের পক্ষে বোঝা ও অপরকে বোঝানো অনেক সহজ হয়ে যাবে। গ্রাম-স্বরাজের রূপরেখা উপস্থিত করতে গিয়ে গান্ধীজি লিখছেন, "গ্রামীণ স্বরাজ বলতে আমি এক স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বুঝি। জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন-পূর্তির ব্যাপারে এই গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র তার প্রতিবেশী গ্রামগুলির উপর নির্ভরশীল হবে না। তবে অন্য যে সমস্ত ব্যাপারে পরস্পরাবলম্বন প্রয়োজন তার স্থান এতে থাকবে। অতএব প্রতিটি গ্রামবাসীর কর্তব্য হবে নিজেদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এবং বস্ত্রের জন্য তুলার চাষ করা।......এ সবের ব্যবস্থা করার পর জমি উদ্বৃত্ত থাকলে উপকারী অর্থকরী শস্যের আবাদ করা যেতে পারে। তবে গাঁজা, তামাক, আফিম এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিষের চাষ করা চলবে না। গ্রামবাসীদের নিজস্ব বিদ্যালয়, রঙ্গমঞ্চ ও সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী সাধারণ ভবন থাকবে। গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। পুষ্করিণী এবং ইঁদারা সুরক্ষিত করে এ কার্যে সফলতা লাভ সম্ভব। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের অন্তিম পর্যায় শিক্ষা আবশ্যিক হবে। গ্রামের কার্যকলাপ যথাসম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামরক্ষী বাহিনীতে কাজ করতে হবে।... গ্রামের শাসনকার্য চালাবে পাঁচজনের একটি পঞ্চায়েত এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীর দ্বারা তাঁদের বাৎসরিক নির্বাচন

হবে (হরিজন—২৬. ৭. ৪২)।" নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখা ও ভাষণের মধ্যে গান্ধীজী তার গ্রামস্বরাজের ধারণা ও বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকাঠামোটি কি হবে তা ব্যাখ্যা করেছেন, তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর এই প্রক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির মধ্যেই গান্ধীজির উপলব্ধ বিকেন্দ্রীকৃত সমাজব্যবস্থার একটি ছবি আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। দেশের সর্বত্র প্রতি গ্রামেই তিনি কৃষি জমিতে খাদ্য শস্য উৎপাদন ও তুলার চাষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছেন। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামবাসীরা তাদের নিজেদের ভরণপোষণের জন্য অন্যস্থান থেকে সরবরাহের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকুক—গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজে বা বিকেন্দ্রীসমাজ ব্যবস্থায় খাদ্যবস্ত্রের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীলতার কোন স্থান নেই। যদি কোন মানুষের তার পেটের খোরাক ও লজ্জা নিবারণের জন্য অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন উপায় না থাকে তাহলে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ব্যাহত ও বিপন্ন হতে বাধ্য, হীনমন্যতা ও দাসত্বের শিকার না হয়ে তার উপায় নেই। স্বাধীন হবার পরেও এবং সংবিধানে ও দেশের আইনে সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে চলার যে অধিকারই দেওয়া হোক না কেন, অন্নবস্ত্রের জন্য পরনির্ভরতার ফলে সে অধিকারকে ভোগ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একটি স্বাবলম্বী ও প্রকৃত স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে—অন্নবস্ত্রে সেই সমাজের মানুষেরা আত্মনির্ভরশীল কিনা। খাদ্যশস্য উৎপাদন ও তুলার চাষ—এরই মধ্যে গান্ধীজী কিন্তু তাঁর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার কার্যক্রমটি সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি; অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদনের পক্ষেও তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেছে, তবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন গ্রামীণ মানুষের খাদ্য বস্ত্রের প্রয়োজন পূরণের উপর। উৎপাদন হবে দেশবাসীর মৌল প্রয়োজনগুলির পূরণের জন্য—বিকেন্দ্রীকরণের অর্থনীতির এটিই হচ্ছে অন্যতম মূল কথা। গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের ধারণায় এই চিত্রটিই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্নবস্ত্রের পরই বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ও ব্যবহারের উপর গান্ধীজী বিশেষ জোর দিয়েছেন। গান্ধীজীর

শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনায় বুনিয়াদী পাঠক্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য তিনি দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। আজও আমাদের দেশে শিক্ষানীতি কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলেছে কিন্তু কেন ধ্যান-ধারণা ও পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে আমাদের দেশের তৃণমূল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে এবং একটি ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুর পরিবারের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা ও কাজ একসংগে কিভাবে লাভ করতে পারে—তার লক্ষ্য ও পদ্ধতির একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা গান্ধীজী তাঁর ঐ বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মধ্যে উপস্থিত করে গেছেন। আমাদের দেশের তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় ও রাজনীতিবিদ শাসকগণ এই বুনিয়াদী শিক্ষার বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষার বিনাশ সাধন করেছেন। এই বুনিয়াদী আজও চালু আছে কিন্তু শিক্ষার মানদণ্ডে এই শিক্ষার কোন জাত নেই, একেবারেই অবহেলিত সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার সংগে উন্নত মানের সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। আজ আমাদের উচ্চ শিক্ষিতেরাই তো সবচেয়ে নিম্নমানের সংস্কৃতির ধারক বাহক কিম্বা একেবারে সংস্কৃতিহীন। অল্প শিক্ষালাভ করেও গ্রামের মানুষেরা যে সংস্কৃতির অংশীদার হতে পারে গান্ধীজী তা বিশ্বাস করতেন এবং তা করতেন বলেই তিনি প্রতি গ্রামে রঙ্গমঞ্চ ও সাধারণ ভবনের জন্য একটি স্থান সুনিদিষ্ট করতে পেরেছেন। গ্রামের সমস্ত অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজ সকলের সহযোগিতায় ও সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রয়াসে চলবে—এই সমবায়ী ব্যবস্থাই যে গ্রাম্যসমাজ জীবনকে সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় করে তোলার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি এবং তাই আমাদের গ্রামগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য এই সমবায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—এ সম্পর্কে গান্ধীজীর কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। প্রতিটি সক্ষম গ্রামবাসীকে গ্রামরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে হবে এবং সাধারণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে; এবং এই কার্যক্রম একটি গ্রামকে নয়, পরোক্ষে সারা দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করার কাজে

সুদৃঢ় শক্তি হিসাবে কাজ করবে। ফলে দেশ রক্ষার জন্য আজ যে বিপুল অর্থব্যয় করতে হচ্ছে বহুলাংশে তার সাশ্রয় হবে এবং এই পথেই যে একটি দেশ অহিংস থেকেও কি ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে তার ভাবনা চিন্তাও যে গান্ধীজীর ছিল না তা নয়। সর্বোপরি গ্রামের শাসনকার্য ও উন্নয়নমূলক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে 'স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীর দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত গঠন—গ্রাম স্বরাজ অথবা বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থার যে অবিচ্ছেদ্য পূর্ব শর্ত—গণতন্ত্রের চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অবশ্য সর্ত এমন স্পষ্ট করে গান্ধীজীর আগে এই কথা কেউ বলেননি। আমাদের দেশে যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু হয়েছে তার সঙ্গে চরিত্রগত ভাবে গান্ধীজীর পরিকল্পিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে হবে। একটি পার্টি নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, অন্যটি রাজনীতি প্রভাব মুক্ত গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে গঠিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা; একটি চাপানো ব্যবস্থা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মূল ধারণাটিকে নস্যাৎ গড়ে উঠেছে—এটি গান্ধীজী পরিকল্পিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

গান্ধীজীর ভাবনায় এখানে বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থার যে মডেল বা রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে তাকে কিন্তু ষোল আনা অনুসরণ করতে যাওয়ায় একটি বিপদ আছে এবং সেভাবে ষোল আনা অনুসরণ করার জন্যও এই মডেল বা রূপরেখাটি উপস্থিত করা হয়নি। প্রসঙ্গতঃ এ ব্যাপারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নজরের মধ্যে রাখতে হবে। বিষয়টি দুটি হচ্ছে: এক—পরিস্থিতি সর্বক্ষেত্রে সব সময় পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনের ফলে নিত্য নতুন অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে এবং নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থার যে ধারণা গান্ধীজী পোষণ করতেন এবং যে ধারণার ভিত্তিতে তাঁর গ্রাম স্বরাজের রূপরেখা বা মডেল আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন সেটি ছিল প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের যুগ। সেদিনের সমস্যা আর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আজকের সমস্যার চরিত্র এক নয়। নিছক জাতীয় ভিত্তিতে দেশের

কোন বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকেই জাতীয় সমস্যাকে নিরাকরণের প্রয়োজন হবে। সেজন্য একটি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্যেরও প্রয়োজন হবে। তা যদি হয়, তাহলে একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং তা স্থায়ীভিত্তিক ও দৃঢ় হবে এমনটি আশা করা যায় না। দুই—গান্ধীজি নিজেও যে তাঁর সময়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থির সব সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এ ভাবেও ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। কোন মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্পর্কেই আমাদের এই ধরণের ধারণা পোষণের মধ্যে একটি গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং তার ফলে সেই মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির মহান চিন্তার বিকৃতি ঘটানো হয়। গান্ধীজি সমাজ উন্নয়নের কোন ক্ষেত্রেই এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগকে কেন্দ্রীকরণের বিরোধী হিসেবে এবং স্বয়ংশাসিত বিকেন্দ্রীয়ত সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। ক্ষমতা ও সুযোগ কোন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে এবং মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত হলে মানব সমাজের উন্নয়নের সার্বজনীন বিকাশ যে বিঘ্নিত হয়, একটি বিরাট অংশ মানুষের মৌল প্রয়োজনগুলি অমীমাংসিত থেকেই যায় এবং গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয় এবং মানবিকতার চরম বিপর্যয় ঘটে, শিল্প-কারখানা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথাকথিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও তা আমরা আজ প্রত্যক্ষ অনুভব করছি। কেন্দ্রীকরণের বিকল্প হিসাবে বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ গঠনের চিন্তাটি এই পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভব হচ্ছে; গান্ধীজীর সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য এখানেই। উৎপাদকের সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি সুসম্পর্ক থাকা চাই। উৎপাদন হবে মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক, বাজারের গুরুত্ব ভোগ্য বস্তুর লেনদেনের জন্য, শিল্প-কারখানার প্রসার মানুষের অব্যবহিত শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বেকারী ও দারিদ্র্য দূর করা, সকলের জন্য ন্যূনতম শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলা; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা ও

সমবায়ের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও নিরাপদ করা; প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করা—শুধু জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নয়, জীবনের মান-উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থা নয়—সমাজ চালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা—এই ধরনের ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা তারই একটি সমন্বিত ও পূর্ণরূপই হচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় শিল্প-কারখানার স্থান অবশ্যই থাকবে; কিন্তু তা আগ্রাসী হবে না। সহরও গড়ে উঠবে কিন্তু তা গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন পরিবেশকে ধ্বংস করে নয়। বাজারের প্রয়োজন হবে কিন্তু মানুষ বাজার অর্থনীতির শিকার হবে না। রাজনীতি হবে সমাজ দর্শন এখানে কোন দলের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ভোগের কোন সুযোগ থাকবে না। এ সবই বিকেন্দ্রীভূত সমাজ ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিকেন্দ্রীভূত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব, কতখানি সম্ভব, কত দিনে সম্ভব—তা ধারাবাহিক অনুশীলন ও গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। শিল্প বিপ্লবের পর আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার কাছে মানব সমাজের নতুম জীবনের, নতুন সভ্যতার যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ হয় নি, এবং তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। নানা দিকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও বিপুল সম্পদ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কেন তা হলো না বা হচ্ছে না—এই ব্যর্থতার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে সত্যে উপনীত হওয়া গেছে তা হচ্ছে: এই আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা সমগ্র মানব সমাজের সামনে একটি অমানবিক জীবন দর্শন তুলে ধরেছে; আর এই জীবন দর্শনকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে—উচ্চমানের জীবন যাত্রার যা কিছু উপাদান এবং এই জীবন ধারাকে পরিচালনা করার যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ক্ষমতা ও সুযোগের প্রয়োজন—তা সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব করেছে—মুষ্টিমেয় মানুষ বা তাদেরই গোষ্ঠীচক্র। আর্থিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যাপারে এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে—সব কিছু সম্পদ ও সুযোগের নিরংকুশ কেন্দ্রীকরণ। এই কেন্দ্রীকরণের বিকল্প হিসেবে

যে বিকেন্দ্রীকৃত সমাজের কথা ভাবা হচ্ছে তা কিন্তু একটি পুরানো দিনের অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থা নয়। অন্ধকার যুগে ফিরে যাওয়ার ধ্যান-ধারণার স্থানও এই বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থায় নেই; বরঞ্চ সকলের জন্য সুস্থ ও স্বচ্ছল জীবন যাত্রাকে সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এই নতুন সমাজ ব্যবস্থার চিন্তার উদ্ভব। প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন হবে এবং উৎপাদকের সঙ্গে উৎপন্ন ফসল বা বস্তুর সম্পর্ক হবে অবিচ্ছেদ্য। উৎপাদনী ব্যবস্থা ও সমাজ পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্থানীয় মানুষেরাই গ্রহণ করবে—তত্ত্ব হিসাবে এই চিন্তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন—এই তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণ কিন্তু তত সহজ নয়। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে এবং জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই সকলের জন্য মোটা ভাতের ব্যবস্থা করতে গেলে সীমিত কৃষিক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন নতুন পদ্ধতির কথা ভাবতেই হবে। কিন্তু যতই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা হোক না কেন—এই দেশের ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য দু'বেলা মোটা ভাতের সংস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই যে সমাজেরই ধ্যান-ধারণা করি না কেন, জনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে সুস্থ আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ার ধারণা স্বপ্নই থেকে যাবে। তাছাড়া ভূমিব্যবস্থার কাঠামো ও চরিত্রটিই আজও আমাদের দেশে এমন একটি জটিল অবস্থার মধ্যে আছে যেখানে ফসল উৎপাদনের সংগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির মালিকানার কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই গান্ধীজির উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না যে গ্রামের মানুষ তাদের ক্ষেতে খামারে ধান, গম, তুলা চাষ করবে আর তাতেই গ্রামবাসীদের অন্ন বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পুরানো কুটীর শিল্পগুলি অনেকদিন আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সে সব শিল্পের অধিকাংশকেই আর পুনরুজ্জীবন করা যাবে না; বর্তমান পরিস্থিতিতে সেগুলির আর বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই তা স্বীকার করে নিতে হবে। কাজেই বাস্তবের প্রয়োজন অনুযায়ী শুধু কুটীর শিল্প নয়,

অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানার সৃষ্টি ও প্রসার ঘটাতে হবে—এবং এই সব কুটীর, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎপাদনমুখী করতে হলে বহুলাংশে বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে—প্রযুক্তির প্রয়োগও প্রয়োজন হবে। কাজেই বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে গ্রামীণ শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসার, যন্ত্র ও বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতির কোন প্রয়োজন হবে না—এ রকম কোন ধারণা পোষণ করা আদৌ সমীচীন হবে না। আমাদের জীবনযাত্রা হবে সরল, উৎপাদন পদ্ধতি হবে সহজ ও সুলভ এবং উৎপাদকের পক্ষে সহজবোধ্য ও নিয়ন্ত্রণ যোগ্য—এই ধারণাটির মূলে যে চিন্তা কাজ করছে তা হচ্ছে—মানুষ যেন যন্ত্রের দাস না হয়, তার নিজের সৃজনশীল ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে না ফেলে। এই ঘটনাই ঘটছে আজকের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রবল চাপে। এই অসহায়ত্ব আর এক ধরনের পরাধীনতা। এই পরাধীনতাকে অস্বীকার করে মানুষ যে পরিমাণ তার নিজস্ব শক্তির উপর আস্থাশীল হয়ে উঠতে পারবে, যা কিছু সে ভোগ করছে তা কোন ভিক্ষার বা অনুগ্রহের দান নয়—বহুলাংশে তার কষ্টোপার্জিত ও শ্রমজাত ফল—ততই সে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল মনে করতে পারবে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে সাহসী হবে, সত্যবাদী হবে, অপরের সুখ-দুঃখে সমব্যথী ও সাথী হবে এবং এর ফলে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ঘটবে। যে সমাজে এই ধরণের মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটবে সেই সমাজই হবে সুস্থ ও স্বাবলম্বী সমাজ, যে সমাজের আর একটি নাম স্বরাজ। বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ গড়ার ধ্যান-ধারণার মধ্যে এরূপ একটি নতুন সমাজ, একটি নতুন সভ্যতার কল্পনা করা হচ্ছে। কল্পনা যে সব সময় অলীক হবে তা ভাববার কোন কারণ নেই—যদি সে কল্পনার পিছনে থাকে সম্ভাবনার কোন বীজ। এক্ষেত্রে সে বীজ যে আছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তিনশো বছরের কলিকাতা মহানগরী—বাঙালী জীবনের অবক্ষয়ের প্রতীক

বিগত এক বছর ধরে মহানগরী কলিকাতার তিনশো বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গেল। সুরু হয়েছিল ১৯৮৯ সালের ২৪শে আগষ্ট, শেষ হ'লো ১৯৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট। সুরুটা হয়েছিল যত আড়ম্বরের সঙ্গে শেষটা হলো ততই নমঃ নমঃ করে; এত বড় একটি বিরাট বর্ষব্যাপী উৎসবের শেষ হলো বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। কিভাবে এই বিশাল মহানগরীর জন্ম হয়েছিল তিনশো বছর আগে জব চার্ণকের শুভ আগমনে—সূতানাটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামক তিনটি জলে ডোবা এঁদো পল্লীর সংমিশ্রণে, পশ্চিমবাংলার বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে যা ছিল একটি বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসের কাহিনী—সেই কাহিনীর সঙ্গে তাদের কিছুটা পরিচয় ঘটলো। কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসবের সারা বছরের উৎসব অনুষ্ঠান থেকে যদি কিছু লাভ হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই জানার লাভটুকু ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। আমরা এই শতকের প্রায় প্রথম যুগের মানুষ যারা, সেদিনের কলিকাতা শহরের পত্তনের কথা তারা নতুন করে স্মরণ করার সুযোগ পেলুম—এই লাভটুকু ও মূল লাভের সংগে একটি মস্ত বড় কীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। পুরানো দিনের কলিকাতা শহরের অবস্থাটি কি রকম ছিল তার একটি সুন্দর ছবি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে কলিকাতা-বাসীদের একাংশের; তারা নিঃসন্দেহে মহাভাগ্যবান। কেননা বর্ষব্যাপী মহোৎসবের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ী এবং সেই ট্রাম গাড়ীতে আরোহনকারী যাত্রী আর কেউ নন আমাদের মহামন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজোতি বসু সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী বিনয় বাদল দীনেশ বাগ থেকে বৌবাজের রাস্তা ধরে কলিকাতার

সর্বশ্রেষ্ঠ পুলিশ ঘাঁটি লাল বাজারের পুলিস দপ্তরের দিকে মহা আড়ম্বরে সেই ঘোড়ায় টানা সুসর্জ্জিত ট্রাম গাড়ীতে পথ পরিক্রমা করতে তারা দেখেছেন। কলিকাতার বুকে যে দিন প্রথম এই ঘোড়া টানা ট্রাম আত্মপ্রকাশ করেছিল—নিশ্চয়ই সেদিন সেই ট্রাম গাড়ীর আরোহী কলিকাতা মহানগরীর জন্মদাতা জর্ব চার্ণক ছিলেন না, ছিলেন তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে কোন বিদেশী বণিক গোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র দল। তখনও তারা পুরোপুরি সারা দেশের রাজত্বের মালিক না হয়ে উঠলেও, রাজার জাত হিসাবে এই সব মহাভাগ্যবান যাত্রীদের আমাদের পুর্বপুরুষদের কেউ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, দূর থেকে মাথা নত করে সেলামও দিয়েছেন। তখনকার দিনে তাদের কাছে এটি ছিল একটি অভিনব অভূতপূর্ব দৃশ্য। আজকের কলিকাতা আর তিনশো বছর আগেকার কলিকাতা এক নয়; অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেদিনের ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ী কোন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে, বদলে এসেছে বিদ্যুতে টানা ট্রাম। এই ট্রাম গাড়ীর নয়, নিছক আবেগ ও অসাবধনতার ফলেই সংঘটিত হয়ে গেছে কিন্তু তাহলেও আমাদের মানসিক প্রবণতা কোন দিকে এবং আমাদের জাতীয় সত্তা ও মর্যাদাবোধের ভিত্তি কত দুর্বল নিঃসন্দেহে তাও প্রমাণিত হয়। মহানগরী হিসাবে কলিকাতার বিবর্তনের ইতিহাসে বাঙালী ও বিশেষভাবে কলিকাতাবাসীদের ভূমিকারত একটি যথার্থ মূল্যায়ন হওয়ার প্রয়োজন আছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছরের পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে এক বছর ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানেও এই মহানগরী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভংগি ও ভূমিকার প্রসঙ্গটি একেবারেই অনুল্লেখ্য ও সম্পূর্ণভাবে অনালোচিত থেকে গেছে; কলিকাতা নগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসবের এক বছর ব্যাপী অনুষ্ঠানের চরম ব্যর্থতা এখানেই।

কলিকাতা মহানগরীকে নিয়ে বাঙালী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের গর্বের অন্ত নেই। মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে যে বর্ষব্যাপী নানা ধরণের উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে গেল তার

মধ্যেও নানা ভাবেই সেই গর্ব ও গৌরবের কথাটি যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে এ সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। বাঙালী সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত তাঁরা তো সকলেই কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী, আর তারাই তো বাঙালীর প্রতিনিধি। আর যাইহোক, এই মহানগরীই তো তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সম্মানিত করেছে। এই মহানগরীর দৌলতেই তাঁরা একটি সৌভাগ্যবান জীবনের অধিকারী ; কাজেই এই মহানগরীর প্রতি তাঁদের যে একটি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকবেই তা সহজেই বোঝা যায় এবং বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাঁদের লেখা আলোচনা ও ভাষণে, নাচ, গান ও অভিনয়ে, রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রের প্রচারে সে কৃতজ্ঞতা তাঁরা প্রকাশও করেছেন—সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ, সমাজচিন্তা নায়ক এদের কেউই বাদ যাননি। বাদ যাওয়ার কথা নয় ; কেননা এরা প্রায় সকলেই বাঙালী এবং কলিকাতাবাসী। এরা সকলেই কলিকাতা নামক আয়নাটির সামনে দাঁড়িয়ে গোটা বাংলাকে দেখেন আর এদের মধ্যেই আমরা দেখি আমাদের বাঙালী সমাজকে। বর্ষব্যাপী উৎসব পর্ব সবে সমাপ্ত হয়েছে। আবেগ ও অনুভূতির যে প্রাবল্য ছিল তার রেশও ইতিমধ্যে অনেকখানি কেটে গেছে। এখন অবশ্যই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে কলিকাতা মহানগরীর যে তিনশো বছরের বর্ষব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পালিত হলো এই উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে গোটা বাঙালী জাতি কি শিক্ষা বা মনের খোরাক লাভ করলো? পশ্চিমবাংলা এমনকি কলিকাতা মহানগরী কি কোন ভাবে উপকৃত হলো? বর্ষব্যাপী এই যে কলিকাতার বুকে নানা ধরণের অনুষ্ঠান, বিপুল অর্থব্যয়, সভা-সমিতি ও প্রদর্শনীর অঙ্গসৌষ্ঠব কত সুন্দর, গতি তার কত দ্রুত। কলিকাতার বুকে এই বিদ্যুৎ টানা ট্রামও আজ অচল হয়ে পড়েছে, তাই বাতিল হতে চলেছে। বিদ্যুতে টানা পাতাল রেল বসেছে, চক্ররেলের লাইন পাতা হচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদ, সময়ের দাবী—কাজেই পুরানো দিনের কলিকাতাকে আমরা তো সেদিনের রূপে

পেতে পারি না। পুরানো ইতিহাসেই তার সন্ধান করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পুরানো ইতিহাস এভাবেই একদিন প্রত্নতাত্বিক গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে। এই গবেষণাও ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; ইতিহাস এইভাবেই সমৃদ্ধ হয়, গতিশীল ও কালজয়ী হয়ে ওঠে। কাজেই কলিকাতার ইতিহাসে জব চার্ণকও মিথ্যা নয়, সে যুগের প্রবর্তিত ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীও মিথ্যা নয় ; জন্মলগ্ন থেকে কলিকাতার বিবর্তনের ইতিহাসে জব চার্ণকের একটি স্থান আছে, সে যুগের কলিকাতায় যানবাহনের ক্রমবিকাশে ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীরও একটি স্থান আছে। এ সবই সত্য ঘটনা, কাজেই অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতা মহানগরীর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ হতে পারে, বিতর্ক উঠতে পারে ; কিন্তু তাতে জব চার্ণকের কলিকাতা নগর পত্তনের কাহিনী কিম্বা সেদিনের কলিকাতা নগরীর বুকে ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীর প্রবর্তনের কথা কোন ক্রমেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় না। ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ী প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের মধ্যে দু-পাঁচজন মানুষ যে আজও নেই তা নয়। আজকের চোখে সে দিনের জব চার্ণকের পরিকল্পিত কলিকাতা নগরী এবং নগরীর বুকে ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী ট্রাম গাড়ীর কিছুটা বেমানান বলে মনে হলেও সেদিন এই চিত্র ছিল কলিকাতার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এক অভিনব ও বিস্ময়কর দৃশ্য। কিন্তু পুরানো কলিকাতাকে নতুন প্রজন্মের কলিকাতাবাসীদের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে ভাবে মহা সমারোহে ও বহু আড়ম্বরে ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীকে প্রদর্শন করা হলো তাও তাদের অনেকের কাছেই খুবই অস্বাভাবিক, অভিনব ও বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। পুরানো দিনের কলিকাতা মহানগরীর ঘোড়া টানা ট্রাম গাড়ীকে প্রদর্শন করানোর জন্য, এই প্রদর্শনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সমেত আমাদের গণ্যমান্য কলিকাতা-বাসীরাও প্রদর্শনীর বস্তু হয়ে গেলেন—অভিনবত্ব ও বিস্ময়ের কারণটি এখানেই। দেশ স্বাধীন হবার পর চার দশক বাদেও আমাদের যারা

প্রথম সারির প্রতিনিধি বলে দাবীদার, বোঝা গেল তাঁদের মানসিকতার উপর সেদিনের বিদেশী জব চার্ণকের ঘোড়ায় টানা ট্রাম অভিযাত্রীদের আভিজাত্যের জাতের প্রভাব আজও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। মুখে আমরা যতই স্বাধিকার ও সার্বভৌমত্বের অহঙ্কার করি না কেন, বিদেশী জব চার্ণকের মানসিকতা থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত নই—এ প্রশ্ন যদি দেখা দেয়—তাহলে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘটনাটি হয়তো কোন পরিকল্পিত ঘটনার আয়োজন—এ সবের মধ্যে এই মহানগরীর প্রকৃত স্বরূপটি কি, কোন বিবর্তনের পথে তার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তার সীমাবদ্ধতা, দৈন্য ও দারিদ্র্য ও হীনমন্যতার অবস্থাটি প্রকট হতে হতে আজকের অবস্থায় তার যে রূপান্তর ঘটেছে এবং আগামী দিনে কোন দিকে ও কিভাবে তার নতুন রূপান্তর ঘটবে তার কি কোন আন্তরিক মূল্যায়ন বা হিসাব-নিকেশ করার চেষ্টা হলো ? এই চেষ্টা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তির বর্ষব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠান যে অর্থহীন হয়েছে তা বুঝতেই হবে। হুগলী নদীর পূর্বপ্রান্তে জব চার্ণকের পদার্পণে সূতানাটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা তিনটি ক্ষুদ্র পল্লীর সম্মিলনে যে একটি ব্যবসায়ী গঞ্জ হিসাবে কলিকাতা এই নতুন নামে যে একটি ক্ষুদ্র নগরী থেকে তিনশো বছরের মধ্যে আজকের এই বিশাল কলিকাতা মহানগরীর উদ্ভব—তার একটি ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর হাতহাস আছে তা একদিকে যেমন আমাদের স্মরণ করতে হবে, তেমনি এই কলিকাতা মহানগরীর সমগ্র বিবর্তনের ধারাটিকে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বুঝতে হবে। এখানে নিছক ভাবাবেগের কোন স্থান নেই।

কলিকাতা কোন একটি প্রাচীন শহর নয়, পরিকল্পিত নগরীও নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদেশী পাশ্চাত্য দেশের বণিক কুলের একাংশ বাণিজ্যিক স্বার্থেই ভারতের বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে কিছুটা স্থান দখলের আগ্রহ ও কামনা নিয়েই এ দেশে যাতায়াত সুরু করে শেষ পর্যন্ত কলিকাতাই তাদের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। এটি যে রাতারাতি গড়ে উঠে

ছিল অথবা কোন একটি বিশেষ দেশের বাণিজ্য গোষ্ঠীই যে কলিকাতা বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের স্রষ্টা তাও নয়, কলিকাতা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে প্রায় শতাধিক বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং এই সময়ে কলিকাতার বাণিজ্য কেন্দ্র ও শহরের উপর আধিপত্য নিয়ে পর পর ডাচ, স্পেন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বাণিজ্য গোষ্ঠি ও শক্তির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছে; শেষ পর্যন্ত কলিকাতার ইংরাজ বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। এ সবই দুশো বছর আগেকার ইতিহাসের কথা ইংরাজদের বাণিজ্যিক মানদণ্ড কিভাবে ইংরাজ রাজশক্তির রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং এই কলিকাতা শুধু ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও শিল্পনগরী নয়, সারা ভারতবর্ষ-ব্যাপী রাজত্ব স্থাপনের সহায়ক সুদৃঢ় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে, আমরা বাঙালী সমেত সমস্ত সমগ্র ভারতবাসী বিদেশী ইংরাজের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলুম তা তো মাত্র দুশো বছর আগেকার কথা। এবং সেই পরাধীনতার শৃংখল থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি মাত্র চার দশক আগে এ কাহিনী তো আমাদের সকলেরই জানা, এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে যেমন দুশো বছরে সারা ভারতবর্ষের বিরাট পট পরিবর্তন ঘটে গেছে, তেমনি জব চার্ণকের সেই তিনশো বছর আগেকার কলিকাতারও আমূল রূপান্তর ঘটেছে। কলিকাতা আজ মহানগরী বিশাল যার আয়তন, লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি। শতাব্দীর প্রথম পাদে যদিও কলিকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে, কিন্তু তার পরও দীর্ঘকাল ধরে এই কলিকাতা সারা পূর্ব ভারতের প্রধান ও একমাত্র শিল্প নগরী ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পারগণিত ও পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং পূর্ব ভারতে আজও কলিকাতার এই স্থান শীর্ষস্থানে। তাছাড়া শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সারা ভারতে দীর্ঘকাল দেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত এই কলিকাতা মহানগরী অগ্রগণ্য স্থান দখল করে এসেছে। ফলে কলিকাতা মহানগরী একটি বিশাল জাতীয় মহানগরীর আকার ধারণ

করেছে লোক সংখ্যা মহানগরীর আয়তন অনুযায়ী বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে. শুধু পূর্ব ভারতের নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষ ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কর্মচারী, ও ছাত্রদের বিরাট সমাবেশ ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো, দেশ বিভক্ত হয়ে। বাংলা হলো দ্বিখণ্ডিত, নাম হলো পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান—পরবর্তীকালে যার নতুন করে নামকরণ হলো বাংলাদেশ। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো বটে কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুসলমানেরা এই দেশেই রয়ে গেল বন্যার স্রোতের মত পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের। প্রধানতঃ এই কলিকাতা মহানগরীর বুকেই ঝাপিয়ে পড়লো, আজও সেই জনস্রোত কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় একই ধারায় বয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে কলিকাতা মহানগরীর লোকসংখ্যা এক কোটিতে এসে হাজির হলেও কলিকাতার মহানগরীতে রুজী রোজগারের জন্য আরও কয়েক লক্ষ্য মানুষ প্রতিদিন ভীড় করে এই কলিকাতা মহানগরীতে। পৃথিবীতে আর কোন দেশের নামকরা বৃহৎ নগরীতে এই ধরণের জনসমাবেশ ঘটেছে—এর কোন নজীর আছে কিনা জানা নেই। এ এক অদ্ভুত ও অন্য দেশ কেন, এমন কি ভারতের অন্য কোন রাজ্যের মানুষের কাছে ও এটি একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। এই ধরণের বিপুল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কোন মহানগরীর পক্ষে স্বাস্থ্য, সুস্থিতি শৃংখলা ও সংহতি নিয়ে সুষম সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা, গেলে তার পথ ও পদ্ধতি কি, আর যদি তা সম্ভব না হয়—তাহলে এই দুর্বিসহ অবস্থার বিকল্প কি হওয়া উচিত—এ সম্পর্কে একটি গভীর অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল বহু আগেই ; কিন্তু তা হয়নি। আশা করা গেছলো যে অন্ততঃ কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে এবং কলিকাতাবাসী বাঙালী বুদ্ধিজীবিগণই এই মূল্যায়নে একটি সক্রিয় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কিন্তু সমগ্র উৎসব আয়োজনে বাঙালীর জীবন মরণের এই বিষয়টিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার সুপরিকল্পিত চেষ্টা হয়েছে। কলিকাতা

মহানগরীর একশো বছর পূর্তি উৎসব পালন করা হয়েছিল কিনা জানিনা, দুশো বছর পূর্তি উৎসব ও অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা নেই। কাজেই কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে কি ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজনের চিন্তাটি উৎসব সংগঠক ও এই উৎসব-এ সানন্দে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের অংশ বিশেষের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হয়েছিল তাদের পক্ষ থেকে সমগ্র বাঙালীর সমাজের কাছে তার একটি সুনির্দিষ্ট সন্তোষজনক এবং যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থিত করার দায়িত্ব আছে। যদি সে দায়িত্ব তাঁরা পালন না করেন তাহলে একটি বড় মাপের উৎসবের নাম করে গরীব দেশের কষ্টার্জিত অর্থের অপব্যয় করলেন কেন এবং তা করায় তাদের কি কোন নৈতিক অধিকার ছিল—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আসতে পারে। কোন পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা নিয়ে কলিকাতা মহানগরী গড়ে ওঠেনি, কাজেই নানা অবস্থার মধ্যেই এই মহানগরীর বৃদ্ধি ঘটেছে। একশো বছর আগেই কলিকাতার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেদিন তা সম্ভব হয়নি। এই অক্ষমতা ও ব্যর্থতার দায় আমরা অবশ্যই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের মদৎ পুষ্ট বিদেশী পুঁজিবাদ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করতে কোন অসুবিধা নেই এবং আমরা দীর্ঘকাল তা করেও এসেছি। কিন্তু দেশ তো স্বাধীন হয়েছে আজ প্রায় চুয়াল্লিশ বছর। কলিকাতার অধিবাসী বাঙালী সমাজের গণমান্য, শিক্ষা দীক্ষায় সংস্কৃতিক চর্চায়, নতুন সমাজ গঠনের ভাবনায়, রাষ্ট্র পরিকল্পনায় যারা প্রথম সারিতে অবস্থান করছেন, দেশকে গঠন ও সুস্থ ও সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব প্রধানতঃ তাদের উপর—আজও কলিকাতা মহানগরীর জীবনধারা যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তা যে অতি ভয়ংকর এই প্রবাহ ধারার গতিরোধ করা এখুনিই অতীব জরুরী প্রয়োজন তা কি তাঁরা কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবছেন? নিছক সমস্যাটি যদি কলিকাতায় বসবাসকারী এক কোটি এবং কলিকাতা নিত্য যাতায়াত করছে আরও চার পাঁচ লক্ষ বাঙালীর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলেও না

হয়—পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার মাত্র এক পঞ্চমাংশ মানুষের সমস্যা হিসাবে মনে করে লঘু করে দেখা যেত ; কিন্তু সমস্যাটির সঙ্গে ছ' কোটি বাঙালীর জীবন মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে বলেই সমস্যাটিকে কোন ভাবেই হালকা করে দেখা যায় না, সমস্যাটিকে কেবল কলিকাতা মহানগরীর সমস্যা বলেও ভাবা যায় না ?

কলিকাতা মহানগরীকে নিয়ে আজও আমাদের অনেকের যে গর্ব ও গৌরব বোধই থাকুক না কেন—এই মহানগরীর ক্রমক্ষয়িষ্ণু অবস্থা সম্পর্কে এই দেশেরই একাংশ মানুষের নানা অভিযোগ অপবাদও শোনা যায়। কেউ বলেন কলিকাতা মিছিল নগরী, কারও মতে কলিকাতা মুমূর্ষু নগরী, আবার কারো ধারণা কলিকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী—এই ধরণের আরও কত কি? অবশ্য কলিকাতাবাসী বাঙালীরা মহাগরীরর বিরুদ্ধে ভিন্ন রাজ্যের মানুষের এই সব অপবাদ স্বীকার করেন না, একযোগে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। কলিকাতা মহানগরী সম্পর্কে এই যে অপবাদ এবং এই অপবাদ খণ্ডনে যে প্রতিবাদ তার পক্ষে ও বিপক্ষে হয়তো যুক্তি আছে ; কিন্তু এক্ষেত্রে সে বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মহানগরীর ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের বাঙালীদের যে দুর্বলতাই থাকুক না কেন—এই সত্যকে আর অস্বীকার করে লাভ নেই যে কলিকাতা মহানগরী আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাতে এই মহানগরীকে আর সুস্থ বসবাসের যোগ্য নগরী বলে আর কিছুতেই গণ্য করা যায় না এবং এই মহানগরীর পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা নেই। যারা ভাবছেন যে আর একটা হুগলী ব্রীজ, একটি চক্র রেল, কয়েকটি বাইপাস, পাতাল রেলের আরও কিছু সম্প্রসারণ অথবা সল্ট লেকের মত আরও দু-একটি খানদানী উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারলে কলকাতা মহানগরীর সমস্যা সমাধান করা যাবে—এক কথায় বলা যায় তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এই মহানগরীর সীমাবদ্ধতা বহু পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা যখন দ্বিখণ্ডিত হলো, তখনই কলিকাতাকে ভারমুক্ত করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। শিল্প-

কারখানা, বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র, অফিস আদালত—বাঙালীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য এই সব কিছুর যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন ছিল, অনগ্রসর জেলাগুলিতেও দূর দূর প্রান্তে যে কলিকাতার মত সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও অনুরূপ একাধিক নগরী গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল—আমরা সেদিন সে দায়িত্ব পালন করতে ব্রতী হয়নি। ব্রতী হইনি শুধু তাই নয়, কার্যতঃ এই বিকেন্দ্রীকরণের কাজটিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি ; এবং একই পথে আজও আমরা পরিক্রমা করে চলেছি। গ্রাম বাংলাকে নিঃস্ব করে, রুজী-রোজগারের সব পথ বন্ধ করে, দেশবাসীর সব রক্তটুকু কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়নে ঢেলে দিয়ে এই মহানগরীকে আরও বড় করে, সারা বাংলার ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করা যাবে—এই সর্বনাশা নীতি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হতে পারে। ধনী কল-কারখানার মালিক ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের হতে পারে ; কিন্তু প্রগতিশীল ও নতুন সমাজগঠনে বিশ্বাসী বলে দাবীদার শিক্ষিত বাঙালা সমাজ কিভাবে এই শোষণের নীতিকে সম্পূর্ণ মেনে নিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। দেশ বিভাগ বাঙালীর জীবনে একটি বিপর্যয় এনেছে সত্য, কিন্তু সেই বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল, তার কি কোন সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি আমরা? কলিকাতা মহানগরীই শিল্প-বাণিজ্য, রুজি-রোজগার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলন —সব কিছুর একমাত্র কেন্দ্র এই যে নীতি ও মানসিকতা, এ থেকে তো সেদিন আমরা মুক্ত হতে পারিনি ; আজও আমরা সেই একই নীতি ও মানসিকতার শিকার হয়েই চলেছি। লজ্জা ও বিপদের কথা— আমাদের কলিকাতাবাসী শিক্ষিত মহল—রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী বাঙালা সমাজ জীবনকে পুনর্গঠিত করার দাবীদার যারা—তারা অধিকাংশই কলিকাতা মহানগরীর অধিকতর উন্নয়ন-এর নামে দেশের যা কিছু সম্পদ ও শক্তি তার সিংহভাগ ব্যয় করেছেন কিম্বা ব্যয় করার নীতিকে

সমর্থন করে চলেছেন। এই নীতি রূপায়নের একমাত্র ফল হচ্ছে—কলিকাতা মহানগরীর জীবনে অধিকতর বিপর্যয়কে ডেকে আনা। কাজেই বিদেশী কোন পর্যটক বা ভিন রাজ্যের কোন অসহিষ্ণু অতিথি এসে কলিকাতা মহানগরীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে কোথায় কি মন্তব্য করে গেছেন সে নিয়ে বাদানুবাদে যাওয়া কিম্বা এই মহানগরীর অতীত ঐতিহ্য ও অবদানের যুক্তির আড়ালে আত্মশ্লাঘায় বুঁদ হয়ে থাকা প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার যুক্তিনিষ্ট ও কার্যকরী পথ নয়—এই বাস্তব সত্যটুকু বহু বিলম্ব হয়ে গেলেও আজ তা বুঝতে হবে, কোনমতেই আর বিলম্ব করা চলে না। এই মহানগরী আজ যেখানে এসে হাজির হয়েছে ঐ একই নীতি পদ্ধতিতে অজস্র অর্থ ব্যয় করে শত চেষ্টা করেও তার স্বাস্থ্য ফেরানো যাবে না, সুস্থভাবে বসবাসের যোগ্য নগরী হিসাবে কলিকাতাকে আর গড়ে তোলা যাবে না। সেজন্য প্রত্যেক বাঙালীর কাছে এটিই জাতীয় দাবী হওয়া উচিত—আর কলিকাতা মহানগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়—ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীকরণও নয়; প্রয়োজন-সংকোচন, জনসংখ্যা হ্রাস ও জীবন ও জীবিকার যে প্রয়োজনে এই মহানগরীতে মানুষের ক্রমবর্ধমান ভীড় সেসব কিছুর বিকেন্দ্রীকরণ। কলিকাতা মহানগরীর জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে বিতর্ক আছে; এই মহানগরীর প্রসার ও সমৃদ্ধির বিবর্তনের ইতিহাসে দেশী ও বিদেশী শক্তির অবদান কার কতটুকু—এ সব নিয়েও বিচার বিশ্লেষণ চলতে পারে। সে বিচার ও বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন আছে। কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে যে সে রকম কোন যুক্তিনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে কিনা জানা যায়নি, হলে বাঙালীর সমাজ জীবনের সঠিক ইতিহাস রচনার সুবিধা হবে। কিন্তু এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য যে সার্থক হয়নি তা বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না যখন দেখা যায়—কলকাতা মহানগরীর জীবনে আজ সবচেয়ে বড় সমস্যাটি কি, আর সেই সমস্যার সমাধানের পথই বা কি সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নির্দেশ তো দূরের কথা, কোন

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয়নি। উন্নয়নের নীতি ও মানসিকতার প্রশ্নটি সেজন্যই এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক।

কলিকাতা মহানগরীর বিগত তিনশো বছরের ইতিহাসটিকে আমরা সহজেই দুটি পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—একটি ইংরাজ আধিপত্য ও আমাদের পরাধীনতার যুগ, আর অন্যটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী যুগ। দেখা যাবে—প্রথম যুগে কলিকাতা মহানগরীর জন্মলগ্ন থেকে একদিকে যখন তার বিস্ময়কর সম্প্রসারণ ঘটছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছে এবং নানা দিক থেকে মানুষের রুজি রোজগারের পথও উন্মুক্ত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তখন থেকে যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে, পথ ঘাটেরও বিস্তৃতি ঘটেছে। আজ আমরা কলিকাতার যে সর্ব ব্যাপারে দুরাবস্থা ও হতশ্রী চিত্রটি লক্ষ্য করছি তা দৃষ্টিগোচর হবার মত অবস্থা সেদিন সৃষ্টি হয়নি। অভাব ছিল, রুজি রোজগারের পথও যে অবারিত উন্মুক্ত ছিল তা নয়, তবে শহরে হাঁফ ছাড়ার মত ফাঁকা জায়গা ছিল, ঠাণ্ডা ও নির্মল বাতাস নেওয়ার মত পরিবেশ ছিল, যানবাহনে বসে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করা যেত, রাস্তায় স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার মত অবস্থা ছিল। বিদেশী শাসনে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে; তাই স্বাভাবিক ভাবেই রুজি রোজগারের বিকল্প পথের সন্ধানে গ্রামের মানুষ শহরাভিমুখী হয়েছে এবং দলে দলে কলকাতা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে ভীড় করেছে। শুধু বাঙালী নয়, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেও মানুষ কলিকাতা মহানগরীতে এসে রুজি-রোজগারের আশায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু তখন মানুষের চাহিদা আজকের মত এত ব্যাপক ও প্রবল হয়ে ওঠেনি; সেজন্য হতাশা ও উত্তেজনা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তুলনামূলক ভাবে সে দিনের অবস্থা ভাল ছিল কি মন্দ ছিল এই বিতর্কের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কিছু বলা হচ্ছে না। কলিকাতা মহানগরীর উপর এই জনস্রোতের চাপটি কি ধরণের ছিল এবং কলিকাতা মহানগরীর

বহিরঙ্গের সামগ্রিক অবস্থাটি কি আকারে দেখা দিয়েছিল তারই একটি সাধারণ চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো মাত্র। কিন্তু এই চিত্রের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়া ও দেশ ভাগ হওয়ার পর। বিগত চার দশকে কলিকাতা মহানগরী ও এই মহানগরীর আশেপাশে শিল্পকারখানা আদৌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি; নতুন শিল্পকারখানা তো গড়ে ওঠেইনি, পুরানো শিল্প-কারখানা অনেকগুলি বন্ধ হয়ে গেছে কিম্বা দারুণভাবে সংকুচিত হয়েছে। যে পরিমাণে আমদানী পণ্যবস্তুর ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে এবং প্রতিটি জিনিসের ক্রয়মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুপাতে বাঙালীর ক্রয় ক্ষমতা বাড়েনি।

এর মধ্যে একটি ফাঁক থেকে গেছে—আর সেই ফাঁক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গ্রামেও কর্মসংস্থানের কোন নতুন ক্ষেত্র বা সুযোগ সৃষ্টি করা হয় নি। ফলে কলিকাতা মহানগরীর উপর জনসংখ্যার হার কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে গেছে। পূর্ব বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ ছন্নছাড়া গৃহহীন মানুষ এই জনস্রোতের সঙ্গে এসে মিশেছে। প্রাক-স্বাধীনতার মুহূর্তে যেখানে কলিকাতা মহানগরীর লোকসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষের মত, বিগত চার দশকে সেই সংখ্যাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটিরও বেশী। এই এক কোটি মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার মত রুজিরোজগারের সংস্থান, বাসোপযোগী বাসগৃহ, যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহন, সুস্থভাবে চলাফেরা করার মত প্রশস্ত রাস্তা, জলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণের সুযোগ—এর কোনটিই কি আর কলিকাতা মহানগরীর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব? প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ইংরাজ আমলে কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীরা এবং বাইরে থেকে আগত নিত্যযাত্রীরা যে এই মহানগরীতে পরমানন্দে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতো কিম্বা কালাতিপাত করতে পারতো কিম্বা কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীদের অপেক্ষা দেশের অন্যান্য শিল্প-নগরীর মানুষের অধিকতর সুস্থ ও শান্তিতে বসবাস করতো—এরকম কোন তুলনামূলক মূল্যায়ন এখানে করা হচ্ছে না; কেননা এক্ষেত্রে সে মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন।

এখানে বিবেচ্য বিষয়ঃ কলিকাতা মহানগরীর জনসংখ্যাকে বহন ক্ষমতা সেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই প্রায় প্রান্ত সীমান্তে পৌঁছে গেছলো, তারপর এই চারদশকে যদি আরও দ্বিগুণ লোক রুজি-রোজগারের আশায় এই মহানগরীতে ভীড় করে থাকে এবং এই সংখ্যার সঙ্গে প্রতিদিন যে কয়েক লক্ষ নিত্যযাত্রীর সংখ্যা যুক্ত হয় তাহলে অবস্থাটি যে কি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় তাতো শুধু অঙ্কের হিসাব নয়—এ আমাদের নিত্য দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। হাজার হাজার মানুষ ভোর সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ট্রামে বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে চলেছে, সারাদিন কলিকাতার রাস্তাগুলিতে মানুষ কিলবিল করে হেঁটে চলেছে, প্রতিটি রাস্তার অর্ধেক অংশ দোকান পাট ও শাকসজ্জীর বাজারে ভরে গেছে, যানবাহনের ধোঁয়া ও শব্দে গোটা মহানগরীর আকাশ বাতাস দূষিত ও বীজাণুতে ভরা। হাজার হাজার নোংরা বস্তি, একই গৃহে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় গাদা গাদা লোকের বাস। রাস্তায় রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ, পুতিগন্ধময়, আলোর দুর্ভিক্ষ, বাতাসের দুর্ভিক্ষ, জলের দুর্ভিক্ষ। কয়েকটি অভিজাত পল্লী ছাড়া কলিকাতা মহানগরীর এই হচ্ছে সামগ্রিক চিত্র। কোন যাদুমন্ত্রে এই ভয়াবহ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব? কলিকাতা মহানগরীর জনসংখ্যা হ্রাস করবো না, জনস্রোত বন্ধ করবো না—পরিবর্তে এই মহানগরীর আরও সম্প্রসারণ করে, আরও উন্নয়ন করে এবং সেই উন্নয়নের স্বার্থে এই গরীব দেশের রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয় করে সমস্যার সমাধান হবে এই পরীক্ষা তো বহু আগেই হয়ে গেছে এবং সেই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। আর নতুন করে ঐ একই পরীক্ষার কি কোন অবকাশ আছে? এখন কলিকাতা মহানগরীকে পুনরসঞ্জীবিত করার সেই প্রয়াস ত্যাগ করে এই পশ্চিম বাংলার দূর দূর প্রান্তে আরও ছোট বড় পনের বিশটি কলিকাতা যাতে গড়ে ওঠে—সেদিকেই মনোনিবেশ করা উচিত এবং সেই সঙ্গে গ্রামে গঞ্জেই যাতে গ্রামবাসীদের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার মত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়—সেইভাবেই আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা দরকার। এছাড়া বাঙালীর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অন্য কোন পথ খোলা নেই।

কলিকাতা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান অবনয়ন ও অবক্ষয়ের কথা উঠলেই আমাদের শিক্ষাভিমানী সংস্কৃতিবান কলিকাতাবাসীদের একাংশ এই অভিযোগের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন, এবং যারা দেশের শিল্প-সংস্কৃতির জগতে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত, অভিনয়, খেলা-ধূলা ও সর্বোপরি রাজনীতির ক্ষেত্রে কলিকাতা যে পীঠভূমি বা কেন্দ্রস্থল এবং কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসীরাই যে সর্ব ব্যাপারে পথিকৃত এ গর্ব ও গৌরবের কথা তারস্বরে ঘোষণা করেন; এবং সেই যুক্তিতে কলিকাতা মহানগরীর বর্তমান অবক্ষয়িত মসীলিপ্ত ছবিটি লুকোবার চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টায় যে কলিকাতা মহানগরীর লুপ্ত গৌরবকে ফেরানো যায় না কিম্বা কলিকাতাবাসী বাঙালীর পুরানো দিনের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না; এই অর্থহীন আত্মশ্লাঘা সমগ্র বাঙালী জাতিকেই সর্বপ্রকারে হীনমন্য ও হীনপ্রভ করে তুলছে তা আমরা বুঝেও বুঝতে পারছি না। ইংরাজ রাজশক্তি যেমন তাদের বাণিজ্য ও প্রভুত্বের শক্ত ঘাঁটি প্রথম এই কলিকাতা মহানগরীতেই গড়ে তুলেছেন এবং এই ঘাঁটি থেকেই সারা ভারতবর্ষে তাদের প্রসার ঘটেছিল এও যেমন সত্য, তেমনি সমান সত্য যে এই কলিকাতা মহানগরী শুধু বাণিজ্য ও শিল্প কারখানার কেন্দ্র নয়, নিছক একটি প্রাসাদ নগরী নয়; শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধের, জাতীয় জাগরণের ও বিপ্লবী চেতনার কেন্দ্রভূমি ও মহাপীঠস্থান হিসাবেই গড়ে উঠেছিল; আর সেইজন্যই কলিকাতা কেবল ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ নগর হিসাবেই সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেনি—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগরীর আখ্যায় ভূষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। কিন্তু সে তো ঊনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগ ও এই শতাব্দীর প্রথম পর্বের ইতিহাস, প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের ইতিহাস—আমরা তখন ছিলুম ইংরাজের অধীন। একটি উপনিবেশের পরাধীন অধিবাসী হয়েও কলিকাতাবাসী বাঙালীরা কিভাবে মহা গণ-জাগরণে ও শিক্ষা সংস্কৃতির আন্দোলনে পথ প্রদর্শক হতে পেরেছিল আর এই কলিকাতা মহা-নগরী এ সবের পীঠস্থান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল, এবং

দেশ স্বাধীন হবার পরেই কলিকাতাবাসী বাঙালী কেন এবং কিভাবে তারা তাদের সেদিনের গর্ব ও গৌরব হারালো, সর্বক্ষেত্রে বাঙালী পিছিয়ে পড়লো এবং সেই সংগে কলিকাতা মহানগরীর মর্যাদাও ধূলায় লুণ্ঠিত হলো এই বিবর্তনের ও ধারাবাহিক অধঃপতনের তো একটি সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল, কলিকাতাবাসী বাঙালীদের একটি যুক্তিনিষ্ঠ আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসবকে কেন্দ্র করে যে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো—এই সময়টিই তো ছিল এই মূল্যায়ন ও আত্মবিশ্লেষণের প্রকৃত সময়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন : সত্যই কি কলিকাতা মহানগরী এবং সেই সংগে সমগ্র পশ্চিমবাংলা ও বাঙালী জাতির জীবনে সর্বব্যাপী যে অবক্ষয় ও অধঃপতন আমরা লক্ষ্য করছি—তার কি কোন সঠিক মূল্যায়ন ও আত্মবিশ্লেষণ হলো? তা আদৌ হয়নি, হয়নি বলেই এই সত্যকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হচ্ছে : এই বর্ষব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানে বাঙালী হিসাবে আমরা আদৌ উপকৃত হলুম না, এই উৎসব অনুষ্ঠান থেকে আমরা কোন শিক্ষাই লাভ করতে পারলুম না। কলিকাতা মহানগরীর পুনর্জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও আমরা তার অতীত লুপ্ত মহিমার স্মৃতিচারণে মশগুল হয়ে রইলুম। এ শুধু কলকাতাবাসী মানুষের সংগে প্রতারণা নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, প্রবঞ্চনা করা। সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলিকে নিঃস্ব করে, দুর্বল করে, সেখানে জীবনযাত্রার সুযোগ সৃষ্টির কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা না করে, কলিকাতা মহানগরীকেই সাত কোটি বাঙালীর কর্মসংস্থানের রুজি রোজগারের, বসবাসের, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সম্প্রসারণের একমাত্র কেন্দ্র করে তুলবো—এই ধারণা বাস্তবায়িত করা যেমন অসম্ভব, এই ধরণের বাঙালী মানসিকতা আরও বিপজ্জনক। কলিকাতা মহানগরীর হৃত-গৌরব যদি আমরা সত্যই ফিরিয়ে আনতে চাই, কলিকাতা মহানগরীকে একটি সুস্থ ও দূষণমুক্ত মানুষের বসবাসের উপযোগী নগরীতে পরিণত করতে চাই তাহলে এই মহানগরীতে আরও অধিক সংখ্যক মানুষের ভীড়

করার প্রয়োজন ও প্রবণতা দুইই বন্ধ করতে হবে আর তা করা সম্ভব যদি যে কারণে মানুষ বাধ্য হয় এই একটি নগরীতে এই ভীড় করতে সেই কারণ বা কারণগুলিকে অন্যভাবে দূরীকরণের জন্য আমরা সঠিক ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কয়েক মাইল মেট্রো রেল তৈরী করে কিম্বা কয়েকটি উড়াল পুল ও ফ্লাই ওভার করে আমাদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতারা ভেবেছিলেন কলিকাতার রাস্তায় যে জ্যাম-জোটের সমস্যা তার সমীকরণ করা যাবে, সে সমীকরণ কি হয়েছে? ভাবা হচ্ছে: আর একটি হুগলী ব্রীজ বসিয়ে কিম্বা পূর্বে একটি বাইপাস তৈরী করে কিম্বা একটি চক্ররেল হলে কিম্বা ট্রামবাসের সংখ্যা বাড়িয়ে যাত্রী মানুষের ভীড় হ্রাস করা যাবে, যাতায়াতের সুবিধা হবে তা যে আদৌ সম্ভব নয়, অভিজ্ঞতাই তো সেই সত্যটুকু জানিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের দেশের উৎপাদন যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন, যদি জন্মহার ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবে—এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য কলিকাতায় মানুষের ভীড় করার ক্রমবর্ধমান যে প্রবণতা তা যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে কলিকাতাকে একটি স্বাস্থ্যকর সুন্দর নগরী করে গড়ে তোলার অন্য সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হবে। যদি পাঁচ বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এভাবে পাঁচ লক্ষ লোকের যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় কিন্তু সেই পাঁচ বছরে যদি আরও দশ লক্ষ মানুষ কলিকাতা মহানগরীতে ভীড় করে —তাহলে মানুষের ভীড় করার সমস্যাটি কি সমাধানের দিকে অগ্রসর হয়, না সমস্যাটিও আরও জটিল হয়ে ওঠে? কাজেই পথ ঘাটের উন্নয়ন করে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, কলিকা*। মহানগরীকে ভীড় মুক্ত করা যাবে তা কোনমতেই আশা করা যায় না। আর কলিকাতা মহানগরীর ভিতরকার পথগুলির সংখ্যা বাড়ানো ও প্রশস্ত করাও যাবে না, করতে গেলে এই মহানগরীকে একেবারে ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে তাও আর কোনক্রমে সম্ভব নয়। তাছাড়া এই

মহানগরীতে যে পথগুলি আছে তার অর্ধাংশ তো কেনাবেচার হাট বাজারে পরিণত হয়ে গেছে, এখনও যদি কিছু বাকি থাকে দু-চার বছরের মধ্যে হয়েই পূরণ হয়ে যাবে, কর্মসংস্থান ও রুজি রোজগারের তাগিদে হকার নামক এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যাদের দখল থেকে এই মহানগরীর কোন পথকেই আর মুক্ত রাখা সম্ভব নয়; চেষ্টা যে না হয়েছে তাও নয়, কিন্তু সে চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। একই সমস্যা বসবাসের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সিনেমা ও খেলার মাঠে—সর্বত্রই অবিশ্বাস্য রকমের মানুষের ভীড়, কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। হাওয়া দূষিত, জল দূষিত, আলোর অভাব, পথ ঘাট জরাজীর্ণ, পয়ঃপ্রণালী সেই ইংরাজী আমলের একেবারে অকেজো; সামান্য বৃষ্টিতে সারা মহানগরী জলে থইথই—লক্ষ লক্ষ পদযাত্রী পুরুষ মহিলা, ছাত্র-ছাত্রীর অবর্ণনীয় দুর্দশা—তারপর আছে মাইলের পর মাইল মিছিল, রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি প্রদর্শনের বেওয়ারীশ প্রতিযোগিতা এতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পরিকল্পনা বিহীন সহর বলে কলিকাতা মহানগরীতে সুসজ্জিত ও প্রশস্ত পার্কের সংখ্যা ও সবুজের সমারোহ কোনদিনই উল্লেখযোগ্য ছিল না, ভীড় করা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে এবং বাণিজ্যিক স্বার্থে কয়েক বছর আগেও এ ব্যাপারে যতটুকু সুযোগ ছিল তারও বিনাশ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বনসম্পদের যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন করে বনসৃজনের মহোৎসবের মহড়া চলছে। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজের উপর তলার মানুষদের এও আর এক ধরণের তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়। কলকারখানার সংখ্যা বাড়েনি, যা ছিল তাও ধুঁকছে; অনেকগুলি আবার বন্ধ হয়ে গেছে—দুর্গাপুর, হলদিয়া ছাড়া নতুন কোন শিল্পনগরী গড়ে ওঠেনি। গ্রামে গঞ্জে ও ছোট মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটনার চেষ্টা হয়নি; কাজেই বেকার ছেলেমেয়েদের ভীড়ে কলকাতা মহানগরীর নাভিঃশ্বাস উঠেছে। সমস্ত পরিবেশ বিষাক্ত ও হতাশায় ভরা, সর্বত্র কর্তব্যহীনতা, দুর্নীতি, পশু শক্তির প্রাদুর্ভাব ও জাতীয় হীনমন্যতা—এই হচ্ছে তিনশো বছরের কলিকাতা মহানগরীর

প্রকৃত অবস্থা, নগ্ন চিত্র। এর পরও কি আমাদের এই কলিকাতা মহানগরীর নামে দুহাত তুলে কীর্তন করা শোভা পায়? কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী মহাশয় গণ! আপনারা আত্মসম্বিত ফিরে পান, সাহসের সংগে সঠিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ভাবুন এই শতাব্দীর সূচনা পর্বে আপনারা কোথায় ছিলেন, ভারতের মানচিত্রে আপনাদের এই প্রিয় নগরীর স্থান কোথায় ছিল, আর আজ দেশ স্বাধীন হবার চার দশক পরেও আপনার কোথায় আর আপনাদেয় মহা গর্ব ও গৌরবের কলিকাতা মহানগরী কোন সীমানায় এসে উপনীত হয়েছে।

শুধু কি কেন্দ্রের অসহযোগিতা, পূর্ব বাংলার বাস্তুহারা মানুষদের দলে দলে কলিকাতায় আগমন, বিদেশী ও অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুনাফাবাজি ও শোষণ—এগুলিই হচ্ছে কলিকাতা বাসী বাঙালীদের ও সেই সংগে কলিকাতা মহানগররীর অধঃপতন ও অবক্ষয়ের মূল কারণ? এই বিপর্যয়কে ঘটিয়ে তোলার পেছনে আমাদের নিজেদের কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই—আজও নেই? যদি ঘটনাটিকে আমরা এমনি ভাবে দেখি তাহলে কি তাতে আমাদের সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হবে? দেশ ভাগের পর সেদিনের বাংলা যখন দু টুকরো হয়ে গেল তখন লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা বাঙালীকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে ও আন্দামানে যে আরও দুটি নতুন বাংলা গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার পুরো সদ্ব্যবহারের জন্য কলিকাতাবাসী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মহল প্রগতিশীল বলে দাবীদার যাঁরা যদি তাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সেদিনের প্রচেষ্টার পিছনে সর্বশক্তি নিয়ে সামিল হতেন তাহলে কলিকাতা মহানগরী তথা সমগ্র পশ্চিমবাংলার চিত্রটাই কি পালটে যেত না? না, আমরা তা করিনি, সর্বতোভাবে বাধাই দিয়েছি; সে মূঢ়তার কি কোন কম আছে? তথাকথিত সব বাধা সত্ত্বেও স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলার প্রথম চৌদ্দটি বছর যদি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রায় একক প্রচেষ্টায় দুর্গাপুর, হলদিয়ার মত শিল্পনগরী, কল্যাণী, শিলিগুড়ি প্রভৃতি কয়েকটি আধুনিক নগরের পত্তন করে যেত

পারেন, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেডিয়াম, বিদ্যুৎ প্রকল্প, সড়ক ও যানবাহনের উন্নয়ন—সব হারিয়ে বাঙালী আজও যা কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারে—সে সবাইতো ঐ একটি মানুষেরই অবদান। আর সে অবদান মাত্র চৌদ্দটি বছরের। তারপর আঠাশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ; রাজ্য প্রশাসনে ও রাজনীতিতে অনেক রূপান্তর ঘটে গেছে কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে পশ্চিম বাংলা ও কলিকাতা মহানগরীর উল্লেখ করার মত কোন উন্নয়নই ঘটেনি ; অবনতি ও অধঃপতন ঘটেছে নানা দিকে, সমাজ জীবনের প্রতিস্তরে কোন যুক্তি দিয়ে কি এই সত্যকে অস্বীকার করা যাবে? কাজেই কলিকাতা বাসী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বাঙালীর ধারণা ও আচরণের একটি ন্যায়নিষ্ঠ আত্মানুসন্ধানও কঠোর আত্মানুশীলনের প্রয়োজন ছিল : প্রয়োজন ছিল কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছরের বিবর্তনের এবং সেই সঙ্গে বর্তমান অধঃপতনের ইতিহাস পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের। কিন্তু তা হয় নি। সেজন্যই এই পূর্তি উৎসবের আয়োজন সমগ্র বাঙালীর কাছে বিশেষভাবে কলিকাতা মহানগরীর শিক্ষিত সমাজ-বিজ্ঞানী ও নতুন সমাজ সংগঠকদের কাছে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পূর্ণ অর্থহীন।

লুপ্তপ্রায় স্বাস্থ্য, লাবণ্য, সৌন্দর্য, সুস্থিতি ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে কলিকাতা মহানগরীর আয়তন আর বৃদ্ধি করা চলে না ; অন্তর্চাপ হ্রাস করা জরুরী প্রয়োজন। একথার অর্থ এ নয় এই মহানগরীর উন্নয়নের কোন প্রয়োজন নেই। কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের স্বার্থেই এই প্রয়োজনটি অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আবার এই জরুরী প্রয়োজনটি হওয়া যেমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, তেমনি কতকগুলি আইন বা অনুশাসনের প্রয়োগ করেই সমস্যার সমাধান হবে না। প্রধান কলিকাতার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা এবং পুনর্গঠিত করার প্রথম সর্ত হয় যদি সেই চাপ থেকে এই মহানগরীকে মুক্ত করা তাহলে যে মূলগত কারণে পশ্চিমবাংলার বহির্জগতের ক্রমবর্ধমান জনস্রোত নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এই মহানগরীর বুকে আছড়ে পড়ছে, সেই

কারণটির যদি সুষ্ঠু মীমাংসা না হয় তাহলে এই জনস্রোতকে বন্ধ করা যাবে না। বিকল্প পথটি হচ্ছে যে আর্থ সামাজিক ধ্যান ধারণা ও ব্যবস্থা থেকে কলিকাতা মহানগরীর এই বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠেছে—সেই ধ্যান ধারণা ও ব্যবস্থারই মৌলিক পরিবর্তন দরকার হবে। অর্থাৎ যে সব সুযোগের আশায় অনন্যোপায় হয়ে দলে দলে মানুষ একটি বিশেষ নগর বা শহরে ভীড় করে সেইসব সুযোগের ক্ষেত্রগুলির প্রসার ঘটাতে হবে জেলা স্তরে ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে। এটি হচ্ছে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। কলিকাতা মহানগরীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর একটিই মাত্র পথ তা হচ্ছে কলিকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে শিল্প-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রসারের কর্মদ্যোগ ও কার্যক্রম আর কোনক্রমেই কেন্দ্রীভূত করা চলবে না, এ সবের সুযোগ জেলা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন স্থানে দূর দূর অঞ্চলে যদি এই ধরণের সুযোগের নতুন নতুন ক্ষেত্র গড়ে ওঠে এবং সহজ প্রাপ্য হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই কলিকাতামুখী মানুষের জনস্রোত হ্রাস পেতে থাকবে; আর এই জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পেলেই তবে কলিকাতা মহানগরীকে সুস্থভাবে বসবাসের পক্ষে উপযোগী যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ফলপ্রসূ হবে। মহানগরীর পথের সংখ্যা যদি না বাড়ে এবং প্রশস্ত না করা হয় অথচ যানবাহনের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং পথগুলি হাটবাজারে পরিণত হয়, আলোবাতাসহীন বসতবাটি ও ঝুপড়ি বস্তিতে যে পরিমাণ এই মহানগরী ভরে উঠেছে—ঠিক সেই পরিমাণেই উদ্যান বাগিচা ও পার্কের বিলোপ ঘটবে। এইভাবেই ফাঁকা মাঠ ও সবুজের বিনাশ ঘটানো হচ্ছে। কর্ম সংস্থানের সুযোগ সীমিত কিন্তু কর্মপ্রার্থী বেকারের সংখ্যা সীমাহীন---এই অবস্থা থেকে যে সামাজিক অবক্ষয় ঘটা স্বাভাবিক তাই ঘটছে, কলিকাতা মহানগরীর নাগরিক জীবন আজকে একটি সাংঘাতিক বিস্ফোরণের মুখে এ সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? কাজেই এই মহানগরীর লুপ্ত গৌরব যদি কলিকাতাবাসী বাঙালীদের ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে এই মহানগরীর উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের কথা

চিন্তা করার আগে এই কলিকাতা মহানগরীর যে আর্থ সামাজিক অবস্থা তার কিভাবে পুনর্গঠন হওয়া সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে উন্নয়নের যাবতীয় উৎস ও ক্ষেত্রগুলির কিভাবে দ্রুত বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় এই কাজে কলিকাতাবাসী শিক্ষিত সুধী সমাজের ভূমিকাটি কি হবে তাও ভেবে দেখার দরকার হবে। মানুষের দেহের কোন অংশে কিছু হলে তাতে অতিরিক্ত রক্ত নিবদ্ধ সেই সমগ্র মানুষটির সুস্থতা ও সৌন্দর্য কোনটারই প্রমাণ হয় না। আজকের আয় সামাজিক অবস্থার স্বরূপটি কি এবং তার রূপান্তর কিভাবে ঘটবে তার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি কি হবে—তা নিয়ে অবশ্যই বিশদ আলোচনা হতে পারে এবং তা নিয়ে নানা অভিমতের উদ্ভব হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এই মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমাদের দ্বিমত হওয়ার আর কোন অবকাশ নেই যে পশ্চিম বাংলার সমস্ত শক্তি ও সুযোগকে কলিকাতার মত একটি মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত করে কলিকাতা মহানগরীকেও বাঁচানো যাবে না, তাতে সারা পশ্চিমবাংলারই সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। আমরা সেই সর্বনাশের দিকেই দ্রুত এগিয়ে চলেছি। এই গতি বন্ধ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতা মহানগরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যখন প্রায় অচল এবং এখানকার অভিশপ্ত নাগরিক জীবনের অবসান ও মুক্তির কামনা দুর্বার হয়ে উঠেছে তখন এই কলিকাতাবাসী বাঙালীদেরই একাংশ এই মহানগরীর মহিমা কীর্তনে আত্মহারা হয়ে ওঠেন তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। যখন দেখা যায় এই সব মানুষেরা অনেকেই জ্ঞানীগুণী, সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন স্বাভাবিক ভাবে এদের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন বা সংশয়ও আসে, গম্ভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। এঁরা কলিকাতা প্রেমে মাতোয়ারা! আজও যে বাঙালী শত পরাজয়ের পরেও অমিত শক্তির অধিকারী আর বাঙালীর প্রাণ-শক্তির উৎস আজও নাকি এই কলিকাতা মহানগরী! সত্যই আমরা বাঙালীরা আজও অমিত প্রাণ শক্তির অধিকারী কিনা জানি না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের যে একটি বিপজ্জনক আত্মতুষ্টির

ভার আছে—এই ধরণের একটি ক্ষতিকর মানসিকতা যে কাজ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও দাবী করা হচ্ছে যে কলিকাতা মহানগরী বাঙালী জীবনের প্রাণ কেন্দ্র, কিন্তু এই মহানগরীর অর্থাৎ শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র অর্থনীতিতে বাঙালীর আধিপত্য ও অধিকার কোন দিনই ছিল না। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রেও পিছু হটতে হটতে সর্বভারতীয় মানে প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। সর্বক্ষেত্রে দেউলিয়া হতে হতে কলিকাতা অধিবাসী হয়েও এই মহানগরীর যা কিছু সম্পদ তার উপর বাঙালীর কোন কর্তৃত্ব নেই, সব ব্যাপারেই বাঙালী অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী, দেশী বিদেশী শিল্পপতি ও বণিক গোষ্ঠীর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই পর্বত প্রমাণ অসহায়ত্ব ও অধঃপতন সত্বেও কলিকাতাবাসী বাঙালীদের এই মহানগরীকে নিয়ে আজও যে তাদের এই অদ্ভুত মানসিকতা; এই মানসিকতার উৎসটির সন্ধান পেলে তার কারণটিও স্পষ্ট ধরা পড়ে। গর্ব করার মত কোন বৈশিষ্ট নয়, এটি বাঙালী চরিত্রের একটি মারাত্মক দুর্বলতার দিক

বাঙালী চরিত্রে এই দুবলতার সূত্রপাত কোন সময়ে এবং কিভাবে তার সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করা সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের কাজ, তাঁরা তা করবেন; কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, ইংরাজ বণিক ও রাজশক্তি এ দেশে আসা এবং কলিকাতায় তাদের বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের প্রথম ঘাঁটি করার আগেও বাঙালীদের চরিত্রে এই দুর্বলতা ছিল; কিন্তু ইংরাজ আগমনের পর তা কিছুটা অবদমিত হয়ে যায়। কেননা ঐ যুগে বাঙালীদের মধ্যে থেকে একটি নতুন জাগরণেরও আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল—একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের, আত্ম-চেতনার বলিষ্ঠ উন্মেষের বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল। নতুন বাতাবরণের নীচে দাঁড়িয়েই বাঙালী প্রথমে কলিকাতা ও বাংলাদেশে এবং ক্রমান্বয়ে সারা দেশে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রকাশ হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী বাঙালীরা ছিলেন সেই নবজাগরণ ও পরবর্তী কালের দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের

পুরোধায় আর কলিকাতা মহানগরী হয়ে ছিল শুধু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয়, শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য-- এ সবেরও মূল কর্মকেন্দ্র, পীঠস্থান। ইংরাজ বণিক ও রাজশক্তি কেবল শোষক শক্তি হিসাবেই এ দেশ আসেনি, সঙ্গে এনেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শন। এই সভ্যতা ও জীবন দর্শনের মূল কথা ও লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রীভূত সমাজ গঠন, যেখানে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, কর্মসংস্থানের যাবতীয় ক্ষেত্র, শিক্ষালয়, হাসপাতাল ও সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলা প্রসারের যাবতীয় কেন্দ্র হবে— নগর ভিত্তিক, নাগরিক জীবনই হবে জাতীয় জীবন ; আর এই জীবন পরিচালিত হবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যমে—সংক্ষেপে যে বিবর্তনের পরিণতি ঘটছে একটি কেন্দ্রীভূত শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায়। এখানে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের মাধ্যমেই কেন্দ্রীভূত শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়ে ইংরাজের শাসন বাণিজ্য বিস্তারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে একদিন এ ভাবেই কলিকাতা নগরীর আবির্ভাব ঘটে। দেখা যায়, শোষক ও মুনাফা লোভীদের মানসিকতা আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের মানসক্ষেত্রকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করছে, আর এক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধিজীবিরা নিঃসন্দেহে এই মানসিকতার প্রথম সারির শিকার. তারও কারণ হচ্ছে : যে চারিত্রিক দুর্বলতা এই ধরণের মানসিকতাকে পুষ্ট করে তোলে তার মেলবন্ধন হয়েছে বহু আগেই, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে। কেন বাঙালীরা অহেতুক কলিকাতা প্রেমিক. কলিকাতা মহানগরীর বাঙালী অধিবাসীরা সমস্ত শক্তি ও সুযোগের কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতাকে দেখতে অভ্যস্ত. এই শক্তি ও ও সুযোগের বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবা তাদের পক্ষে সহজ সাধ্য নয় এই ঘটনার মূলে আছে পরোক্ষে একটি শোষণ ও আধিপত্যের প্রকৃতি ও হীনমন্য মানসিকতা। একদিন ছিল যখন বলা হোত What Bengal thinks to day, the rest of India think to-morrow. অথচ আজ সে গৌরবের অধিকার হারালেও, এখনও কলিকাতা প্রেমিক বাঙালীরা মনে করেন : বাঙালী আছে কেননা কলিকাতা আছে।

তাঁদের ধারণা কলিকাতা বাঁচলে তবেই পশ্চিমবাংলা—বাঙালী বাঁচবে। বিপরীতটি ভাবা তাঁদের পক্ষে আজ আর সম্ভব হচ্ছে না; কেননা তাতে ক্ষমতা ও অধিকার হারানো বা হস্তান্তরের ঝুঁকি আছে। সেজন্যই অর্থ, ক্ষমতা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ-এর চিন্তা করা কলিকাতাবাসী বাঙালীদের পক্ষে আদৌ সহজসাধ্য নয়। বিপ্লবী ও প্রগতিশীল হলেই যে ক্ষমতা ও সুযোগ হাতছাড়া করতে হবে—এমন কথা তো কোন সমাজ বিজ্ঞানে স্পষ্ট করে লেখা নেই। সমস্যাটি হচ্ছে এখানেই; আর সে কারণেই কলিকাতা মহানগরীর তিনশো বছর পূর্তি উৎসবের বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানে সব কিছুই করা হয়েছে, কিন্তু যা করা হয়নি—তাহচ্ছে কলিকাতা মহানগরীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কোন সত্যনিষ্ঠ মূল্যায়ন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের দেশে নারী আন্দোলন : কিছু ভাব ও ভাবনা

নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি—ঐ দাবী নিয়ে আন্দোলন আমাদের দেশেও নতুন নয়, চলে আসছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে, সেই নব-জাগরণের যুগ থেকেই। তবে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, গতি ছিল অতি ক্ষীণ ও মন্থর। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই এই দাবী ক্রমশ মুখর হয়ে উঠছে এবং ব্যাপকতা লাভ করছে। সমাজ বিবর্তনের পথে এই ঘটনা খুবই স্বাভাবিক ও সেজন্য আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু যে সমস্যাকে ভিত্তি করে এই দাবী ও আন্দোলনের উদ্ভব—সেই সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি সম্পর্কে আমাদের সকলের ধারণা যে স্পষ্ট তা মনে হয় না। স্বরূপ নির্ধারণ করার ব্যাপারটি অত সহজও নয়; এখানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইতিহাস গবেষণা ও সমাজ অনুধ্যানের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ স্বাধীনতা ও মুক্তি কথা দুটি একই সংগে ব্যবহৃত হলেও কথা দুটি সমার্থক নয়। তাছাড়া আমরা দেশের স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তি বলতে যা বুঝি সেই একই চিন্তা বা ভাবনা দিয়ে নারী মুক্তির ধারণাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। স্বাধীনতা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা আর মুক্তির সাধারণ অর্থ শোষণ মুক্তি, সে শোষণ আর্থিক বা সামাজিক বা দুইই হতে পারে। আমাদের দেশ আর পরাধীন নয়; দীর্ঘ চার দশক আগেই আমরা রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা লাভ করেছি। ভোটের দ্বারাই প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার গঠিত হচ্ছে; আর এই সরকারই দেশের যাবতীয় শাসন কার্য পরিচালিত করছে। এই ভোটের অধিকার তো সার্বজনীন; দেশের প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীই পুরুষ ও মহিলা, জাতি ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই এই ভোটের অধিকারী। এই ভোটের অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সুযোগ অভিন্ন এবং উভয় সম্প্রদায়েরই

প্রায় সমান ভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। তাহলে দেখা দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দেশের পুরুষ সম্প্রদায় যে অধিকার লাভ করেছে, আমাদের দেশের নারী সম্প্রদায়ও একই অধিকার অর্জন করেছে। তবুও আমরা দাবী করছি—নারী স্বাধীনতা চাই। স্বভাবতই যে চিন্তার ভিত্তিতে এই দাবী তোলা হচ্ছে তা হচ্ছে—নারী স্বাধীনতার ধারণাটি কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এই স্বাধীনতার বাইরে আরও মৌলিক কিছু আছে। অনুরূপভাবে. নারীমুক্তির সমস্যাটিও কেবলমাত্র আর্থিক শোষণ বা তথাকথিত সামাজিক শোষণ বলতে আমাদের যে চলতি ধারণা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চাকুরী ও অন্যান্য যবেতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা হিসাবে কোন তারতম্য নেই যতটুকু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার দ্বারা পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়েব জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত। প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে তো বটেই, দেশে মহিলা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, উকিল, জজ এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদের সংখ্যাও নগণ্য নয়; মহিলা হয়েও এ দেশের একজন নাগরিক দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। একজন মহিলার পক্ষে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ঘটনাও এদেশে বিরল নয়. কাজেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির ব্যাপারে যদি কোন সীমাবদ্ধতা দেখা যায় ও ত্রুটি ঘটে থাকে, তা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় স্তরেই দেখা যাচ্ছে বা ঘটছে এবং তার জন্য যে আন্দোলন তা সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই জাতীয় স্তরেই করার প্রয়োজন হবে এবং এখানে স্বতন্ত্রভাবে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই এমনও মনে হতে পারে। উন্নত কি অনুন্নত সব স্বাধীন দেশেই আজও কোন না কোন ধরণের স্বাধীনতা ও শোষণ মুক্তির আন্দোলন চলছে এবং আগামী বহুদিন এই আন্দোলন চলবে কেননা সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে মানুষকে স্বাধীনতা ও মুক্তির ধারণাটিরও পরিবর্তন ঘটবে। আজ যা প্রগতি পরিবর্তনের সঙ্গে ঠিকমত পা ফেলে চলতে না পারলে কালিকাতা প্রতিক্রিয়াশীল রূপ

নেবে; আর তখন আবার সেই প্রতিক্রিয়াশীলতার গর্ভ থেকে নতুন চিন্তা শক্তির অভ্যুদয় ঘটবে। এই ভাবে মানুষের সভ্যতার ধারা ক্রমোন্নয়নের পথে বিবর্তিত হতে চলেছে এই বিবর্তনের পথে কখনও কখনও ঘোরতর সংকট দেখা যে দেবে না তা নয়, কিন্তু মানুষের চলার পথে এই সংকট শেষ কথা নয়।

তাহলে প্রশ্ন আসে : আমাদের দেশে স্বতন্ত্রভাবে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের বিশেষ কোন তাৎপর্য বা গুরুত্ব আছে কিনা। গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে; এবং তা আছে বলেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আরও গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন। পুরুষ ও নারী এই দুটি সম্প্রদায় যদি একই মানব সমাজের দুটি অবিচ্ছেদ্য ও পরিপূরক অংশ হয়ে থাকে এবং এদের উভয়ের মিলিত শক্তির স্ফুরণের মাধ্যমেই অখণ্ড মানব সমাজের বিকাশ ঘটে—এই মৌল সত্যকে যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তাহলে এই মানব সমাজের কোন একটি অংশের স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, দাবী ও আন্দোলনের পদ্ধতির নির্ধারণে যথেষ্ট যত্নবান ও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটি এ নয় যে সমাজ দেহের এক অংশকে দমন অথবা বিলুপ্ত করে অন্য অংশকে প্রতিষ্ঠিত করা, অথবা একটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আর একটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু গড়ে তোলা। দীর্ঘকালীন বঞ্চনা, অথবা শোষণ, হীনমন্যতা ও অসম্মানের ফলে আমাদের দেশে শুধু নারী নয়, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর জাতীয় জীবনটিই খণ্ডিত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে; তা যদি হয় তাহলে এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে, যে ত্রুটি ও বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ জীবন দীর্ঘকাল চলে এসেছে তা থেকে মুক্ত করে এই সমাজ জীবনকে একটি অখণ্ড ও পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া, নারী ও পুরুষ দুটি পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগী শক্তি হিসাবে নয়, উভয়ের মিলিত একটি পূর্ণ মানব সাত্ত্বর রূপান্তর ঘটানো। এই আন্দোলনে বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার কোন স্থান নেই, সংঘর্ষেরও কোন অবকাশ নেই। নারী ও পুরুষ উভয় সম্প্রদায়কেই উভয়ের পক্ষে

গ্রহণযোগ্য ও সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর এমন একটি বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনকে পরিচালিত হতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে এই আন্দোলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে এবং তার প্রতিফলন ঘটবে একটি সামাজিক ভাঙনের মধ্যে এবং তা হবে সমাজ জীবনের পক্ষে আরও ক্ষতিকর। আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানে অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি, উভয়কেই সমস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা ঠিকই; কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও বুঝতে হবে যে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুযোগ বা অধিকার দেওয়ার প্রকৃত সুযোগ ও অধিকার ভোগ করার একটি বিরাট শূন্যতা বা ফাঁক থাকা খুবই সম্ভব। এটি কোন সাধারণ দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক নয়। আমাদের সংবিধানে সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য অনেক রকমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত করা ছিল—যেমন সার্বজনীন শিক্ষা, সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দেওয়া, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে সব ন্যূনতম প্রয়োজন তা পূরণ করা এবং এই ধরণের আরও অনেক কিছু। কিন্তু এই সব প্রতিশ্রুতির কতকগুলি এবং কতখানি রক্ষা করা বা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে? নির্দিষ্ট সময়সীমা যদিও বহু আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি ব্যাপারেই লক্ষ্যমাত্রা থেকে আমরা বহু দূরেই পড়ে আছি। এগুলি সরকারের (যে কোন সরকারই হোক না কেন) কাছ থেকে নিছক দান হিসাবে গ্রহণের ব্যাপার নয়; সংগ্রাম করে অর্জন করার বিষয়। আর এর জন্য প্রয়োজন বঞ্চিত শ্রেণীর সচেতনতা ও সংগঠন। আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছে এবং এই স্বাধীন দেশ কি ভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য যে একটি সংবিধান রচিত হয়েছে—এর পেছনেও একটি দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ইতিহাস আছে। দেশ স্বাধীন হবার পরও এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উচিত ছিল, আরও তীব্র করে তোলার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা হয়নি। যদিও হয়ে থাকে, তা হয়েছে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির

দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে; কাজেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আজও আমাদের দেশ যে নানা দিক থেকে অনগ্রসর তার মূলে আছে আমাদের এই ব্যর্থতা। সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি আমরা ইপ্সিত ফস না পেয়ে থাকি, তাহলে দেশের মহিলা সমাজের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে তা কি আমরা আশা করতে পারি? কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশ যেখানে ছিল আজও দেশ সেখানেই পড়ে আছে। সর্ব ব্যাপারেই কিছু না কিছু অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সমাজের গতিধারা এরকমই যে গোটা সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী এই গতিধারার ধারাবাহিকতা যদি রক্ষা করা না হয় এবং তার মধ্যে একটি ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখা দেয় এবং তার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়, তাহলে এই সম্পূর্ণ বিপরীত শিকার হয় সমাজের সেই সব শ্রেণীর মানুষেরাই উন্নয়নের প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশি। দেশ গড়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আমরা আজও এই আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। সেজন্য বহু ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্য সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনগ্রসরতা ও ব্যর্থতার পাল্লা এখনও অনেক ভারী। এর প্রধান কারণ—দেশের অনগ্রসর মানুষের চেতনা ও সঙ্ঘশক্তির অভাব। এই অভাবের সূত্র ধরেই দেশের আর একদল মানুষ, সংখ্যায় তারা অল্প হলেও এদের প্রলুব্ধ করে, প্ররোচিত করে এবং গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্যত এদের পরনির্ভরশীল করে রেখে নিজেদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ পূরণ ও সুরক্ষিত করে; ফলে এই সময়ের মধ্যে সমাজের যে রূপান্তর ঘটা উচিত ছিল তা ঘটেনি। এই মানদণ্ডে যদি আমরা দেশের সমগ্র পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের দেশে জাতীয় জীবনে মহিলা সম্প্রদায়ের স্থান কোথায়, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রকৃত অর্থ কি বা তার তাৎপর্যই বা কতখানি তা বোঝা সহজ হবে। এই বোঝার ভিত্তিতেই দেশে নতুন সমাজ গঠনে নারী সম্প্রদায়ের সঠিক ভূমিকা নির্ধারণ করা সহজ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজে তাদের অধিকার ও মর্যাদা অর্জনের

আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় এই আন্দোলনের ফলে শুধু দেশের নারী সম্প্রদায়-নয়, সমগ্র দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পণ প্রথা আমাদের দেশে একটি দীর্ঘ দিনের বিশেষ সামাজিক ব্যাধি ; আর এই ব্যাধির শিকার হচ্ছে দেশের মহিলারাই। পণপ্রথারই অনুষঙ্গ হিসাবে ঘটছে বধূহত্যা ও নারী নির্যাতন। বধূহত্যা ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে ; নির্যাতনের ফলে যুবতী মহিলাদের আত্মহত্যার ঘটনাও বিরল নয়, এই ধরণের ঘটনা প্রতিদিনের সংবাদপত্রের একটি নিয়মিত খবর। এই ব্যাধি দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সংক্রামিত হচ্ছে স্বচ্ছল ধনী ও শিক্ষিত পরিবারগুলির মধ্যেও। যদিও পণপ্রথার কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই এবং আইনের চোখে পণপ্রথা একটি ঘোরতর অপরাধ, তবুও এই অশুভ প্রবণতাকে রোধ করা যাচ্ছে না। পুত্র ও কন্যা উভয়েই আজ পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদার। খুশী খেয়াল মত বিবাহ বিচ্ছেদ চলবে না, তার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এই আইনও পাস হয়েছে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ধরণের আরও কতকগুলি আইন আছে যেমন Dowry Prohibition Act, Immoval Traffic Act, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Indirect Explore of Women Act, Equal Remaintion Act প্রভৃতি। এ সবই সমাজে মহিলাদের স্বীকৃতির পরিচয়। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পুরুষ ও মহিলাদের কোন ভেদাভেদ নেই—তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভোটের অধিকার সার্বজনীন। পঞ্চায়েত, আইন সভা ও লোকসভায় মহিলারা যাতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব (ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ) লাভ করে এই মর্মে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনকে সংশোধন করা হচ্ছে। কাজেই দেশের সাংবিধানিক কাঠামো ও আইনের পরিমণ্ডলে আমাদের দেশের মহিলারা যে বঞ্চিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, তা বলা যায় না। কিন্তু তবুও নানাদিক থেকে যে তারা বঞ্চনা ও অসম্মানের শিকার তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, নানা সামাজিক

বাধা নিষেধের মধ্য দিয়েই যে তাদের জীবন পরিক্রমা—এই সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। একটি পুরানো সমাজের অচলায়তন অবস্থাকে উত্তীর্ণ হয়ে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আইনের একটি ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু সে ভূমিকা সহায়কের ভূমিকা। মূল ভূমিকা হচ্ছে সমাজ বিবর্তনের আন্দোলনে, সমাজ বিবর্তন বিশেষ ভাবে সমাজের যে অংশের প্রয়োজনে. সেই অংশেরই। এটি কোন পেশাদার রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবীর কাজ নয়; বাইরে থেকে কোন চাপানো কর্মকাণ্ডও নয়। এই আন্দোলনে সাফল্যের পথে অন্তরায় কোথায় তা বুঝতে হলে আমাদের চলতি সমাজের স্বরূপটিও বুঝতে হয় এবং এই সমাজ ব্যবস্থার গোটা ইতিহাসটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা থাকাও দরকার হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে আরও বোঝা দরকার যে আমাদের দেশের নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি আন্দোলন সারা দেশের যে স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলন তা থেকে কোন বিচ্ছিন্ন অন্দোলন নয়, কোন বিকল্প আন্দোলন নয়, কোন সমান্তরাল আন্দোলন নয়!

আমরা একটি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে বাস করছি। বর্তমান সমাজে পুরুষ ও নারীর অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক—এই বিষয়টি বুঝতে গেলে আমাদের এই সত্যকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলবে না যে শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই এই পুরুষ শাসিত বা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা চলছে। এই সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ইতিহাসের কোন যুগে তা নির্ধারণ করা যাবে না। পুরুষ ও নারী এই উভয় সম্প্রদায়কে নিয়েই যদি মানুষের সমাজ, তাহলে এই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা ও অধিকার কিভাবে পুরুষ সম্প্রদায়ের হাতে চলে গেল তার সঠিক কারণ নির্ণয়ও আজ আর সম্ভব নয়। নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। ব্যাখ্যা যাই হোক, এক সুদূর অতীতে সমাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পুরুষ সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে

এবং আজও সেই পুরুষ শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা চলছে। আমাদের দেশেও সেই সমাজব্যবস্থা আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। কখনও কখনও এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় এই ঘটনার ব্যতিক্রম দেখা গেছে ; কিন্তু তা নিছক ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু নয় এবং সেই ব্যতিক্রমও স্থায়ী হতে পারেনি। তবে সমাজে পুরুষের এই যে নিয়ন্ত্রণ তা যে সব সময় নিরঙ্কুশ হয়েছে তা নয়! পুরুষ মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের একটি পারস্পরিক বোঝাপাড়ার মধ্য দিয়েই তা ঘটেছে ; কেননা সমাজের সুস্থিরতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও অগ্রগতি উভয় সম্প্রদায়েরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ ব্যতীত সম্ভব ছিল না। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা বললে অনেকে আতংকিত হয়ে উঠতে পারেন এই ভেবে যে এই সমাজ ব্যবস্থায় মহিলা সম্প্রদায়ের নিকট পুরুষেরা একটি অত্যাচারী শোষক সম্প্রদায় ; এই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা এবং স্থায়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র মহিলাদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে, তাদের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে। আমাদের দেশে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব এবং দৃঢ়মূল এবং স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারটিকে এইভাবে ভাবাও ঠিক হবে না ; সেরকম ভাবনা হবে একপেশে, বাস্তবতা বর্জিত ও অবৈজ্ঞানিক। মহিলাদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্ত সুযোগ বন্ধ করে এবং নিরংকুশ দমননীতি চালিয়ে এই সমাজব্যবস্থা কিছুতেই শক্তিশালী ও হাজার হাজার বছর ধরে স্থায়ী হতে পারতো না। সেদিন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থার কোন বিকল্প ছিল না। বিকল্প ছিল না বলেই সেদিন আমাদের দেশের মহিলা সম্প্রদায় এই ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছিল। আজ আমরা বর্ণভেদ প্রথার কঠোর সমালোচনা করি এবং এই প্রথার দ্রুত অবলুপ্তি কামনা করি। বর্ণ-প্রথা থেকে দেশে আজ যে উচ্চ-নীচ শ্রেণী ও জাতপাতের ও বর্ণভেদের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে পদে পদে বিপন্ন করে তুলছে, দেশকে দুর্বল করছে, সমাজে একটি ঘোরতর সমস্যা ও অবিচারের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করছে। কাজেই এই দুষ্ট বর্ণভেদ প্রথার

উচ্ছেদ চাই—এই দাবীর পিছনে আমাদের যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে তা খুবই সময়োচিত ও যুক্তিযুক্ত; কেননা তা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও মানবতা সম্মত নয়। কিন্তু ভেদ-বিভেদের ধারণা নিয়ে, সমাজের একাংশ বা অংশ বিশেষকে ছোট ও অচ্ছ্যুত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে এই বর্ণ ভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়নি; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের শক্তি ও দক্ষতার গুণাগুণ বিচার করে, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যটিকে সামনে রেখে গোটা সমাজের মানুষকে চারিটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই বর্ণবিভাগে সেদিন সমাজের ক্ষতি হয়নি, সমাজ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধই হয়েছিল, সমাজ একটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। আমাদের দেশ যে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার অধিকারী সেই ঐতিহ্য ও সভ্যতার ভিত্তি রচনায় যে সব উপাদান কাজ করেছে আজকের পরিস্থিতি বিপরীত রূপ ধারণ করেছে বলেই প্রাচীন ইতিহাসটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা, সেই ইতিহাসকে যথাযথ মূল্য না দেওয়া—এটি কোন সমাজ বিজ্ঞানের কথা নয়। বর্ণ বিভাগ আর জাতিভেদই সমার্থকও নয়। বিভাগ থেকে একদিন বিভেদের সূত্রপাত হওয়া সম্ভব; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিভাগ ও বিভেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। মানুষের শক্তি ও যোগ্যতায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়; শক্তি ও যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী কর্মেরও বিভাগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কর্মের বিভাগ আজও আছে এবং চিরকালই থাকবে। আমাদের দেশে এই বিভাগের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেদিন এই চারটি বর্ণ বিভাজনের মধ্যে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সেদিন শূদ্র ছিল সমাজের সেই শ্রেণীর মানুষরাই যারা ছিল দেশের সমস্ত সম্পদের উৎপাদক ও সমাজ সেবক, নিছক শ্রমজীবি তথা অধঃবর্ণ শ্রেণী এবং জাতপাতের বিরোধে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ—এ সবই পরবর্তী কালের ঘটনা। সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ নীচ এই বৈষম্যের ভিত্তিতে নানা শ্রেণীকে বিভাজন ইতিহাসের যে অধ্যায়" তা প্রাক্-বুদ্ধযুগের অধ্যায়। এই সময় থেকে শুরু হয়েছে সমাজের যে বিভাজন প্রক্রিয়া তার পসিরমাপ্তি আজও ঘটেনি। আমাদের প্রাণশক্তি

ছিল ধর্ম। ধর্মকে আশ্রয় করেই দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল; আর আমাদের গ্রামীণ সমাজ জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্মের ধারণারও বিবর্তন ঘটেছে; এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেরও সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আমাদের দেশে ধর্মের নামে নানা ব্যাখ্যা হয়েছে এবং নানা সাম্প্রদায়িক ধর্মেরও উদ্ভব হয়েছে। এই অবস্থায় ধর্ম তার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে কতকগুলি আবার অনুশাসনের বা লৌকিক শাস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। আর এই অবনয়ন সংঘটিত হয়েছে সমাজেরই একদল মানুষের স্বার্থে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে সমাজে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করার চেষ্টা করেছে। আজ আমাদের সমাজ যে নানাভাবে বিভক্ত, সমাজের একাংশের স্বার্থে বিপুল অংশ মানুষের বঞ্চনা ও অসম্মানের জীবন ভোগ করতে হচ্ছে—এর মূলে আছে ধর্মের নামে ধর্মহীন কর্মকাণ্ডের ইতিহাস। কিন্তু এ ইতিহাস তো দু-তিন হাজার বছরের ইতিহাস, আমাদের দেশের সমগ্র ইতিহাস নয়। দেশের সার্মগ্রিক কল্যাণে যা অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে তারই আলোকে আমাদের একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে। এখানে প্রাচীন বর্ণ বিভাগকে দায়ী করা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও ক্ষতিকারক। এটি হবে একটি নেতিবাচক পদক্ষেপ।

বিচারের অনুরূপ মানদণ্ডেই আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সেই একই মানদণ্ডের নিরিখে এই ব্যবস্থায় যদি কিছু মারাত্মক ত্রুটি থেকে থাকে কিম্বা বিচ্যুতি ঘটে থাকে তা বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই খুঁজে বের করতে হবে এবং তা সংশোধন করতে হবে। এখানেও আমাদের একটি ইতিবাচক মানসিকতা ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পরিচালিত হওয়া দরকার; অন্যথায় মহিলা সমাজের স্বার্থকে অধিকতর বিপন্ন করে তোলা হবে এবং তার ফলে সমগ্র মানব সমাজেরই ক্ষতি হবে। বন্য অবস্থা থেকে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়ার একটি

ইতিহাস আছে ; আর সে ইতিহাসের স্রষ্টা পুরুষ ও নারী উভয়েই। উভয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। নারী ও পুরুষের যৌথ জীবনচর্চা থেকেই মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যাত্রার সূত্রপাত। এ থেকেই ক্রমশঃ পরিবার, গোষ্ঠী এবং শেষে সমাজ গড়ে উঠেছে। এই বিবর্তন একদিনে হঠাৎ ঘটেনি ; ঘটেছে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, চিন্তার অনুশীলন ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। এই বিবর্তনের কাজে সমান অংশীদার নারী ও পুরুষ উভয়েই। কাজেই নারী ও পুরুষকে নিয়ে যে মানুষের সমাজ সেই সমাজকে পরিচালনার দায়িত্ব যে পুরুষ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তা কতকগুলি স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছিল এবং এই ব্যাপারে শুরুতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ছিল না। সেদিন মানুষের প্রয়োজন ছিল সীমিত, সুযোগও ছিল সীমাবদ্ধ। জীবনধারণের যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব মূলতঃ পুরুষ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত হয়েছিল আর সংগৃহীত বস্তু থেকে খাদ্য ও আহার্য প্রস্তুত করা, সন্তান ধারণ করা, শিশুদের প্রতিপালন করা—এই ভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্বের বিভাজন ঘটেছিল। এইটি ছিল নারী ও পুরুষের যৌথ জীবনযাপনের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। পরবর্তীকালে এই পর্বেরই সম্প্রসারণ ও ক্রমোবিকাশ ঘটেছে একটি সম্পূর্ণ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায়। এই সমাজ ব্যবস্থায় কালক্রমে নারী সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়েছে। একদিন নারী সম্প্রদায়ের স্বাধীন অস্তিত্বই ছিল না, কিন্তু নারী পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ অধিকার পুরুষের, সমাজ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হলেও সামাজিক বিধি বা অনুশাসন পুরুষ সম্প্রদায়কে কোনদিন সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করেনি পুরুষের সঙ্গে নারীরও খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণে কোন বাধা ছিল না ; নারী সম্প্রদায়ও এই সব কাজে অংশগ্রহণ করতো। তবে জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়নের ও জটিলতাবৃদ্ধির সাথে সাথে নারী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজনের

প্রক্রিয়াটিও বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে আমরা বর্তমানে আমাদের দেশে যে পারিবারিক কাঠামো লক্ষ্য করি একদিন তা শুরু হয়েছিল এভাবেই। সে কত বছর আগের কথা তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে এই ব্যবস্থা একটি সঠিক বাস্তবতা-সম্মত প্রক্রিয়াতেই যে গড়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা যদি না হতো তাহলে মানুষের পারিবারিক জীবন বলে কিছুই গড়ে উঠতো না, গড়ে উঠলেও তা স্থায়ী হতো না। সমাজ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হলেও নারী সম্প্রদায়কে শাসন ও শোষণ করা, হীনমন্য করে রাখা ও পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা না দেওয়া আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এই মানসিকতা ও কাজের কোন সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না, এই ধরণের মানসিকতা ও কাজ সামাজিক অপরাধ বলেই গণ্য হতো। ধর্ম চর্চায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করায়, বিদ্যার্জনে. স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী সম্প্রদায়ের উপর কোন সামাজিক বাধা নিষেধ ছিল না। তা যদি থাকতো তাহলে বেদ-পুরাণের কাহিনীতে অসংখ্য মহীয়সী বিদূষী মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটতো না। অনেক ক্ষেত্রে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা নারীকেই অধিক উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। নারীর গৌরব শুধু তার নারীত্বে নয়, মাতৃত্বে—ভারতীয় সমাজে এটি একটি অভিনব ও অনবদ্য ধারণা ও তত্ত্ব। সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের হলেও পরিবারের কর্তৃত্ব মূলতঃ কিন্তু নারীর ; আর এ নারী হচ্ছে জননী। এখানে পুরুষের অধিকার সীমিত, মহিলাদের কর্তৃত্বই প্রধান। পুরুষ যে তাদের এই অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করেনি তা নয় ; কিন্তু যেখানে তা করেছে সেখানেই পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশের যে অংশে পারিবারিক ভিত্তি দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল এবং নারীর মর্যাদা নিরাপদ ও সুরক্ষিত সে অংশে মানুষের সমাজও অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ; আর এই ধরণের সমাজই দেশের প্রগতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সহায়ক। আমাদের দেশে প্রাচীনকালের সমাজ ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি যে ঘটেনি তা নয়, মহিলা সম্প্রদায়ের অধিকারকে যে কোন

সময়েই সঞ্জীবিত করার চেষ্টা যে হয়নি তাও নয়। কিন্তু তার মূল্যায়ন তখনকার বাস্তব পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়েই করতে হবে; সেই সব ঘটনাকে বর্তমানে নজীর হিসাবে টানা উচিত হবে না। আমাদের দেশে বর্তমানে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির দাবী নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, এই আন্দোলনের পক্ষে তো আদৌ সহায়ক হবে না। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিজাতীয় মানসিকতার শিকার হয়ে যদি আমাদের দেশের মহিলাদের সমস্যার সমাধানে কোন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হয় তাহলে সে আন্দোলনে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না। বুঝতে হবে : পৃথিবীর সর্বত্রই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ—আমাদের দেশে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ কোন অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু এই সমাজ ব্যবস্থায় নারী সম্প্রদায়ের জীবনে চরম দুর্যোগ নেমে এসেছে তার ইতিহাসও এক হাজার বছরের বেশী নয় যদিও এই অন্ধকার যুগের সুরু আরও প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। এই যুগে আমরা লক্ষ্য করি সমাজ পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যারা সনাতনী হিন্দুধর্মের ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদার ও মানবিক আবেদনকে অস্বীকার করে সমাজ জীবন সম্পূর্ণ আচার সর্বস্ব করে তুললো—আর সেই আচার সর্বস্ব জীবন দর্শনের প্রবক্তা এবং ধারক ও বাহক হওয়ার অধিকারে পুরুষ সম্প্রদায়ই হয়ে উঠেছে গোটা সমাজের প্রায় একচেটিয়া মালিক। শিক্ষাকে তারা কুক্ষিগত করলো, তারা ধর্মের নতুন ভাষ্য উপস্থিত করলো, সমাজকে তারা নানা অনুশাসনে ও বিধি বিধানে আড়ষ্ট করে তুলেছে। পুরুষ সম্প্রদায়ের এই মুষ্টিমেয় অংশকে পরবর্তীকালে আমরা আখ্যাত করেছি মৌলবাদী হিন্দু বর্ণে। এখান থেকেই সুরু হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যুগ, যে যুগে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান হারিয়ে নিছক নিজেদের মনগড়া কতকগুলি ধর্মের অনুশাসনে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ব করে নিয়েছে। এই ঘটনার অনিবার্য ফল হচ্ছে : একদিকে সমাজে উচ্চবর্ণ ও অধঃবর্ণ এই দুই ভাগে বিভাজন, আবার অধঃবর্ণের মধ্যেই স্তর ভেদে নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের

সৃষ্টি করা হয়েছে এদের নিয়েই সমাজে একটি বিরাট শোষিত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। আড়াই হাজার বছর অতীত হয়ে গেলেও এবং চুয়াল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হবার পরও এই বর্ণভেদের অভিশাপ থেকে দেশ মুক্ত হতে পারেনি। অন্যদিকে এ যুগেই আমাদের সামনে নারী সম্প্রদায় মানুষ হিসাবে তার এতদিন যে সব সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে আসছিল—ঐ একই মৌলবাদী ব্রাহ্মণ ও সমাজ নীতি-নির্ধারকদের অনুশাসনে ধীরে ধীরে নানা অজুহাতে সেগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু নিম্নমানের জীবনযাত্রাই নয়, সমাজে নারী সম্প্রদায়ের স্বাধীন সত্তাকে ক্রমশ অস্বীকার করা হয়েছে, এই দেশে নারী জন্মলাভ করাটাই একটি অভিশাপের বিষয় বলেই গণ্য হয়েছে। শুধু দুঃখের জীবন নয়, নানা নির্যাতনের কাহিনীতে ভরা আমাদের দেশে এই নারী জীবন। এখানে কোন অন্য বর্ণে ভেদ নেই, শ্রেণী বিভাগও নেই : নারীমাত্রই দুর্বল ও হীন, হীনমন্য জীবন যাপনই হচ্ছে তাদের ভাগ্যবিধি। এমনই একটি অসহায় অবস্থার মধ্যেই চলে এসেছে আমদের দেশ কয়েক শতাব্দী ধরে। ইংরাজ আসার পর যে নব-জাগরণের যুগের সূত্রপাত হলে—এই যুগেই আমরা একটি নতুন পরিবর্তনের উদার আহ্বান পেলুম। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী হচ্ছেন এই নতুন যুগের বার্তাবহ যুগ-প্রবর্তক। এঁদের চেষ্টায় পূর্ববর্তী অন্ধকার যুগের শিক্ষা ভাণ্ডার আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানের রেশ আজও চলছে, দেশ স্বাধীন হবার চল্লিশটি বছর উত্তীর্ণ হলেও আজও চলছে। তার কারণ : বাক্যে আমরা যত মুখর, কর্মে আমরা ততই শিথিল ও মন্থর। তবুও সমাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধনের ভেদ হ্রাস করার সংগ্রাম যেমন চলছে, তেমনি চলছে সমাজে নারী সমাজকে তার পুরানো প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার। একশো বছর আগে আমাদের নারী সম্প্রদায় যে হীনমন্য অভিশপ্ত জীবনযন্ত্রণা ভোগ করছিল, আজ যে তারা সেই একই অবস্থায় পড়ে আছে—তা নয়, ইতিমধ্যে তার অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের দেশ

স্বতন্ত্রভাবে একটি নারী আন্দোলন দেখা দিয়েছে যে আন্দোলনের অন্যতম দাবী হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজে পুরুষ সম্প্রদায় যে সব সুযোগ ও অধিকার ভোগ করে, নারী সম্প্রদায়েরও সেই সব অধিকার অর্থাৎ সমানাধিকার চাই।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আজ মহিলারা যে পুরুষদের মত সমস্ত সুযোগের অধিকারী, এখানে যে কোন বিশেষ তারতম্য নেই, আইনের চোখে উভয় সম্প্রদায়ই সমাজ আলোচনার শুরুতেই তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এও উল্লিখিত হয়েছে যে কোন বিষয়ে আইন হলেই, সেই বিষয়ের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না ; তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরী হওয়া এবং তারই ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এখানে মহিলা সম্প্রদায়ের সচেতনতা, উদ্যোগ ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা আন্দোলনের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। খুব ব্যাপক ও প্রবল না হলেও আমাদের দেশে সেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু দেশে যে অর্থ-নৈতিক পরিবর্তন এলে এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যতটা প্রসারিত হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলি সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়, ততখানি পরিবর্তন আমাদের দেশে আসেনি। সেজন্যই জনসমষ্টির একটি বৃহৎ অংশে আজও দারিদ্র আছে, অশিক্ষা আছে, স্বাস্থ্যহীনতা আছে. অভাবজনিত আরও অনেক সমস্যা আছে। মহিলারাও এই জনসমষ্টিরই একটি অংশ ; মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং এদের অবস্থান প্রতিটি পরিবারেই। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়ে ঐ পরিবারের মহিলাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বা আর্থিক স্বাবলম্বিতার পরিমাপ করা যায় না। এখানে মহিলা মাত্রেই প্রায় পরাধীন ; বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধারণাটি এখনও এই রকমই। ধারণাটি সহজে ও অতিদ্রুত দূরীভূত হয়ে যাবে তাও আশা করা যায় না। কেননা সমস্যাটির সঙ্গে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি জড়িত হয়ে আছে। তবে অতীত অন্ধকার যুগটিকে আমরা অতিক্রম করে এসেছি, এখন ধীরে ধীরে সুযোগের দ্বারগুলি ক্রমশই উন্মুক্ত হচ্ছে। সকলে না হলেও মহিলাদের একাংশ আজ

শিক্ষা লাভ করছে, পরিবারের গণ্ডীর বাইরে এসে নানা কর্মে নিযুক্ত হচ্ছে এবং আশা করা যায় এই ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হবে এবং এর ফলে মহিলাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কিন্তু এটি যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা বলে ভাবা ঠিক হবে না; এটিও একটি আন্দোলন সাপেক্ষ ব্যাপার, আর সে আন্দোলন হবে ধারাবাহিক ও ক্রম গতিশীল; আন্দোলনে পরিচালনার পুরোধায় থাকতে হবে মহিলাদেরই কেননা এই আন্দোলন মূলতঃ তাদেরই প্রয়োজনে।

অর্থনৈতিক নির্ভরতা হ্রাস পেলে, আধুনিক শিক্ষা লাভ করলে যে আমাদের দেশের মহিলাদের পরনির্ভরতা ও অসহায়ত্বের বেদনাবোধ ও গ্লানি সম্পূর্ণরূপে মোচন হয়ে গেল—এটি সত্য কিনা, সত্য হলেও কতখানি সত্য তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়; এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ ও অধিকারই হচ্ছে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা। আমরা যদি এই কষ্টি পাথরে আমাদের দেশের মহিলাদের স্বাধীনতা ও পর নির্ভরতার বিষয়টিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে কোন অসুবিধা হবে না যে একজন মহিলা আর্থিক দিক থেকে আত্ম-নির্ভরশীল হলেই যে সেই মহিলা আত্মবিশ্বাসী ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেল তা আদৌ সত্য নয়—বিশেষভাবে আমাদের দেশের সমাজে, যে সমাজ দীর্ঘকাল একটি গভীর অন্ধকার যুগের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং যে যুগের ধ্যান ধারণা একটি দৃঢ়মূল সংস্কার হিসাবে এখনও আমাদের মনে কাজ করছে। এই সংস্কারের নিকৃষ্ট শিকার আমাদের দেশের মহিলারাও এই সংস্কার এমই একটি জিনিষ যা দীর্ঘকাল মানব সমাজের কোন অংশে মানুষের মনকে একবার আচ্ছন্ন করে থাকলে তা স্থায়ী রূপ পায়, তখন সংস্কার আর নিছক সংস্কার থাকে না, ধর্ম বোধ ও জীবন দর্শনে পরিণত হয়। এই সংস্কার থেকে মুক্তি পেতে গেলে অনুসৃত ধর্ম বোধ ও জীবন দর্শনেরই রূপান্তর ঘটাতে হয়।

এমনই একটি জটিল ও দুরূহ পরিস্থিতির মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশের মহিলা সম্প্রদায়। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরবর্তী কালে নিছক পুরুষ সম্প্রদায়ের স্বার্থে ও প্রয়োজনে মহিলা সম্প্রদায়ের উপর অসংখ্য বাধা নিষেধ ও অনুশাসন আরোপ করা হয়েছে, তাদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাধীন সত্তাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। এবং তা করা হয়েছে ধর্ম ও শাস্ত্রের অভিনব ভাষ্য উপস্থিত করে। ফলে আমাদের দেশে মহিলা সম্প্রদায় একদিন তাদের ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে প্রায় বস্তু সত্তায় পর্যবসিত হয়েছে। আজ নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে—এই বস্তু সত্তার নিগূঢ় চেতনাবোধ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের হারানো ব্যক্তি সত্তাকে পুনরুদ্ধার করা। এই ব্যক্তি সত্তারই অপর নাম ব্যক্তিত্ব। কতকগুলি আইন করে কিম্বা অর্থ উপার্জন ও শিক্ষা লাভের কিছু সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা হলেই আমাদের দেশের মহিলা সম্প্রদায় স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে তা আশা করা যায় না; ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্ব অর্জনের বিষয়টি এত সহজ নয়। এটি পুরুষ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দান বা উপহার হিসাবে পাওয়ার বস্তুও নয়, এর জন্য প্রয়োজন একটি কঠোর ও ধারাবাহিক সংগ্রাম বা আন্দোলনের; আর এ আন্দোলনের উদ্যোগ মহিলা সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলনের একটি পর্যায় পর্যন্ত পুরুষ সম্প্রদায়ের একাংশের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সে সহযোগিতা হবে সম্পূর্ণ পরিপূরক, শর্তসাপেক্ষ। এই আন্দোলনে মহিলা সম্প্রদায় কতখানি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে তা নির্ভর করছে—দীর্ঘদিন ধরে সমাজে তাদের প্রয়োজন ও স্থান সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণা ও সংস্কারে পরিচালিত হয়ে এসেছে তা থেকে কত দ্রুত মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে তার উপর। মানুষের যে সমাজ পুরুষের নয়, নারীরও নয়; এই সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান অংশীদার। একে অপরের পরিপূরক; উভয়ের সমন্বয় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টারই প্রতিফলন হচ্ছে মানুষের সমাজ। সমাজের শৃংখলা, সমৃদ্ধি

ও শক্তির বাতাবরণ গড়ে তোলা—এখানে এক পক্ষকে অবদমন করার কোন অবকাশ নেই। তা করতে গেলে গোটা সমাজেরই ক্ষতি, সে সমাজ হবে বিকলাংগ ও পঙ্গু। আজ আমরা ভারতের অধিবাসীরা সেই রকম একটি দুর্বল ও পঙ্গু সমাজের মধ্যেই কাজ করছি। কাজেই শুধু মহিলা সম্প্রদায়ের মহিলাদের স্বার্থে এই সমাজবোধের পুর্ণজাগরণ হওয়া দরকার তা নয়, সমগ্র সমাজের স্বার্থেই এই জাগরণের প্রয়োজন। এই জাগরণের মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনে আজও যে হীনমন্যতা ক্রিয়াশীল ও সর্বব্যাপক তার বিনাশ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব।

পণপ্রথা, বধূহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি এ ধরণের ঘটনাগুলি যে নিছক আধুনিক ঘটনা তা নয়, কয়েক যুগ ধরেই আমাদের দেশে এই ধরণের নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের ঘটনা ঘটে আসছে। এখন প্রচার মাধ্যমে অনেক জিনিস জানা সহজ ও প্রশস্ত হয়েছে বলেই তা আমরা এত সহজে ও তাড়াতাড়ি জানতে পারছি, তফাৎটুকু শুধু এখানেই। মহিলারা শারীরিক দিক থেকে কিছুটা অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে—শুধু এই কারণেই তাদের পুরুষ সম্প্রদায়ের হাতে নানা নির্যাতন ভোগ করতে হয়, ব্যাপারটি তাও নয়। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে তাদের জন্য একটি নিকৃষ্ট স্থানই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দীর্ঘদিন এই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল এবং কালক্রমে এই অবস্থাকেই মহিলা সম্প্রদায় তাদের স্বাভাবিক অবস্থা বা দৈব নির্দিষ্ট পরিণতি বলে মেনে নিয়েছে। পুরুষের সেবা করা, পুরুষকে সাহায্য দেওয়া, সন্তান ধারণ করা, সন্তান প্রতিপালন করা, গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে গৃহাদি কর্মগুলি সম্পন্ন করা এগুলিই হলো মহিলাদের কর্তব্য কর্ম; নারী পুরুষের স্বোপার্জিত বস্তু, কাজেই পুরুষের ইচ্ছাধীন চলাই হচ্ছে নারীর ধর্ম পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে এই অনুশাসনকে কালক্রমে শাস্ত্রের অনুশাসন ও কাজেই অনস্বীকার্য প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখানে অনুশাসন আর সংস্কারের চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একটি দুর্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রীয় বিধানে, ধর্মবোধে, জীবন দর্শনে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে ইংরাজ আসার পর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে যে নবজাগরণের সূচনা

হয়েছিল সেই জাগরণের ফলেই আমাদের বহু পুরানো অন্ধকার ও নানা সংস্কারে আবদ্ধ সমাজ জীবনের নানা জরাজীর্ণ দিকগুলি ভেঙে পড়তে সুরু করেছে। দেশের নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি আন্দোলনের ঘটনাটিকে এই ভাঙনের প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। তবে এখানেও একটি বিপদ আছে। ভাঙনটি আন্দোলনের শেষ কথা নয়; গড়াই হচ্ছে যে কোন আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। দেশ স্বাধীন হলেও দেশ সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি; নানা ভাবে ভাঙনের খেলা এখনও চলছে এবং তা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যর্থতা লক্ষ্য করছি—নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যর্থতার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় তার জন্য মহিলা আন্দোলনের যারা সংগঠক তাদের যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই সতর্ক হওয়ার প্রাথমিক সর্ত হচ্ছে: দেখতে হবে এই আন্দোলন যাতে পরিপ্রেক্ষিত বর্জিত হয়ে উন্মার্গগামী না হয়, অথবা একটি সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি না ঘটে। সেজন্য আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে এখনও মহিলাদের যে স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে তা অতীত অন্ধকার যুগের কিছুটা হেরফের মাত্র, পরিস্থিতির মধ্যে কোন মৌলিক রূপান্তর ঘটেনি। মহিলা সম্প্রদায়ের যে অংশ শিক্ষাহীন ও অনগ্রসর—তারাই যে পুরানো সংস্কারে আবদ্ধ ও হীনমূল্য ও ব্যক্তিত্বহীন এবং কার্যতঃ পরাধীন পুরুষ সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল তা নয়, এই মহিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও উপার্জনশীল তাদের মনের মধ্যেও এই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করা যায় না। এই বিপর্যয় ও অধ:পতনকে তাদের বিশেষ জীবন চর্চার একটি অতি স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মেনে নিয়ে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন দ্বিধা নেই; অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মহিলাদের একাংশকে এই হীনমন্যতাকে নিয়ে গৌরববোধ করতেও দেখা যায়। তাছাড়া পণপ্রথা, বধূহত্যা ও নারী নির্যাতন প্রভৃতি যে সব কাজগুলিকে গুরুতর অসামাজিক কাজ বলে আমরা

মনে করি এবং এই ধরণের যে সব ঘটনার প্রতিরোধে ও প্রতিকারে আমাদের দেশে বর্তমান নারী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তি আন্দোলন—এই সব কাজ ও ঘটনার পিছনে মহিলা সম্প্রদায়ের একাংশই যে অনেকখানি দায়ী তাও অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা হলেও আমাদের দেশে পরিবার নিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যে পরিবারের পুরুষদেরই হাতে, এখানে মহিলাদের কোন ভূমিকাই নেই—ব্যাপারটি ষোল আনা সত্য নয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে পুরুষের অধিকার ও আধিপত্য যে ক্রমশঃ দৃঢ়মূল ও নিরঙ্কুশ হয়েছে—এটি কোন একদিনের আকস্মিক ঘটনা নয় ; আর মহিলা সম্প্রদায়ও মানসিক দিক থেকে এই অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই কতকগুলি আইন প্রবর্তন বা মহিলাদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমেই অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা যাবে না। সমস্যাটির সঙ্গে দীর্ঘদিনের অনুসৃত মানসিকতা ও সমাজবোধ ও জীবন দর্শনের পরিবর্তনের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই এটি একটি ধারাবাহিক ও সুসংহত আন্দোলনের বিষয়। এই আন্দোলন যেমন সমাজের বহিরঙ্গে প্রয়োজন, তদোধিক জরুরী প্রয়োজন সমাজের অভ্যন্তরে পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের মানসিকতার পরিবর্তনে। এই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকাই হচ্ছে প্রধান।

মহিলাদের স্বাধীনতা বা মুক্তির আন্দোলন—দেশের বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের যে আন্দোলন তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি কল্যাণ জড়িত হয়ে আছে। আন্দোলনের যারা সংগঠক তারা যদি সমাজ বিবর্তনের এই সামগ্রিক দৃষ্টিতে ও কল্যাণবোধে পরিচালিত না হয় তাহলে আমাদের দেশে নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি আন্দোলন একটি সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আন্দোলনের এই প্রবণতা মহিলা সম্প্রদায়ের স্বার্থেও বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। মহিলা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবী হিসাবে পুরুষের মত নারীদেরও সমান অধিকার চাই—এই ধরণের

দাবীর কথা আমরা অহরহ শুনতে পাই। দাবী নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মহিলা আন্দোলনের সংগঠনকারীদের যথেষ্ট সতর্ক, বাস্তববাদী ও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একজন পুরুষ যে সব সুযোগ ও অধিকার ভোগ করতে পারে, একজন মহিলাও যে সেই সব সুযোগ ও ক্ষমতার সমান অধিকারী আমাদের দেশের সংবিধানে তা স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও সমান অধিকার চাই—রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই দাবী বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন। দাবী কতখানি কার্যকরী হচ্ছে সেটি নির্ভর করছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তনের উপর এবং সেই সঙ্গে মহিলা সম্প্রদায়ের শিক্ষা, চেতনা, উদ্যোগ ও আন্দোলনের উপর। বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; এবং তা এই লেখার সূচনা পর্বেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষের মত মহিলাদেরও সমান অধিকার চাই—যদি এই দাবীর অর্থ এই হয় যে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষ সম্প্রদায় যে সব অধিকার, সুযোগ ও ক্ষমতা ভোগ করবে মহিলা সম্প্রদায়েরও সমপরিমাণে সেই অধিকার, সুযোগ ও ক্ষমতা ভোগ করতে হবে তাহলে আমাদের দেশের নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের ধ্যান-ধারণা নিয়ে কিছু মৌলিক আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পুরুষ ও মহিলা সম্প্রদায়ের সমান অধিকার চাই—যদি এই দাবীর অর্থ হয় যে পুরুষ সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রা বা জীবন ধারণের পদ্ধতি যে মডেলে গড়ে উঠবে, সেই একই মডেল হবে মহিলা সম্প্রদায়ের পক্ষে ষোল আনা প্রযোজ্য—তাহলে এই সমান অধিকারের ধ্যান ধারণার মধ্যেই একটি চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা আছে এবং তা ইতিমধ্যেই ঘটতে সুরু করেছে। এই বিভ্রান্তির নিরসন হওয়া একান্ত দরকার, নইলে মহিলা সম্প্রদায়ের সমানাধিকারের আন্দোলন একটি ভিন্নপথে প্রবাহিত হবে এবং তাতে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পূর্ণ অভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। নারী ও পুরুষের শারীরিক

গঠনের তারতম্যই এর একমাত্র কারণ নয়, মানসিক গঠন ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে কিছুটা পার্থক্য আছে তা বিস্মৃত হওয়া চলে না। এই পার্থক্য অনেকখানিই প্রকৃতিদত্ত, এখানে জোরজুলুম করার কোন অবকাশ নেই। দেশে একটি সুস্থ ও ক্রমোন্নয়নশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে যদি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক হয় ও পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে; এখানে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পুরানো ও প্রচলিত ধ্যান ধারণার ও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। পুরুষই হচ্ছে নারীর একমাত্র অবলম্বন, পুরুষাশ্রিত হওয়া ছাড়া নারী সম্প্রদায়ের জীবনে অন্য কোন পথ খোলা নেই—যে কোন সর্তে, যে কোন মূল্যে একটি নারীকে একজন পুরুষের সঙ্গ লাভ করতে হবে এবং এই সঙ্গ লাভ করাটাই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চরম সার্থকতা—আমাদের সমাজে এই ধারণাটি দীর্ঘকাল ধরে দৃঢ়মূল হতে পেরেছে বলেই ধারণাটি একটি ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে। দেশের মহিলারা এই বিশ্বাসের শিকার হয়েছে বলেই আজ তাদের বর্তমান হীনমন্যতা ও দূরাবস্থা। এই হীনমন্যতা ও দূরাবস্থার অবসান চালু শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়; এমনকি পারিবারিক স্বচ্ছলতার উপরও এই অবস্থার প্রতিকার সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। শিক্ষিত ও উপার্জনশীল মহিলারাও যে এই সংস্কার ও বিশ্বাসের শিকার, তার নজীর আমাদের দেশে বিরল নয়। শাড়ী, বাড়ী ও গাড়ীর মূল্য যখন কোন মহিলার ব্যক্তিত্বের চেয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে তখন সেই মহিলার সত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়ে; আর তাই ঘটেছে আমাদের দেশের মহিলা সম্প্রদায়ের মধ্যেও। মহিলাদের সমানাধিকারের দাবী মূলতঃ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ও অধিকারের দাবী। এই দাবীর সঙ্গে মহিলাদের যে নিজস্ব ভূমিকা আছে তা অস্বীকার কিম্বা বর্জন করার কোন সম্পর্ক নেই। নারীর পূর্ণতা লাভ তার মাতৃত্বে; এখানে পুরুষের কোন দাবী নেই। অন্য পাশ্চাত্য দেশে না হলেও আমাদের দেশে এটি একটি অমোঘ সত্য। আবার সন্তান ধারণ করা কিম্বা সন্তান পালন করার মধ্যেই

মাতৃত্বের ধারণাটি সীমাবদ্ধ তাও নয়। সুস্থ ও উন্নত সমাজ গঠনের জন্য যে পরিচালক শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ হওয়ার প্রয়োজন সেই শক্তির আর এক নাম হচ্ছে মাতৃত্ব ; এই মাতৃত্বের অধিকারী একমাত্র মহিলারাই। আমাদের দেশের সর্বস্তরে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটুক, গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তারা বেরিয়ে আসুক, অর্থনৈতিক দিক থেকে তারাও উপার্জনশীল ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদেরও যে অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে তারা সে সবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুক—আমাদের দেশের বর্তমান নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের যে সব দাবী সেগুলির যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা যায় না কিম্বা কোন রকমে লঘু করেও দেখা হচ্ছে না। এসব দাবী নিয়ে আন্দোলন আরও জোরদার হোক, ব্যাপক হোক এবং এই আন্দোলন যাতে মহিলাদেরই অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব অগ্রাধিকার লাভ করে তা সুনশ্চিত করা হোক। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে আমরা আমাদের দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই তার একটি মডেলও আমাদের সামনে থাকা চাই। আগামী দিনেও আমাদের দেশে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের প্রতিটি অংশই একে অপরের পরিপূরক অংশ হিসাবে সহ-অবস্থান করবে এবং পরিবারই হবে এই সমাজ ব্যবস্থার শুধু অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, মানুষের গোটা সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্ত। ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তাহলে গোটা সমাজ ব্যবস্থারই ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। যদি আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাস্থ্য, সুস্থিরতা, সমৃদ্ধি ও সংহতি কামনা করি তাহলে পারিবারিক জীবনের স্বাস্থ্য, সুস্থিরতা সমৃদ্ধি ও সংহতির কথা আমরা না ভেবে পারি না। সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে সুস্থ পারিবারিক জীবন। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন মহিলা সম্প্রদায় অবজ্ঞাত থেকে গেছে এই অবস্থার অবসান চাই এ দাবীর অর্থ এ নয় যে আমাদের পারিবারিক জীবনেরই কোন প্রয়োজন নেই। এই পারিবারিক জীবনকেও সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার

দায়বদ্ধতা পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়রই ; তবে পরিবার সংগঠনে মহিলাদের ভূমিকাই হবে প্রধান। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্ভব ও আত্ম-প্রকাশের ভিত্তিভূমি হচ্ছে এই পরিবার আর পারিবারের মূল পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে মহিলা সম্প্রদায়। সেইজন্যই বলা হয়েছে—The hand that moves the cradle, rules the world. এই উক্তির যাথার্থ মানুষের সমাজবদ্ধতার সূচনা পর্বেও যেমন সত্য ছিল আজও তা সমানভাবে সত্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নারীর নারীত্বের বিকাশ, মাতৃত্বের বিকাশ কথাটির সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

নারী ও পুরুষের মিলন—এটি একটি প্রকৃতিগত সহজাত। এই ঘটনার সঙ্গে ভালবাসা, সহযোগিতা মানবত্তাবোধের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু এখানে কোন চাপানো অনুশাসন বা বাধ্য-বাধকতার স্থান নেই ; মহিলা ও পুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই এই সম্পর্ক গড়ে এবং স্থায়ীরূপ পায়। এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি গুরুত্ব দেওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সেইজন্য সুস্থ পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংযমের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষের যৌথ পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে যে বিবাহ পদ্ধতির চিন্তা করা হয়েছিল, সেই চিন্তার পেছনে কোন বিজ্ঞান বা যুক্তি ছিল না তা নয় ; পরবর্তীকালে এই চিন্তার বিকৃতি ঘটলেও চিন্তার মৌলিকত্ব বা সারবত্তা যে অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন তা প্রমাণ হয় না। যে কোন মূল্যে একজন নারীকে যে কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এবং নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়েও সেই পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে বাধ্য হতে হবে--এই অমানবিক জীবনের সুরু যে বিবাহ প্রথার মাধ্যমে—একজন নারীর জীবনে এই বিবাহই হচ্ছে যে চরম লক্ষ্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই যে ধারণা কয়েক যুগ ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজে তাকে যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করার প্রয়োজন আছে কেননা একজন নারীর জীবনের সার্থকতা

কেবলমাত্র একজন পুরুষের সঙ্গে বিবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; তার ক্ষেত্র আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এবং পুরুষের সমাজ যদি পশুবোধে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে বিবাহ জীবন অস্বীকার করেই নারী জীবনকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু এ হলো বর্তমানে সমস্যার মুখোমুখী হয়ে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের একটি দিক। এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে স্ত্রী ও পুরুষের যৌথ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিবাহ প্রথার মত কোন পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতার একটি মুক্তি হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন ; আর এ মুক্তি সামাজিক ভাবে স্বীকৃত হওয়াও দরকার। এখানে পাশ্চাত্যদেশের নর-নারীর জীবন যাত্রার পদ্ধতি আমাদের দেশে অনুকরণ যোগ্য নজীর হতে পারে না। তবে বিবাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে এখানে যে একপেশে ধারণাকে দৃঢ়মূল করা হয়েছে তার অবসান হওয়া দরকার। দরকার কেবলমাত্র মহিলা সম্প্রদায়ের হীনমন্য জীবনের প্রতিকারে নয়, সমগ্র সমাজের কল্যাণেই এই ধারণার অবসান হওয়া দরকার। নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির দাবী নিয়ে আমাদের দেশে যে আন্দোলন—তা নিছক নারী সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা বা মুক্তি আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন গোটা সমাজের স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলন। দেশে বিদেশী শাসন আর নেই ; কাজেই দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত এ দাবীর গৌরব অনেক খানিই ম্লান হয়ে যায় যখন দেখা যায় আমাদের সমাজের জনসংখ্যার অর্ধাংশ এই যে বিশাল মহিলা সম্প্রদায়—উচ্চ-নিচ ধনী-নির্ধন-শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে একটি ব্যক্তিত্বহীন, হীনমন্য পরাধীন জীবনের দায় ভার আজও বহন করে চলছে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের পুরানো পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। কিন্তু ঐ সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেই আমরা দায়মুক্ত হতে পারি না। ঐ সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভূত যে ধ্যান ধারণাগুলি সুদৃঢ় বদ্ধমূল সংস্কার নিয়ে আমাদের নারী ও পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের সমস্ত সত্তাকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে—তা থেকে উভয় সম্প্রদায়কেই মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে

হবে। সংগ্রাম পুরুষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মহিলা সম্প্রদায়ের নয়; এক সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে প্রতিহত করে অপর সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করাও নয়। পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকার চাই—এই দাবীর মধ্যেও সুস্থ সমাজ বোধের সঠিক প্রতিফলন ঘটে না। আন্দোলন কেবলমাত্র ভাঙার জন্য নয়, গড়ার জন্য—এই ইতিবাচক মানসিকতার উপরই আমাদের দেশের এই নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তি আন্দোলনের সমগ্র পরিমণ্ডলটি গড়ে ওঠা দরকার। আরও স্মরণ করা দরকার—এই আন্দোলন কোন বাইরের শক্তি বা শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, একটি দৃঢ়মুল সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে সে সংস্কারের শিকার নারী ও পুরুষ উভয়েই। কাজেই এই আন্দোলনের অংশীদার হতে হবে উভয়কেই। তবে স্বাভাবিক ভাবেই এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে মহিলাদেরই এবং আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সেই সব মহিলাদেরই যারা নিজেদের শিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা বলে দাবী করে। বঞ্চনা অসম্মান ও হীনমন্যতার অনুভূতি এদের মধ্যেই যে প্রথম দেখা দেবে এবং তা ক্রমশ প্রকট হবে—এটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তাদের শিক্ষার উপযোগিতা ও সার্থকতার ও প্রগতিশীল মনোভাবের বিচারের এটাই তো প্রকৃত মাপকাঠি। দুঃখের হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটছে না। এদের কণ্ঠে নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির দাবী যতখানি মুখর হতে শোনা যায়, নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জগতে সেই দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ ও সঙ্কল্প ততখানি দৃঢ় ও প্রবল হতে দেখা যান না। এমনটি কেন হচ্ছে তারও নিশ্চয় একটি কারণ আছে। আর সে কারণও শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী যে নতুন আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল আজ গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। সেজন্য আমাদের দেশে নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তি আন্দোলনের যে প্রশ্নগুলি দেখা দিচ্ছে যেমন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজের পরিবর্তে যে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চাই তার মডেলটি কি রকম হবে, সেই সমাজে নারী-সম্প্রদায় কি ভূমিকা গ্রহণ

করবে এবং নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে এবং এই সম্পর্কের ধারাবাহিকতা কি ভাবে রক্ষিত হবে এবং কোন্ জীবনদর্শনকে আশ্রয় করে ব্যক্তি. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন অগ্রসর হতে থাকবে —এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই ; আবার এ ব্যাপারে তথাকথিত পাশ্চাত্য দেশগুলির সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ করাও চলে না। পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কোনক্রমেই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নয়।